পার্বত্য তথ্য কোষ
১
১ গবেষণা পত্র
২ ইতিহাস
৩ রাজনীতি
৪ চুক্তি ও ভূমি সমস্যা
৫ শান্তি সূত্র
৬ প্রতিবেদন গুচ্ছ
৭ অনুসন্ধান
৮ নির্বাচিত রচনাবলী
৯ তথ্য উপাদান
১০ রচনা সমগ্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মরহুম আতিকুর রহমান লিখিত ‘পার্বত্য তথ্যকোষ’ ০১ সেট বই তাঁর ছেলে ফয়জুর রহমান ফয়েজ এর পক্ষ থেকে উপহার সরূপ।

প্রয়োজনে মোঃ ০১৬১২-২৮০৮০২

পার্বত্য তথ্য কোষ -১

গবেষণাপত্র

আতিকুর রহমান

নিবন্ধন পত্র

বই : পার্বত্য তথ্য কোষ ১-১০

লেখক : আতিকুর রহমান

প্রকাশক : লেখক নিজে ঃ মালিক পর্বত প্রকাশনী
৪৮ সাধার পাড়া, উপশহর সিলেট

প্রকাশ কাল : নভেম্বর ২০০৭ ইং

কম্পোজ : বাবুল কম্পিউটার ও সোলেমান খাঁ
২৬২/ক ২৬৩ বাগিচা বাড়ী ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।

পেষ্টিং : আবু তাহের ঐ

মুদ্রাকর : মিতু প্রেস ১০/এ নয়া পল্টন ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ : শিল্পী আরিফুর রহমান ১৩১ ডিআইটি রোড ঢাকা।

পরিবেশক : ১ রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার রাঙ্গামাটি
২. মল্লিক বই বিতান ঐ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ রিসার্চ ফোরাম
৫/১৮, নূরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মূল্য : খণ্ড-১, ৩ ও ৯ টাকা ১৩০/- খণ্ড-১০ টাকা ৫০০/-
অন্যান্য খণ্ড - টাকা ১০০/-

পরিবেশন শীল :

যোগাযোগ ঃ আতিকুর রহমান মোবাইল ঃ ০১১৯৬১২৭২৪৮
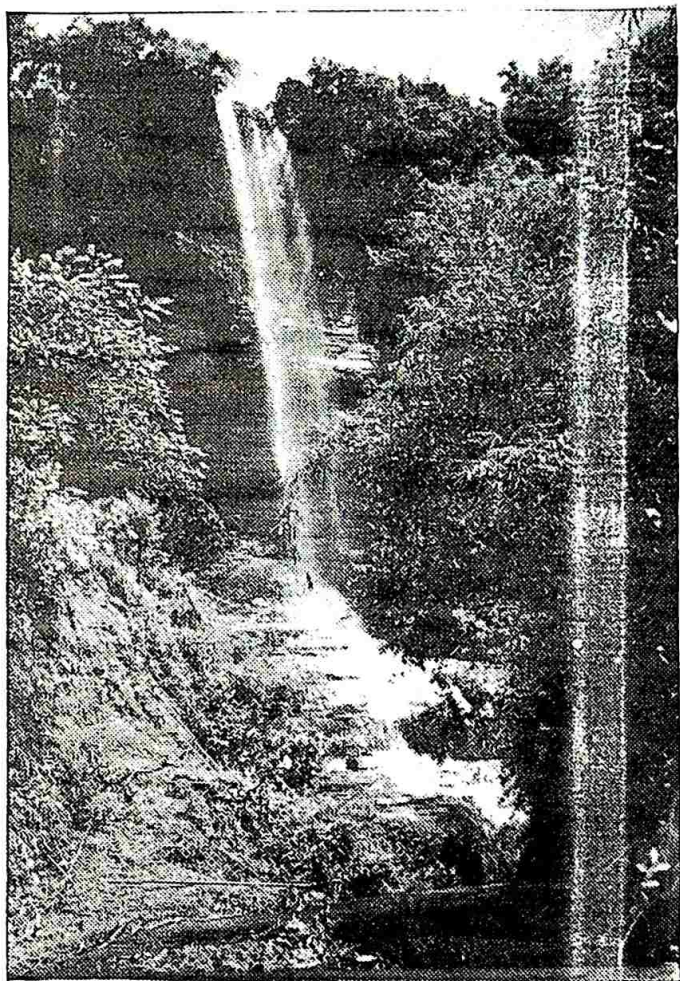
সুবলং জলপ্রপাত

সূচী পত্র ঃ খণ্ড-১ মূল কথা

রাজবন বিহার

ভূমিকা ঃ

পার্বত্য সংকটের মূল্যায়ন ও সমাধান সুপারিশ

এটা দুর্ভাগ্য জনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয় অধিবাসীদের ব্যাপারাদি সঠিকভাবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে না। এ সংক্রান্ত প্রথম ভুল হলো ঃ এই অবাঙ্গালী লোকজনকে স্থানীয় আদি স্থায়ী অধিবাসী রূপে জ্ঞান করা হয়, এবং এতদাঞ্চলকেও মনে করা হয় অবাঙ্গালী অঞ্চল। এটাই স্থানীয় তথ্য রূপে রাজনীতি বিজ্ঞানের শক্ত ভিত্তি হয়ে এতাদাঞ্চলীয় সমস্যা সংকটের পরিপোষন করছে। নৃবিজ্ঞান মতে ও স্থানীয় উপজাতীয়রা বাঙ্গালী নয়, পৃথক এক জাতিসত্তা, যারা নিজেদের এই আবাস স্থলে বহিরাগত সংখ্যাগুরু এবং এখানে তারা স্বায়ত্ত শাসন বা আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। নিজেদের আধিপত্য ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তারা বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ বিরোধী।

কোন জাতির অধিকার গত মূল ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখে তাকে কখনো কোথাও দমান যায়নি। বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক আমলের পরে আজ কাল এমনটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানবাধিকার মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রের নামে এখন প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সর্বত্র সবার কাছে সমর্থিত। তবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্য এবং উচ্চাভিলাষের দ্বারা কোন অঞ্চল গ্রাস ও কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দ্বারা মানবিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তিকে বিঘ্নিত করা আকাঙ্খিত নয়। আত্মরক্ষার পথটি এখনো অবারিত আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিপক্ষে বাংলাদেশ এখন অবরুদ্ধ। এ ব্যাপারে চুক্তি ও বিধিবিধান হয়েছে ঃ এতদাঞ্চল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, এখানে তাদের কিছু অগ্রাধিকার প্রাপ্য, কিছু উচ্চপদ তাদের জন্য সংরক্ষিত। বাঙ্গালীদের অবাধ ভূম্যাধিকার, ভোটাধিকার ও জন প্রতিনিধিত্ব এখানে নিয়ন্ত্রিত।

এই স্বীকৃতি ও চুক্তি হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পথে মূল্যবান অগ্রগতি,যা বিশ্ব সামাজের কাছে অঙ্গিকার বিশেষ। সোজাসুজি এর ভিন্নতা কারার উপায় নেই। বিশ্ব সমাজ কর্তৃক বাংলাদেশকে উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দানে বাধ্য করার পক্ষে এটি এক মাইল ফলক। পার্বত্য চুক্তি ভঙ্গ করা হলে, বাংলাদেশকে শান্তি ভঙ্গ, অধিকার হরণ ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে।

উপজাতিদের নিত্য দিনের রাজনৈতিক কৌশল অভিনব। চুক্তি অনুযায়ী মন্ত্রী, এমপি, রাজা, চেয়ারম্যান পদ উচ্চ বেতন ভাতা, গাড়ীবাড়ি বিলাসী সুবিধার কিছুই যথেষ্ঠ নয়। এ গুলো এ পর্যন্ত তাদের সন্তুষ্ট করেনি। এ পথে উপজাতীয় পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা কামনা বাস্তব নয়। আসলে তারা উচ্চাভিলাষী বহিরাগত

বংশোদ্ভূত লোক। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তারা আগ্রহী নয়। এদের পালন পোষন ও সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দান বিড়ম্বনাকর। সর্বোপরি এরা বাংলাদেশের মূল নাগরিক বাঙ্গালীদের ও দেশের এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে এতদাঞ্চলে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়।

স্থানীয় সরকারি প্রশাসন আর প্রতিরক্ষাকেও উপজাতীয় করণে তারা উদ্বুদ্ধ। এসবই ধৃষ্টতা পূর্ণ রাজনৈতিক উচ্ছাকাঙ্খা। এই বাড়াবাড়ি অসহনীয়। এতে তাদের সহ দেশ ও জাতির এক হয়ে থাকার কোন অবকাশ নেই। বৃটিশ আমলে এদের পূর্বপুরুষেরা এতদাঞ্চলে উদ্বাস্তু রূপে এসেছিলো। ঐ বৃটিশরাই তাদের হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ভূক্ত অভিবাসন আইন ৫২ বলে এদের বাংলাদেশ বাসীর অনুমোদন ছাড়াই এতদাঞ্চলে স্থান দিয়েছে। এখনো তারা চরিত্রে মননে বিদেশী ও বিজাতীয় থেকে গেছে। তারা বাংলাদেশী ও বাঙ্গালী স্বজন হতে পারেনি। এদের মাঝে সর্বাধিক উগ্র অবাধ্য আর বৈরী সম্প্রদায় হলো চাকমারা। এরা দেশ দ্রোহে অন্যান্য সহযোগীদের প্ররোচনা দাতা গুরু।

উপজাতীয়দের দুর্বল রাজনৈতিক ভিত্তি হলো তারা বৃটিশ আমলের বহিরাগত অভিবাসী জন গোষ্ঠী প্রশ্নাতীত ভাবে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা নয়। তাদের অভিবাসন এদেশ বাসীর দ্বারা অনুমোদিত নয়। ১৯৭২ সালে অবাধ্যতার কারণে পাকিস্তান প্রদত্ত বিহারী অভিবাসন বাতিল হয়েছে। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০/১ রেগ্রলেশন ভূক্ত ৫২ নম্বর অভিবাসন আইনটিও কার্যকর নেই। যেহেতু এই উভয় সম্প্রদায়ই দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে দেশকে বিচ্ছিন্ন আর অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতাদান ও চুক্তি করা সত্ত্বেও বৈরী উপজাতীয়রা দেশের মূল অধিবাসী বাঙ্গালীদের বিতাড়নে এখনও সক্রিয় আছে। সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজী অব্যাহত রেখেছে। সেহেতু এই ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার শাস্তি হওয়া অন্যায় কিছু নয়। অস্ত্রবাজি গণহত্যা আর বাঙ্গালী প্রত্যাহারের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এমন এক গুরুতর অপরাধ যার প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও জাতি কর্তৃক তারা বৈরী ঘোষিত হতে পারে। তাদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কর্মসংস্থান রহিত, অভিবাসন ও নাগরিক অধিকার বাতিল হওয়া অন্যায় কিছু নয়।

এমন দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধের উপায় হলো : তাদের অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থণা করা, তৎপর আনুগত্যের প্রমাণ দেয়া, যাতে মানবতাবাদী সুযোগ সুবিধা মঞ্জুর করা সম্ভব হয়। দেশ বৈরী এই অভিযুক্তদের বিদেশী শক্তির কাছে এমন সুযোগ লাভের জন্য তদবিরে সক্রিয় হওয়া ও সুফল লাভের অপেক্ষা করাটাও অপরাধ। বিদেশী মুরুব্বী রাষ্ট্র সমূহ তাদের পক্ষে এসে হস্তক্ষেপ করবে, এই আশাবাদ ধৃষ্টতা।

বিহারী আর পার্বত্য বিদ্রোহী উপজাতীয়রা নিসন্দেহে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। বৈরীরূপে তাদেরকে পালন পোষণের কোনো সুযোগ নেই। অপরাধবোধ, দোষ স্বীকার, ও ক্ষমা প্রার্থণাতেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সূত্র নিহিত। তা ছাড়া তাদেরকে নাগরিক রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে অপরাধে অভিবাসী বিহারীরা দুর্ভাগ্যজনক শিবির জীবনযাপনে এখন বাধ্য, তার চেয়ে অধিক গুরুতর অপরাধে দ্বিতীয় অভিবাসী জনগোষ্ঠী উপজাতীয়রা সমান শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তবে ক্ষমা ও মানবিক সেবা তাদের প্রাপ্য। যে জন্য তাদেরকে অপরাধবোধ দোষ

শিকার ক্ষমা প্রার্থণা ও আনুগত্যের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হতে হবে। কোন ক্রমেই অযাচিতে ক্ষমা আর সুবিধাবাদ মঞ্জুরযোগ্য নয়।

পার্বত্য চুক্তি একটি বিরাট উদারতা, উপজাতীয়রা যার অপব্যবহার করছে, বাংলাদেশ তার অসহায় অনুকারক। এর নেতিবাচক প্রভাব অবশ্য বিবেচ্য। চুক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্গিকার হলো বাংলাদেশ সংবিধান অনুস্মরণ। অথচ প্রথম দফাতেই তা লজ্ঘনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই লজ্ঘনকে উভয় পক্ষের কেউই আমলে আনছেন না। তাতে চলমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়াতেই সব অসাংবিধানিক চুক্তি বিধিবিধান ক্রিয়া প্রক্রিয়া আপনা আপনি রহিত ও বাতিল হয়ে গেছে, যথা ঃ অনুচ্ছেদ নং-৭ (১) ও (২), ২৬ (১) ও (২)। চুক্তিতে সংবিধানের অলজ্ঘনীয় অন্যান্য মৌলিক অধিকার আইনগুলো পর্যন্ত অক্ষুণ্ন নেই। রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র বিধৃত ধারা নং- ১ এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত ধারা নং-৫৯ চুক্তি ভূক্ত আইনে বিকৃত হয়েছে। অথচ কোন কর্তৃপক্ষই এরূপ করার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত নন। এটি যথেচ্ছাচার।

মনে হয় ক্ষমতার শীর্ষাসীন ব্যক্তিরা পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতীয়দের নিয়ে বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। এ অবাঙ্গালীরা অস্থানীয় না স্থানীয়, দেশীয় নাগরিক না বিদেশী বংশোদ্ভুত, এ ব্যাপারে তাদের কোন সঠিক ধারণা নেই। তাই তাদের দ্বারা বৈরী উপজাতীয়দের নিয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে না।

এমনটি হওয়ার মূল কারণ ধারণা ও তথ্যগত অজ্ঞতা অবশ্যই। উপজাতীয়দের ধারণা ও কার্যক্রম চরমপন্থী। তারা পার্বত্য অঞ্চলকে বাঙ্গালী মুক্ত আর নিজেদের প্রশাসিত রাজ্যে পরিণত করতেই আগ্রহী। বাঙ্গালী আবাসন ও সেনা মোতায়েনকেও তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ভাবে। জনপ্রাধান্য ও বর্ধিত সুযোগ সুবিধা বলে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার পথেই তারা অগ্রসরমান। এই এলাকা চীরকালীন বাংলা অঞ্চল, যার আদি অধিবাসী হলো চট্টগ্রামী মূলের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী। দুর্গম পাহাড় ও বনাঞ্চল এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চল থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। সরকারও এতদাঞ্চলকে জাতীয় বনভূমি হিসেবে ঘোষিত করে এতদাঞ্চলকে জনবসতি মুক্ত রেখেছে। এই সুযোগে সীমান্ত দেশীয় জুমজীবী উপজাতীয় লোকেরা কেবল বর্ষাকালে ভ্রাম্যমান জুম কৃষিতে এতদাঞ্চলে নিয়োজিত হতো এবং পরে ফেরত ও চলে যেত। তারা ছিল বহিরাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। এখনো তাদের মূল জাতি ত্রিপুরা মিজরাম ও আরাকান অঞ্চলের স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বসবাস করছে এবং ঐ তিন এলাকাই তাদের চিলকালীন জাতীয় অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো তাদের একদল শরণার্থী লোকের অভিবাসিত এলাকা। এখনকার স্থানীয় উপজাতীয়রা ঐ শরণার্থীদেরই বংশধর। স্থানীয়ভাবে তাদের আদি ও স্থায়ী সংখ্যাগুরু হওয়ার দাবী সঠিক নয়। এই লোকজনদের পিতৃপুরুষদের আদি স্বদেশ ত্যাগ চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন ও আশ্রয় গ্রহণ এবং পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন ১৯০০/১ এর অভিবাসন আইন নং-৫২ বলে এই অঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণ সম্পূর্ণ ব্রটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, যা এদেশ বাসী কর্তৃক অনুমোদিত নয়। সেই ঔপনিবেশিক দখল,শাসন, ও বিধি ব্যবস্থার কোন স্থায়ীত্ব ও নেই। স্বাধীনতার পর সে পরিস্থিতিও বিদ্যমান নেই। নিজেদের স্বাধীন ক্ষমতা বলে সেই অতীত বিধি ব্যবস্থা বিলোপের অধিকার বাঙ্গালীদের অবশ্যই আছে। এখানে প্রথম ও

প্রধান বিবেচ্য হলো সংশ্লিষ্ট লোকজনের শান্তি অনুসরণ না করা, আনুগত্য হীনতা অবলম্বন, মূল অধিবাসী বাঙ্গালীদের চ্যালেঞ্জ করা, এগুলো কোনো মতেই অবহেলা যোগ্য নয়। নতুবা তাদের পক্ষে বাঙ্গালী মন জয় করা অসম্ভব হতো না। এমনটি করা তাদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিলো। নিজেদের সে কর্মফল তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বাঙ্গালী মানেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র। বাংলাদেশী জাতি তথা বাঙ্গালী ছাড়া এ দেশ ও জাতি কল্পনীয় নয়। এই নাম বিধৃত লোক সত্তা ও পরিবেশই এই দেশের জাতি শক্তি ও অস্তিত্বের ভিত্তি। এই মৌলিকত্বের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য থাকা প্রশ্নাতীত। খাঁটি বাংলাদেশী হওয়ার উপায় এই আস্থা ও আনুগত্যের প্রশ্নে সন্দেহ মুক্ত নয়। এই সন্দেহটি মূলতঃ অতীত ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত, যা এ পর্যন্ত বিশদভাবে আলোচিত পর্যালোচিত ও অধিত হয়নি। এই তথ্য শূণ্যতাকে দখল করে নিয়েছে কিছু আজগৌবী উপজাতীয় কথা কাহিনী, রূপকথা ও বানোয়াট গাল গল্প, যার বক্তব্য হলো উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের তিন রাজ পরিবার মূলত তিন স্থানীয় শাসক, বাঙ্গালীরা এখানকার স্থায়ী আদি বাসিন্দা নয় বহিরাগত । উপজাতীয়রা সরল নিরীহ বিধায় বাঙ্গালীদের দ্বারা শুষিত আর নির্যাতিত। তারা আত্মরক্ষাতেই অস্ত্র ধারণে বাধ্য হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, নিজেদের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা। এর লক্ষ্য অবাদে বাঙ্গালী উচ্ছেদ নয়।

এখানে এ প্রশ্নগুলোর যথার্থতা যাচাই হওয়া আবশ্যক। নয়তো বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীরা অপরাধী হয়ে থাকবে। প্রকৃত পক্ষে নির্দোষ ও নিরপরাধ কে? বাঙ্গালী বাংলাদেশ না উপজাতীয়রা? এ প্রশ্নে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত বিভ্রান্তিকে তাত্বিকভাবেই কাটান জরুরী। দেশবাসী সাধারণ লোকতো বটেই, জ্ঞানী গুণীদের বিপুল সংখ্যক লোক পর্যন্ত এই প্রশ্নে সন্দেহ মুক্ত নন। বিদেশীরাও এই বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। এই লোকজনদের ধারণা: এই স্থানীয় সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র জাতি সত্তা সমূহ স্থানীয়ভাবে শান্তিতে নেই। বাংলাদেশে তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারে ঘাটতি আছে, যে জন্য তারা অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ। তারা প্রকৃতই বাংলাদেশী তবে অধিকার বঞ্চিত সংখ্যা লঘু। এদের পৃষ্ঠ পোষণ দরকার।

এ কারণেই উপজাতীয় সংখ্যা লঘু প্রশ্নে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চাপাধীন আছে। সুতরাং তাকে তথ্যগতভাবে আগে দেশে বিদেশে দায় মুক্ত হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতীয় সংক্রান্ত তথ্যচর্চার ব্যাপারে বাংলাদেশ উদাসীন। তাকে প্রমাণ করতে হবে এই লোকজনেরা বৃটিশ আমলেরই বহিরাগত শরণার্থী বংশধর, স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়। ১৯০০ সালের পরে রচিত ও জারীকৃত পার্বত্য শাসন আইনের ৫২ ধারাই তাদের এতদাঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণের আইনী প্রমাণ, যে আইন দেশীয় নয়, ঔপনিবেশিক।

ঔপনিবেশিক দখল ও রাজ্য বিস্তার, বার্মা কর্তৃক আরাকান দখল ও লোক বিতাড়ণ, দক্ষিণ পূর্ব বাংলা অঞ্চল চট্টগ্রামে ঐ আরাকানী শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচ্য। ঐ লোকগুলো লুসাই, ত্রিপুরা, চাকমা, মগ ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত। ঐ আগ্রাসন ও উদ্বাস্তু জনিত বিরোধ শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বার্মার

মধ্যকার ১৮২৪ সালে সংগঠিত যুদ্ধে পরিণত হয়। তাতে আরাকান ও আসাম, বৃটিশ দখলাধীন হয়।

বার্মা, আসাম, আরাকান ও বাংলা হয়ে যায় একক বৃটিশ শাসনাধীন উপনিবেশ, যার অধিবাসীরা বৃটিশ প্রজা। এই বৃটিশ প্রজা হওয়া সূত্রে ভারতীয় বর্মী আসামী আরাকানী বাঙ্গালী আদিবাসী উপজাতি ইত্যাদি পরিচয়ের মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। পরে আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে দেয়া হলেও, একক বৃটিশ শাসনের ঘোলাটে পরিস্থিতির অবসান ঘটেনি। বার্মা, আরাকান, আসাম ও বাংলাদেশ স্বতন্ত্র হলেও এসবের অধিবাসী বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী অভিবাসন ত্যাগ করে স্বদেশে ফেরত যায়নি। এরই ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রিপুরা, লুসাই, আরাকানী, মগ, চাকমা, বার্মী ও ভারতীয়রা স্থায়ী হয়ে পড়েছে। এতদাঞ্চলে তারা সংখ্যা গুরুও বটে, যার ফলে তারা এখন স্বশাসন, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীদার। স্থানীয় প্রধান জাতি বাঙ্গালীদের বৈরী ভাবায় এ অধিকার গুলো তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য।

আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য স্বতস্ফুর্ত। স্বাধীনতার পর ঔপনিবেশিক মিশ্র পরিচয়ের অবসান ঘটেছে। এখন বর্মী আদিবাসী, উপজাতি আসামী মগ, চাকমা, বাঙ্গালী ইত্যাদি স্বতন্ত্র পরিচয় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। লোকদের ভিন্ন অঞ্চলে অনাকাঙ্খিত হওয়া শুরু হয়েছে। এই বিরূপ পরিস্থিতিতে ঔপনিবেসিক শাসকেরা নিজেদের আমলেই বহিরাগত প্রীতি ভাজনদের অভিবাসনের ছত্র ছায়া দান করেন এবং অনেককে আবাসন গড়ে দিয়ে যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম এরূপই এক বহিরাগত উপজাতীয় উপ-নিবেশ।উপজাতীয় রাজনৈতিক দাবীর কৃত্রিমতার ইতিহাস বার্মা আরাকান ও বৃটিশ দলিল পত্রের মাধ্যমে এখনো জাজ্বল্যমান হয়ে আছে। এখানে ঐ অতীত ইতিহাসকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং বিদ্রোহী উপজাতিদের প্রকৃত ইতিহাস অবহেলা করা হয়েছে। অথচ বিষয়টি এখন অত্যন্ত গুরুতর । উপ-জাতিরা স্থানীয় আদি বাসিন্দা ও সংখ্যা গুরু মান্য হলে, এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, তাদের নিজেদের এই আবাস ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দুস্পাপ্য নয়। এই অঞ্চলে বাঙ্গালী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধে বাঙ্গালী বিতাড়ন ও নির্মূল করণ আন্দোলন, তাই ঐ উপজাতীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারেরই অংশ। সুতরাং বিপদকে ঘনিয়ে তুলার পরিবর্তে উপজাতীয়দের দাবীকে হাল্কা করতে হবে। বাংলাদেশের অমোঘ অস্ত্র হলো ইতিহাস। তাতেই প্রমাণিত তারা বিদেশী বহিরাগত অভিবাসী জনগোষ্ঠী। স্বশাসন স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিযন্ত্রণ অধিকার তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য নয়। বিদ্রোহজনিত অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থণা ছাড়া তাদের রেহাই নেই। চুক্তি সম্পাদন নমনীয়তা প্রদর্শন ও বিভিন্ন অধিকার প্রদান বিরোধীয় বিষয় নয়। এগুলো নাগরিকদের প্রাপ্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। বিদ্রোহীরা তার সুবিধা পেতে পারে না।

উপজাতীয়রা চরমপন্থী। তাদের ৫ দফা দাবী নামার দফা নং ৩(১) ৪ক ও খ-তে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা গুরুতর আপত্তিকর ও ধৃষ্টতাপুর্ণ এবং অনাকাঙ্খিত। এই উচ্চাকাঙ্খার বিষয়ে বাংলাদেশের নামনীয় হওয়া মানে নিজের সর্বনাশ সাধন। দাবীটি যে কী সর্বনাশা তা তার ভাষ্যেই বিধৃত, যথা:

"দাবী নং ৩ (১) ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৭ হইতে বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভুমি ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন

প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছ গ্রামে বসবাস করিতেছে, সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া।

৪(ক)ঃ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বিডিআর) ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনা নিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

৪ (খ) বহিঃ শত্রুর আক্রমণ বা যুদ্ধাবস্থা কিংবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চিট্টগ্রামে কোন সেনা বাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনা নিবাস স্থাপন না করা।ঃ

এই দাবীগুলো চরম বিদ্রোহাত্মক। একে পাকাপোক্ত করেছে সশস্ত্র কার্যক্রম। এই বিদ্রোহী অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে বুঝতে দেয়া উচিত: তাদের প্রাপ্য হলো চরম শাস্তি। প্রথমতঃ তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তার বিপন্ন শিশুকালে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী বাঙ্গালীদের প্রচুর প্রাণহানি ও রক্তপাত ঘটিয়ে তাদের স্বদেশের এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়ণে সচেষ্ট। এবং সর্বোপরি তারা বিদেশগত অভিবাসী লোক, আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়। এই ইতিহাসকে পাল্টে তারা এই অঞ্চলে নিজেদের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। সুতরাং তাদেরকে দমিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। এর বিকল্প হলোঃ তারা দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থণা করবে। নতুবা তাদের জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত।

অবাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা, ধারণা ও তথ্যগত ভাবে, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী বিরোধী। তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার লক্ষ্য অর্জনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪টি সশস্ত্র বিদ্রোহ। তাদের প্রতি চরম উদারতা ও নমনীয়তার উদাহরণ হলো আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত পার্বত্য চুক্তি। তবু তারা তাতেও সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ নয়। সব দান, অনুদান, দয়া দাক্ষিণ্য, অগ্রাধিকার ও ক্ষমাতেও তারা অসন্তুষ্ট । বড় বড় গাড়ি বাড়ি, মাসোহারা বৃথাই বিলান হচ্ছে। এর অর্থ হলো বিষয়টির প্রতি রাষ্ট্রীয় ও বহিরদেশীয় মূল্যায়ন সঠিক নয়। উপজাতি সংক্রান্ত পূর্ব আশাবাদ ধ্যান ধারণা ও তথ্য ভিত্তি ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটাই সঠিক তথ্য যে, পার্বত্য উপজাতিরা স্থানীয় আদিবাসিন্দা নয়। ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটিশদের দ্বারা তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসিত, যথা হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ১৯০০ /১ ধারা নম্বর ৫২,এবং ব্রিটিশ বার্মা যুদ্ধ ১৮২৪ এর কার্যকারণ সমূহ। এখন ধারণা ও তথ্যগত ভুল সংশোধন আবশ্যক। তাহলেই উপজাতিসহ দুনিয়াবাসী প্রকৃত ভুলের ব্যাপারে সচকিত হবে, এবং এ ধারণাও জন্ম নিবে যে উপজাতিদের রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের স্থানীয় সংখ্যা প্রাধান্য উদ্বাস্তু সমস্যাজাত কৃত্রিম। বাংলা রাষ্ট্র পক্ষের দুর্ভাগ্য যে সঠিকভাবে উপজাতীয় অতীত সন্ধান করা হয়নি। এর ভিতর একমাত্র ব্যতিক্রম হলো স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক গিরিদর্পণ ভিত্তিক কিছু ধারাবাহিক তথ্যালোচনা, যার লেখক এই অভাগা ব্যক্তি, যিনি অশেষ দুঃখ কষ্ট অনুসন্ধান ও অভাব অসুবিধার ভিতর প্রতিপক্ষের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে স্বদেশ স্বার্থকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এই পরিশ্রমের বিপুল আর্থিক মূল্য তো আছেই, তবে তার ব্যয় নির্বাহে দেশ ও জাতির কোন অবদান নেই। এই সব তথ্য উপাত্তকে কাজে লাগিয়ে

জাতি ও দেশ পার্বত্য সংকট থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। জাতি ও দেশে এই তথ্য উপাত্ত যথার্থভাবে মূল্যায়িত হলে প্রতিপক্ষ নীতিগতভাবে দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য। তাই চলমান পার্বত্য সংকটের পক্ষে তথ্য উপাত্তের যথার্থ মূল্যায়ন ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের পক্ষে প্রথম সাহসী পদক্ষেপ হলো পাকিস্তানী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয় সাহসী পদক্ষেপ হলো ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহারের দাবী বাস্তবায়ন। তৃতীয় সাহসী পদক্ষেপ হলো ঃ পাকিস্তানী দোসর বিহারীদের বৈরী ঘোষণা ও তাদের নাগরিকত্ব বাতিল ও ক্যাম্পে আবদ্ধ করণ। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আর বাঙ্গালী আধিপত্য তৎপর ও বিপদমুক্ত হয় নাই। চাকমা জনগোষ্ঠীর কিছু উচ্চাভিলাষী লোক বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী বৈরীতায় তৎপর। তাদের বিদ্রোহ দমাতে জরুরী হয়ে উঠেছে চতুর্থ সাহসী পদক্ষেপ, যদ্দরুণ স্থাপিত হয়েছে সেনা নিবাস। এবং তারই পক্ষে পঞ্চম সাহসী পদক্ষেপ হলো পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিহীন বাঙ্গালীদের আবাসন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই শেষ দুই পদক্ষেপের পক্ষে অনুকূল তথ্য উপাত্তের চর্চা প্রয়োজনীয় ছিল যার প্রতি সরকার ও জাতি উদাসীন। তাতে ভুল তথ্য উপাত্তকেই অবলম্বন করে বিদ্রোহী উপজাতিরা শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে এবং দেশে বিদেশে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী সমর্থিত হচ্ছে। শান্তি চুক্তি হলো এই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ফয়সালা, যার সুফল শূণ্য।

কোন চুক্তি ও সুযোগ সুবিধাতেও উপজাতীয়রা সন্তুষ্ট নয়। তারা এ পর্যন্ত ৪ বার সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে। শিশু বাংলাদেশকেও তারা রেহাই দেয় নি। তাদের এই অব্যাহত অবাধ্যতাকে আর অবহেলা করা যায় না। এরা বিহারীদের মত অবাধ্য শরণার্থী বংশধর। গণহত্যা ও বিদ্রোহের কারণে এদের বৈরী ঘোষণা, নাগরিকত্ব বাতিল, বিচারে সোপর্দ ও ক্যাম্পে আটক করা আবশ্যক। একমাত্র তাতেই তারা নিজেদের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবে।

পার্বত্য চুক্তি ও তৎসৃষ্ট সুযোগ সুবিধা এই উপজাতীয় অপরাধীদের বাগে আনতে সক্ষম হয়নি। এখন আরো অধিক অপেক্ষা করা বৃথা।

সরকারের নমনীয় তোষামোদ মূলক পার্বত্য নীতির ভুল ও ব্যর্থতাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এই ভুলের মূল কথা হলো বিদ্রোহী উপজাতীয়রা আসলে স্থানীয় আদি বাসিন্দা নয়, তারা বহিরাঞ্চলীয় শরণার্থী বংশধর। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ১৯০০/১ এর ৫২ ধারাতে তাদের অভিবাসন চিহ্নিত। ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ তাদেরকে ভোটাধিকার দান করেনি। সেহেতু ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ এর ভারত ব্যাপ্ত সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। এই বিদ্রোহী উপজাতিদের স্থানীয় আদি নাগরিক হওয়ার দাবী ভুল। দুনিয়া বাসীদের এই তথ্য জানতে দেয়া হচ্ছে না, এবং আমরা নিজেরাও তৎ সম্পর্কে অজ্ঞ। একমাত্র অস্থানীয় হাওয়ার তথ্যই বিদ্রোহীদের দমিয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

সরকার স্থানীয় ইতিহাস উদ্ধার ও প্রচারে মোটেও সক্রিয় নন। এই শূণ্যতা পূরণে ব্যক্তি পর্যায়ে এই অধম কিছু ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছি। আমার লেখা প্রবন্ধ কলাম প্রতিবেদন বই পুস্তক সীমিত আকারে হলেও গত অর্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ এই ধারণা

দিয়ে যাচ্ছে যে, উপজাতায় উচ্চাভিলাষীদের প্রচারিত রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ও প্রচলিত তথ্য উপাত্ত বিভ্রান্তিকর। স্থানীয় প্রকৃত তথ্য তা থেকে ভিন্ন, যা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী স্বার্থের অনুকূল।

আমি স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য প্রচারে কোন রূপ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাইনি। অথচ এই ইতিহাসের প্রকৃত উপকার ভোগী আমি ব্যক্তি নই, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি। আমার জীবনের সমূদয় সঞ্চয় ও উপার্জন এবং কর্মক্ষম সারাটি জীবন একাজে ব্যয় করেছি। এই শ্রমের আর্থিক মূল্য অবশ্যই বিরাট। আমার এই ত্যাগ ও দেশ প্রেম কর্তৃপক্ষীয় পর্যায়ে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। আমি নিজেও তাতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এক অপগন্ডে পরিণত। বিপরীতে বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ মোটা অংকের বেতন ভাতা দামী গাড়ী বাড়ী আর উঁচু পদমর্যাদা ভোগ করছেন। শান্তি তবু সদূর পরাহত।

অর্থকড়ি আর প্রকাশনার অভাবে পার্বত্য সংকট মূল্যায়ন মূলক আমার লেখা গুলো ব্যাপক প্রচারের সুযোগ পায় নি। সরকার এই মুফত মূল্যায়নটি নিজ স্বার্থে কাজে লাগাতেও সক্রিয় নন।

সত্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এদেশের কোন উপনিবেশ বা সংযোজিত অঞ্চল নয়। এবং বাঙ্গালীরাও এই অঞ্চলসহ গোটা বাংলাদেশের মূল স্থায়ী বাসিন্দা। বিপরীতে এতদাঞ্চলে উপজাতীয়রা বৃটিশ আমলের বহিরাগত অভিবাসী। বহিরাগমনের দ্বারা উপজাতীয়রা এখন স্থানীয় ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেলেও, রাজনৈতিক মর্যাদায় তারা অস্থানীয় সংখ্যালঘু। দেশের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙ্গালীদের এতদাঞ্চলে বসবাসের অধিকার মৌলিক, এবং এটি বাংলাদেশের আদি ও অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। সংখ্যালঘু বহিরাগত অভিবাসী জনগোষ্ঠী ভূক্ত লোকদের এতদাঞ্চল থেকে বাঙ্গালী বিতাড়ন আন্দোলন আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগ দাবী, তথা স্বায়ত্ত শাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রন মূলক রাজনৈতিক উচ্ছাভিলাষ, দেশ ও জাতি বিরোধী অপচেষ্টার শামিল। এদের দমিয়ে দেয়া জাতীয় কর্তব্য। এই রাষ্টদ্রোহী ও জাতি বিধ্বংসী তৎপরতা মোটেও সহনীয় নয়। এটা মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার রূপেও মান্য নয়। বাংলাদেশে একক ভাবে বাঙ্গালীরাই মূলত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জাতি। এটা উদারতা যে স্থানীয় অবাঙ্গালী সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভূক্ত করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গৃহীত হয়েছে। কিন্ত এর অর্থ এটা নয় যে কোন বহিরাগত অবাঙ্গালীর জাতি ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম সহ্য করা হবে। এ দেশে সমানাধিকার নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পূর্ব শর্ত হলো তারা নিজেদের অভিবাসী সংখ্যালঘু মানবে, রাষ্ট্র ও বাঙ্গালী বিরোধী কোন অপতৎপরতায় জড়াবে না। কোন রূপ আধিপত্য, অগ্রাধিকার, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ও বাঙ্গালী বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিবে না। এর নিশ্চিয়তা হিসেবে পূবাহ্নেই ঘোষণা দিতে হবে যে সমূদয় উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন বিলুপ্ত হলো, অতীতের সমূদয় হানাহানি সহিংসতা আর বিভেদ অপরাধমূলক বিদ্রোহাত্মক কার্যক্রম, তজ্জন্য দেশ ও জাতির কাছে তারা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। সাধারণ উপজাতীয়রা দেশদ্রোহী, গণহত্যাকারী ও যুদ্ধপরাধের মত দুষ্কর্মের হোতাদের আইন সঙ্গত শাস্তি বিধানে সম্মত।

উপজাতীয় পাড়া প্রধান কারবারী,হেড ম্যান,রাজা, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও চেয়ারম্যার, পৌরসভা সদস্য ও চেয়াম্যান, উপজেলা ও জেলা পরিষদ সদস্য ও

চেয়ারম্যান, স্কুল কলেজের কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষক ইত্যাদি গণ্যমান্যদের একত্রিত হয়ে উপরোক্ত ঘোষণা পত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাক্ষর দিতে হবে। তৎপর কেবল দেশ ও জাতি দ্রোহী অপরাধী বিপদজ্জনক ব্যক্তিদের সংশোধনাগারে আবদ্ধ করাই সংগত হবে। অভিযোগ থেকে সাধারণ নিরীহ লোকেরা রেহাই পাবে। নির্বিচারে সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। বৈরী ঘোষিত চিহ্নিত অপরাধীরা বিচারে সপোর্দ হয়ে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন ,দেশদ্রোহ মূলক অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়।

নির্বিচার উদারতা বাংলাদেশের পক্ষে ক্ষতিকর। অপরাধের বিচার ও শাস্তির উদাহরণ অবশ্যই স্থাপিত হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় স্বদেশ ভূমি নয়। ত্রিপুরাদের জাতীয় স্বদেশ ভূমি ত্রিপুরা রাজ্য, লুসাই বা মিজোদের জাতীয় স্বদেশ ভূমি মিজোরাম, মগ, মারমা, রাখাইন ইত্যাদির জাতীয় স্বদেশ ভূমি আরাকান ও মিয়ানমার, চাকমা তঞ্চগ্যা ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরও জাতীয় স্বদেশ ভূমি আরাকান সহ সীমান্তবর্তী বহিরাঞ্চল। এই অভিবাসী বিদেশী বংশধরদের এতদাঞ্চলে স্বশাসন, স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর কোন মৌলিক ভিত্তি নেই। স্বদেশ ভূমির একাংশ পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার দাবী করা, তদজ্জন্য তাদের উপর আক্রমন অত্যাচার ও দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক প্রচেষ্টা চূড়ান্ত দুষ্কর্ম। উপজাতীদের এ কাজ গুলো পুরস্কার যোগ্য নয়। অথচ তথাকথিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি এমনই এক পুরস্কার ব্যবস্থা। দেশ জাতি ও বহিরবিশ্বের তৎপ্রতি সমর্থন দান প্রহসন বিশেষ। তবে সৌভাগ্যের কথা চুক্তিটি সরকার সমর্থিত হলেও তা আনুষ্ঠিক ভাবে অনুমোদিত নয়। এই চুক্তি গণহত্যা আর দেশ দ্রোহকে ক্ষমা যোগ্য করেনি।দোষ স্বীকার ক্ষমা প্রার্থণা আর আনুগত্যের অঙ্গীকার ছাড়া উপরোক্ত অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ভূক্ত করা যায় না। অপরাধীদের উচ্চপদ. বেতন ভাতা,দামী গাড়ী বাড়ী ইত্যাদির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা ও পালন পোষন কার্যতঃ অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা। এ পর্যন্ত তাতে কোন সুফল ফলেনি। পর্বতাঞ্চলেও শান্তি আসেনি। হালের ঘটনা হলো ক্রস ফায়ারে অসংখ্য দৃস্কৃতিকারীর ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছে, জঙ্গীরা ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলছে, আর দূর্নীতিবাজ হুমরা চুমরা রাঘব বোয়ালরা শাস্তি পাচ্ছে ও জেল খাটছে। এমতাবস্থায় উপজাতীয় দেশদ্রোহী দৃস্কৃতিকারীরা জামাই আদর পাচ্ছে, এটা ভুল কার্যক্রমের ক্ষমতাসীনদের জন্য এক দূর্ভাগ্য জনক উদাহরণ।

পার্বত্য জনসংহতি সমিতির নেতারা অবশ্যই যুদ্ধাপরাধী দেশদ্রোহী ও গণহত্যার হোতা । পাহাড়ী বাঙ্গালী হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ লোককে তারা হতাহত উচ্ছেদ ও নিঃসম্বল করেছে। বাংলাদেশের ৯৯% অধিবাসী বাঙ্গালীরা এদেশের স্থায়ী ও আদি অধিবাসী। পার্বত্য উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়, বহিরাগত। এই ইতিহাসের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির নেতারা বাঙ্গালীদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বহিস্কার দাবী করে, যা জঘন্য অপরাধ। গণহত্যা মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশদ্রোহ, আর বাঙ্গালী বিতাড়ণ দাবী অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। এটা বিনা বিচার ও শাস্তিতে পার পেতে পারে না। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ধারা নম্বর ৫২ তাদেরকে বহিরাগত অভিবাসী রূপে চিহ্নিত করেছে। বৃটিশের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অনুমোদিত সাধারণ নির্বাচনে ভারতব্যাপী ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে সাধারণ

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে প্রদেশ ও কেন্দ্রে সরকার গঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল সে সময় ভোটাধিকার বঞ্চিত। ভোটাধিকার বঞ্চিত উপজাতীয়রা তখন তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উথাপন করেনি। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই ভাবা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা তখন স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দারূপে গণ্য ছিলোনা। তাই তাদের ভোটাধিকার হীন রাখা ছিল যথার্থ। এই মূল্যায়নটিকে মৌলিক ও যথার্থ ভাবা যায়, যা এখনো প্রয়োগ ও প্রবর্তন যোগ্য। তবে পাকিস্তান আমলের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই মূল্যায়নটির ব্যতিক্রম করে পার্বত্য উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দান করা হয়, যা যথার্থ ছিল না বলে এখন প্রত্যাহার যোগ্য। এখন পাকিস্তান আমলের ভোটাধিকার দানকে অব্যাহত রেখে উপজাতীয়দের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা একটি ভুল। এখন এর সংশোধন করা আবশ্যক। এই ভুলেরই প্রতিফল হলো আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে জনসংহতি সমিতির বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীদের অধিকারকে অস্বীকার, পর্বতাঞ্চলে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

বিদ্রোহী উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দানের ভুলকে উদারতা ভাবা হলেও, তাতে কোন সুফল ফলেনি। এটি হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে আত্মহননের শামিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে চাকমা প্রধান ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন এবং ১৮৩০ জন উপজাতীয় রাজাকার ও সিভিল ফোর্সের সশস্ত্রভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা ও তৎপর সশস্ত্র বিদ্রোহ আর গণহত্যা শাস্তি যোগ্য অপরাধ। এরূপ অপরাধের জন্যই অভিবাসী বিহারীরা এখন বৈরী ঘোষিত ও শিবির বাসী হয়ে দূর্ভাগ্যজনক বন্দি জীবন যাপন করছে। বিদ্রোহী উপজাতীয়রাও এরূপ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ভুল স্বীকার, ও ক্ষমা প্রার্থণার মাধ্যমে দেশ ও জাতির অনুকম্পা লাভের সুযোগও তারা নেয়নি। সরকার অযাচিতেই যুদ্ধাপরাধী ত্রিদিব রায়ের অন্যতম পুত্র দেবাশীষ রায়কে উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করেছেন। এই উদারতা ও অনুকম্পার প্রতিদান রূপে তিনি বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। এই দূস্কর্ম সমূহের প্রতিবিধানে আবশ্যক হলো সব অনুকম্পা ও উদারতা রদ করা, শান্তি চুক্তি রহিত করা, অগ্রাধিকার মূলক সব ব্যবস্থা সহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ রহিত করা, এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী উপজাতীয় ভোটাধিকারের অবসান ।

উপজাতীয় দুস্কৃতি কারীদের অপরাধ বোধ না হওয়া এবং জাতি ও দেশের কাছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা, দূর্ভাগ্য জনক। সেদিন অবশ্যই আসন্ন, যেদিন উপজাতীয়রা নিজেদের দূর্কমের জন্য বৈরী ঘোষিত ও বিচারের সম্মুখীন হবে এবং শাস্তি পাবে। জাতি ও দেশের পক্ষে সে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আতিকুর রহমান
ডিএসবি কলোনী , রাঙ্গামাটি
লেখক, গবেষক ও কলামিষ্ট ।

পার্বত্য তথ্য কোষ

গবেষণাপত্র

অধ্যায় (ক)

১। স্থান কাল পাত্র

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের সাথে বহু সম্প্রদায় ও বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশ জড়িত। এর সাথে সংশ্লিষ্ট নাম ও পরিচয় জ্ঞাপক শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ও মূল নির্ণয়ে পন্ডিতমহল পরস্পর ভিন্ন মতের অনুসারী। মনে হয় সরল গ্রহণ যোগ্যতার চাহিদা পূরণে এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা ও মূল নির্ণয় এখনো বাকি আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের চিরকালিন অখন্ড ভৌগোলিক অঞ্চল। ইতিহাস-কালের শুরু থেকে, বঙ্গ তথা বাংলা নাম প্রচলিত এবং এই পার্বত্য অঞ্চল তার অবিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত। অতীতে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে, এটা বিভিন্ন স্থানীয় ও প্রতিবেশী রাজ্য আর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছে। কিন্তু কদাপি ও ভিন্ন দেশের অংশে পরিণত হয়নি। চিরকালই এটা নামে চট্টগ্রাম এবং ভৌগোলিক পরিচয়ে বাংলার আদি অখন্ড অঞ্চল ছিলো এবং আছে। চট্টগ্রামসহ বাংলা বা বঙ্গ নাম হাজারাধিক বছরের প্রাচীন।

অতীতে এতদাঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব খন্ডে খন্ডে বহু রাজশক্তির মাঝে হাত বদল হয়েছে। প্রতিবেশী ত্রিপুরা রাজশক্তি বহুবার এর অভ্যন্তরে তার দখল সম্প্রসারণ করেছে। কখনো আরাকানীদের দ্বারা এটি দাখলিভুত হয়ে, সেদেশের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কদাপিও ভৌগোলিকভাবে এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের অঙ্গিভূত হয়নি। ত্রিপুরা ও রোসাং রাজ্য স্থানীয়ভাবে কখনো এটাকে স্বীয় অঞ্চলে পরিণত করতে সক্ষম হয়নি। যদিও সাময়িক দখলাধীন থাকাকালে এর উত্তরাঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্য এবং দক্ষিণাঞ্চল রোসাং রাজ্য রূপে অভিহিত হয়েছে।'

একাদশ শতাব্দীতে একদা ব্রহ্ম দেশের পঁগা রাজশক্তি আরাকান, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার কিয়দাংশ দখল করেছিলো। বলা হয়ে থাকে, প্রাচীন পাটিকারা রাজ্য, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চল নিয়েই গঠিত ছিলো। পঁগা রাজ্যভুক্ত ত্রিপুরাধীন থাকায় দক্ষিণ সিলেটের মৌলভীবাজার বাসীদের তাই স্থানীয়ভাবে তুচ্ছার্থে এখনো পঁগা সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এটা সেই অতীতের পঁগা দখলের স্মারক সম্বোধন বলেই মনে হয়।

ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ও আরাকান পৃথক অঞ্চল হলেও সেই সুদূর অতীতে কোন সুনির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ ছিল না। তখন সুবিধা মত সীমানার সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ হতো।

বিশেষতঃ পাহাড় ও নদীর প্রাকৃতিক সীমানাকে তখন ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক সীমানা হিসাবে গণ্য করা হতো। এতদাঞ্চলীয় বর্তমান সীমানাগুলো সেই অতীতের মান্য প্রাকৃতিক চৌহদ্দি ও দখলের ভিত্তিতে বৃটিশ আমলে সুনির্দিষ্ট হয়েছে। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান হলো ঃ ২১.২৩-২৫.৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৪৫-৯২.৫০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম।

১৮৬০ খ্রীঃ সালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে, তখনকার চট্টগ্রাম জেলাকে পর্বত আর সমতলে উত্তরে দক্ষিণে বিভক্ত করে, দুই পৃথক জেলায় পরিণত করা হয় এবং পৃথককৃত পর্বতাঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে অভিহিত হয়, যা তৎপূর্বে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল নামেই পরিচিত ছিল। অবশ্য মোগল আমলেও সরকারি ফার্সি ভাষায় এটা কুহিস্তানে চাটগাম নামে আখ্যায়িত হতো এবং পৃথক জেলা হওয়ার আগে ইংলিশে এটা ছিলো হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং। বলা বাহুল্য বর্ণিত বিভিন্ন ভাষী বিশেষণগুলো পরস্পরের প্রতিশব্দ মাত্র। চট্টগ্রাম নামটি উভয় অঞ্চলের সামগ্রিক আদি ও একক নাম। তবে অধুনা এতদাঞ্চল তিন ক্ষুদ্রতর স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত হয়ে, আঞ্চলিক নামে পরিচিত হয়েছে। যদ্দরুণ চট্টগ্রাম নামের ব্যবহার প্রায় উহ্য। অনাগত ভবিষ্যতে হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রাম নামের ব্যবহার আরো সীমিত হয়ে যাবে। তখন কেবল রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলা নামই অভিহিত থাকবে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও আঞ্চলিক পরিষদ নামটির মাধ্যমে সে পরিচয়টি টিকে আছে।

৩। জুম বঙ্গ, জুম নোয়াবাদ ও কার্পাস মহাল।

মোগল আমলের রাজস্ব সংক্রান্ত ইতিহাস ও দলিল পত্রে, জুমখেরাজ ও জুম নোয়াবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন কুহিস্তানে চাটগাম নামে খ্যাত চট্টগ্রামের পর্বতাঞ্চলের মোগল শাসনাধীন এলাকায় জুম চাষ হতো বলে তাকে মাঝে মধ্যে জুম বঙ্গ বলা হতো, যার বিকল্প রাজস্ব নাম ছিলো কার্পাস মহাল। একসনা জুম বন্দোবস্তির আখ্যা ছিলো জুম নোয়াবাদ। এই জুম বংগে বা কার্পাস মহালে তখনকার মসলিন নামে খ্যাত উন্নত বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় কার্পাস তুলা উৎপন্ন হতো, যা জুম অনুমতির বিনিময়ে সংগৃহিত হয়ে চট্টগ্রাম শহরের একটি অংশে গুদামজাত হতো। তজ্জন্য এখনো ঐ এলাকাটি কাপাস গোলা নামে খ্যাত।

৪। বাংলা পঞ্জিকা ও রাজস্ব।

ফল ফসলের মৌসুমে কৃষক সমাজ স্বচ্ছল থাকে। অন্য সময় অভাব হেতু তাদের পক্ষে সরকারি কর ও খাজনাদি পরিশোধ করা কঠিন হয়। মোগল পূর্ব মুসলিম আমলে সরকারিভাবে অনুসৃত রাজস্ব হিসাব ও লেনদেন, হিজরী পঞ্জিকা অনুসারেই পরিচালিত হতো, যা ফল ফসলের মৌসুমের মত স্থির হতো না। সুতরাং অভাবের

সময় কর ও খাজনাদি পরিশোধের দিন ধার্য্য হলে, বকেয়ার পরিমাণ হতো বিপুল। খাজনার জন্য কড়াকড়ি আরোপিত হলে লোকজনকে কষ্ট পেতে হতো। এর সমাধান হিসাবে বাদশাহ আকবরের সময়, তার সিংহাসনে আরোহনের দিন থেকে, হিজরী সনকে চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাসের হিসাবে রূপান্তিত করে, তার নাম দেয়া হয় ফসলী সন। এখন তা-ই বাংলায় বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন।

উশোল নিশ্চিত করার জন্য কর ও খাজনার মাধ্যমকে ফল ফসল ও নগদে দ্বিমুখী করে, জুম বঙ্গে নগদে ও তুলায় সরকারি রাজস্ব আদায় নীতি প্রচলিত হয়। সংগৃহীত তুলা পরে বিক্রয়মূল্যের আকারে সরকারি খাজাঞ্চী খানায় জমা হতো। খান, দেওয়ান, তালুকদার, মৌজাদার, খীসা, কার্বারী, মৌজা, তালুক, সাউর গল (ময়রু খিল) তরফ ইত্যাদি সেই মুসলিম আমলেরই প্রদত্ত রাজস্ব খেতাব ও নাম, যা স্থানীয়ভাবে এখনো চালু আছে। মুসলমানী নাম ও খেতাবধারী আমলা ও উপজাতীয় সর্দারেরা সেই তখন জুম খেরাজ উশোলের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, যাদের বংশধরেরা অদ্যাবধি ঐ সব খেতাবে খান দেওয়ান ইত্যাদি আখ্যায়িত হোন। সম্ভ্রান্ত উপজাতীয় লোকজন এখন আর মুসলমানদের মত আরবী ফার্সী নাম ও খেতাবে ভূষিত হোন না। ভূমি বন্দোবস্তি সাউরগল-এর স্মারক হলো ময়রু খিল নাম। খিসা নামীয় চাকমারা ফার্সী খেশ-এর বহুবচন খেঁশা শব্দের অপভ্রংশে সম্বোধিত হোন। বৃটিশ আমলের মাঝামাঝি রাজা হরিশ চন্দ্র থেকেই চাকমারা নামে ও খেতাবে অমুসলিম ধারার অনুসারী। তবু তাদের ভাষা, আচার-আচরণ ও দরবারী অনুষ্ঠানে মুসলিম ও মোগলাই ধারা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। চাকমা রাজারা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মোগল দরবারী আড়ম্বরে অভ্যস্ত। তারা মোগলাই লেবাস পরেন ও হুজুর সম্বোধিত হোন। তাদের মহিষীরা ও আখ্যায়িত হোন বিবি বলে।

৫। শাহ সুজা সড়ক।

এটা বিস্ময়কর যে, শাহ্জাদা সুজা, পিতৃরাজ্য হিন্দুস্তান দখলে ব্যর্থ হলেও সাময়িক শাহ নামে সম্বোধিত হয়েছিলেন। তখনকার মোগল অধিকারের বাহিরে অবস্থিত দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানমুখী সড়কটি এখনো তার নামেই অভিহিত হয়। কালের কষাঘাত আর অবহেলা সহ্য করেও, এখন পর্যন্ত তা বেশ চওড়া আর অক্ষুণ্ন রয়েছে। সীমান্তবর্তী থানা লামা ও নাক্ষ্যংছড়ি ভেদ করে, চলমান সড়কটি সগর্বে ঐ মোগল শাহ্জাদা ও সুবে বাংলার সুবেদারের স্মৃতি ধারণ করে, সীমান্ত নদী নাফের তীর পর্যন্ত, মোগলদের বার্মামুখী অভিযানের স্মারক হয়ে বহাল আছে।

সুজার নামে সড়কটি অভিহিত হলেও তার দ্বারা তা নির্মিত হওয়া সম্ভব নয়। ১৬৬০ খ্রীঃ সালে তার আরাকানে পলায়নকালে সুবে বাংলার মোগল অধিকার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের, ফেনী নদী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো। সুজা পরিবারের প্রতি আরাকানে অনুষ্ঠিত নির্মম অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াতেই তদীয় ভাই বাদশাহ আওরঙ্গজেব, বাংলার তৎকালীন সুবাদার শায়েস্তা খাঁকে, আরাকান অভিযানের আদেশ দেন।

তৎপরিপ্রেক্ষিতে সুবাদার তনয় বুজুর্গ উমেদ খাঁর নেতৃত্বে, আরাকানমুখী অভিযান পরিচালিত এবং ১৬৬৬ খ্রীঃ সালে প্রথমত ঃ চট্টগ্রামের শঙ্খ নদী পর্যন্ত উত্তরাঞ্চল বিজিত হয়। নাফ নদী পর্যন্ত অবশিষ্ট দক্ষিণ চট্টগ্রামের দখল ধীরে ধীরে ও খন্ডে খন্ডে পরবর্তী নব্বই বছরে, তথা ১৭৫৬ খ্রীঃ সালে সমাপ্ত হয়। সুতরাং নিজ শাসন বহির্ভূত অঞ্চলে সুজার দ্বারা ঐ সড়ক নির্মাণ সম্ভব ছিলো না। তবে এটা সম্ভব যে যাত্রাকালে তিনি কোন পুরাতন পরিত্যক্ত সড়ক সংস্কার করে অগ্রসর হয়েছিলেন, অথবা পরবর্তী মোগল শাসকেরা তাদের নিয়ন্ত্রণকালে তা নির্মাণ বা পুনরনির্মাণ করেছিলেন, যা সহানুভূতিবশতঃ সুজার দুঃখজনক স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য অথবা শ্রদ্ধাবশতঃই ঐ নামে অভিহিত হয়েছে।

৬। চট্টগ্রাম সংক্রান্ত নাম রহস্য।

চট্টগ্রাম নামের শব্দ মূল নির্ণয়ে পন্ডিত মহল বিভক্ত। কেউ বলেন আরাকান রাজ সুলত ইংগ চন্দ্র ৯৫৩ খ্রীঃ সালে, কুমিরার কাউনিয়া ছড়া এলাকায়, একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করে তাতে 'চিৎ তৌৎ গোং' বাক্য উৎকীর্ণ করেন, যার বাংলা অর্থ হলো 'যুদ্ধ করা অনুচিতম্ব, পরে তা-ই অপভ্রংশে চট্টগ্রাম নামে পরিণত হয়েছে।
আমার মতে এ ব্যাখ্যাটি যথার্থ নয়। তখন মঘী বর্ণ ও ভাষা এতদাঞ্চলে প্রচলিত ছিলো না। বাঙ্গালী জনসাধারণের দ্বারা তার পঠন ও মর্মোদ্ধার সম্ভব ছিলো বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় ঐ বিজাতীয় বাক্য থেকে আপনাতেই 'চিটাগাং বা চট্টগ্রাম নামের উদ্ভব হতে পারে না। তবে এটা সম্ভব যে, আদতে তা কোন মঘী বাক্য নয়। তখনকার প্রচলিত স্থানীয় চিটাগাং নামেরই মঘী প্রকাশ। ঐ রাজার অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্ত খুটি হিসাবে এটি স্থাপিত হয়ে থাকবে। এই ব্যাখ্যার দ্বারা অনুরূপ মঘী বাক্য থাকাকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। একের বুলি অপরের গালি হওয়া সম্ভব। আদতে চিটাগাং নাম স্থানীয় প্রাচীন ও মৌলিক। শব্দগুণেই ব্যাখ্যাটি যথার্থ।

চিটা ও গাং দেশী বাংলা শব্দ। প্রথমটির অর্থ গুড়ের তরল বর্জ্যাংশ এবং দ্বিতীয়টির অর্থ নদী। নদী বিধৌত ও চিটা ভোগী এই অঞ্চল, তার বাংলা ভাষী অধিবাসীদের দ্বারা চিটাগাং নামে অভিহিত হতে পারে, এটাই স্বাভাবিক। এই সূত্রে নামটি বিদেশী নয়, স্থানীয় এবং সর্ব প্রাচীন।

এই সাথে আরেক সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। মূল 'সীতা' থেকে চিটা অপভ্রংশ, যার সাথে নদী অর্থবোধক গাং শব্দের সমাস হয়েছে। কারণ এতদাঞ্চলে অনুরূপ নামের প্রচলন একাধিক ক্ষেত্রে আরোপিত আছে, যথা সীতাকুন্ড, সীতা পাহাড় ইত্যাদি, তা থেকেও চিটাগাং নামের উৎপত্তি হতে পারে। দ্বিতীয় নাম চট্টগ্রামের বিতর্কিত শব্দ মূল হলো চৈত বা চৈত্য, যোগ গ্রাম। সমাসবদ্ধ এই শব্দেরই অপভ্রংশ চট্টগ্রাম। এই ব্যাখ্যাটি সহজগ্রাহ্য, তবে বাঙ্গালীদের উচ্চারণে ত বর্ণ 'ট' তে রূপান্তরিত হয় না, তাই এটা সন্দেহমুক্ত নয়। বিদেশী ও বিজাতীয় ব্যবহারে এরূপ রূপান্তর ঘটা সম্ভব, যা একটি দুর্বল যুক্তি।

অপর অভিমত হলো ঃ চাটিগাঁ থেকে চট্টগ্রাম। এটি স্থানীয় দরবেশ-ভক্তদের দ্বারা প্রচারিত জনশ্রুতি। কথিত হয়, দরবেশ বদর শাহ সমুদ্র পথে ভেসে এসে, কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম তীরে অবতীর্ণ হোন। তৎপর জীন পরীদের কাছ থেকে চেয়ে নেন একচাটি বা প্রদীপের জায়গা, সেটি চট্টগ্রাম শহরের জামাল খাঁন এলাকায়, চেরাগীর পাহাড় নামে এখনো চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐ প্রদীপের আলোর প্রভাবে জীন, পরীরা বিতাড়িত হয়, এবং তৎপর এই অঞ্চলে জনপদ গড়ে ওঠে। কাহিনীটি সম্পুর্ণ ভক্তিজাত জনশ্রুতি। উন্নয়নমূলক নির্মাণ কাজ ও স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় বর্তমানে চেরাগীর পাহাড়টি বিলীয়মান।

ভিন্ন এক অভিমত হলো ঃ আরবী বনিকদের দ্বারা এটি সাত গাং নামে অভিহিত হয়। বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শব্দটি চিটাগাং নামে পরিণত হয়েছে। ব্যাখ্যাটি সম্পুর্ণ অনুমান ভিত্তিক। কারণ আরবী ভাষায় 'গ আর 'ং বর্ণ উচ্চারিত হয় না। সমাস বা সন্ধি স্থলেও সে ভাষায় আল পদ যুক্ত হয়। বর্ণিত সাত গাং শব্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। সুতরাং সাত গাং বা আরব বণিকদের দ্বারা সাত গংগা থেকে চিটাগাং বা চট্টগ্রাম নামের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব। এটা সম্পুর্ণ ভুল অভিমত। এমনি ইবনে বতুতা কথিত সাতকাওরান নামটি চিটাগাং বা চট্টগ্রামের আদি নাম নয়। সেটির মূল শব্দ সাতকানিয়া। শঙ্খ নদী তীরে এ নামের একটি প্রাচীন বন্দর ছিলো এখন এটি সমুদ্র তীরবর্তী একটি উপজেলা। অন্য অভিমতটি হলো রাজা গণেশ বা দনুজ মর্দনের প্রবর্তিত মুদ্রায় নাকি চাটিগ্রাম নামের উল্লেখ আছে। এটা ঐ সময়ের প্রচলিত নাম হতে পারে।

এর পরের সম্ভাবনাটিও প্রত্ন নিদর্শন ভিত্তিক। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (সময়কাল ১৩৮৯-১৪০৯) ও জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ (কার্যকাল ১৪১৮-৩২ খ্রীঃ সাল) নিজ নিজ মুদ্রায় নাকি চাটি গাঁও নাম শব্দটির উল্লেখ করেছেন। এটা ঐ সময়ে চাটিগাঁও নাম প্রচলিত থাকার প্রমাণ।

অপর নাম চাটগামের উল্লেখ, মোগল আমল থেকে পরবর্তীকালের ফার্সি ও উর্দু পুঁথি পুস্তকে আর সরকারি বিবরণে সন্নিবেশিত আছে। তবে সাত গাঁও থেকেও চট্টগ্রাম নাম উদ্ভুত হতে পারে। দক্ষিণ বাংলায় হুগলীর উপকূলীয় অঞ্চলে উক্ত নামের একটি প্রাচীন বন্দর ছিলো যার ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে। বিদেশী নাবিকদের দ্বারা ভুল ক্রমে ঐ নামে কর্ণফুলী মোহনার বন্দরটির আখ্যায়িত হওয়াও সম্ভব। চাটিগাঁ ও চট্টল চট্টগ্রামেরই আহলাদী অপভ্রংশ-বলে অনুমান করা যায়।

৭। সীমান্ত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক সীমান্ত স্থায়ীভাবে বৃটিশদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে নির্ধারিত উত্তর সীমান্ত, অতীতে কখনো স্থির ছিলো না। প্রাচীন স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য, বার বার এর সীমান্ত লঙ্গন করে, কাচালং মাইনী উপত্যকায় দখল সম্প্রসারণে লিপ্ত ছিলো। লুসাই সীমান্তের স্বাধীন

কুকিরা ও পূর্ব সীমান্ত লঙ্গন করে বারবার এর অভ্যন্তরে আক্রমণ ও উৎপাত ঘটিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বের আরাকানীরা অনেকবার ফেনী নদী পর্যন্ত শাসন করেছে, তবু নাফ নদী ছিলো স্বীকৃত সীমান্ত। তবে কোন আগ্রাসী শক্তির দখলই স্থায়ী হয়নি। একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে প্রাচীন চট্টগ্রামের স্বীকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান অক্ষুণ্ন ছিলো। তারই ভিত্তিতে বৃটিশ আমলে এর আন্তর্জাতিক সীমান্ত, একটি স্থায়ী সীমারেখায় চিহ্নিত হয়। আমাদের জানা মতে, লুসাই বা মিজোরাম সীমান্তের দেমাগ্রী উপত্যকার সাময়িকভাবে০ দখলকৃত ৪৫ বর্গমাইল এলাকা ১৯৯৩ খ্রীঃ সালে ছেড়ে দেয়া ছাড়া, পুরাতন সীমান্তের আর কোন রদবদল হয়নি। অবশ্য চট্টগ্রামের সাথে এই পর্বতাঞ্চলের আঞ্চলিক যোগ-বিয়োগের ধারায়, একদা কক্সবাজারভুক্ত কিছু অঞ্চলও ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

বহির্দেশীয় দখলের কারণে, উত্তর কাচালং ও মাইনী উপত্যকা সাময়িক ত্রিপুরাধীন হলেও তা ভৌগোলিকভাবে কখনো ত্রিপুরার নাম ধারণ করেনি। ঠিক তেমনি শঙ্খ ও মাতামুহুরী উপত্যকা বহুদিন আরাকানের রোসাং রাজ্যাধীন অঞ্চল রূপে শাসিত হলেও, হামেশা তাতে আঞ্চলিক চট্টগ্রামী স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিলো। ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে উত্তর আরাকানীরা চিরকালই ভৌগোলিকভাবে রোয়াংগ্যা নামে খ্যাত এবং ত্রিপুরাবাসীরা স্বতন্ত্র টিপরা নামে অভিহিত, এমনি চট্টগ্রামবাসীরা চাঁটগেয়ে। এটাই স্বাতন্ত্র্যের নজির।

৮। চাকমা প্রধানদের জমিদারী ও তহসিলদারী।

১৭৩৭ খ্রীঃ সালে চট্টগ্রামের মোগল ফৌজদার জুলকদর খান, কার্পাস মহালের খাতে পাহাড়ী উপজাতিদের প্রদেয় খাজনা উশোলের দায়িত্ব আরাকান থেকে আগত অভিবাসী শের মস্ত খানের উপর ন্যস্ত করেন, যে দায়িত্বকে তহসিলদারী বলা যায়। এর অতিরিক্ত তাকে কোদালার মাওদায় কিছু জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। কিন্তু ইংরেজ প্রধান মিঃ ভেরেলষ্ট কর্তৃক ১৭৬৩ সালে, লুসাই পাহাড় শঙ্খ ও ফেনীর মধ্যবর্তী কার্পাস মহাল ভুক্ত পার্বত্য অঞ্চলকে শের মস্ত খাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করায় জমিদারী ও তহসিলদারীর এখতিয়ারের ধারণায় বিভ্রান্তি দেখা দেয়। ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলে এই বিভ্রান্তি বলে চাকমা রাজারা উত্তরাঞ্চলের সর্বত্র নিজেদের জমিদারী প্রভাব বিস্তার করেন। এর শত বছর পর রাণী কালিন্দির আমলে কার্পাস মহাল ও জমিদারীর পার্থক্য নিয়ে সরকারের বোধোদয় হয়। সরকার মাওদা বহির্ভূত সমুদয় পাহাড় বন ও নদী-নালাকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেন। ফলে রাণী আপত্তি উথাপন করেন ও গোটা জুম বঙ্গই তার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করেন। তাতে চট্টগ্রামের কালেক্টর মিঃ স্মিত ২ জানুয়ারী ১৮৬৬ তে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

'আবেদনকারিণী বলেন ঃ এসব ভূমি তার স্বত্বাধিকারভুক্ত জমিদারীর অংশ, খাস নয়। তিনি মিঃ ভেরে লষ্টের ১৭৬৩ সালের ঘোষণার উপর নির্ভর করে, এই আপত্তি

পেশ করেছেন। তদানিন্তন চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধান মিঃ হেরী ভেরেলস্ট সন্তোষের সাথে প্রকাশ করেছিলেন যে, ফেনী থেকে শঙ্খ ও নিমাজপুর সড়ক থেকে কুকি রাজ্য পর্যন্ত সমগ্র পর্বতাঞ্চল রাজা শের মস্ত খাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। তাতে এ আদেশও প্রদত্ত হয়েছিলো যে, সরকারের রাজস্ব চালালে এটা তাদের দখলেই থাকবে। তদুপরি অধঃস্তন কর্মচারীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ছিলো যে, কেউ যেন এ ব্যাপারে তার উত্তরাধিকারীদের উপর হস্তক্ষেপ না করেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, যদি এ দাবী বহাল রাখা হয়, তাহলে আইনগতই এটা রাণীর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। উক্ত ঘোষণার বলে চিহ্নিত উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্রই রাণীর স্বত্ব সমভাবে বর্তাবে। অথচ এটা সরকারের তুলা মহাল।

কিন্তু আসলে এই অঞ্চলের জুমিয়াদের কাছ থেকে কেবল জুমকর, নগদে বা কার্পাস তুলার আকারে উশোলের দায়িত্বই তাদের উপর ন্যস্ত ছিলো। এই নেতিবাচক মন্তব্যের বিপক্ষে, রাণী রাজস্ব বোর্ডের নিকট আপীল দায়ের করেন। রাজস্ব বোর্ড স্বীয় চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ মূলে নিম্নোক্ত রায় প্রদান করেন ঃ

'কালেক্টর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এটা যাচাই করেছেন। খাস ও পতিত জমির উপর রাণীর কোন স্বত্ব নেই। তিনি পাহাড়ী জুমিয়াদের সর্দার মাত্র! জমির খাজনা রাণী নিতে পারেন না। তিনি কেবল পারিবারিক জুমকর উশোলের অধিকারী। কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় একমাত্র সরকারই খাস ও পতিত জমির স্বত্বাধিকারী। এটা অপর কোন প্রকার স্বত্বের দ্বারা দায়বদ্ধ নয়। সুতরাং আপীলটি অগ্রাহ্য করা হলো।'

তৎপর রাণী জুম বঙ্গের স্থায়ী বন্দোবস্ত লাভের আবেদন করেন, কিন্তু সরকার চিঠি নং ২৯৫ তাং ২১ শে জানুয়ারি ১৮৭০ খ্রীঃ মূলে নিম্নোক্ত আদেশ জারি করেন, যথাঃ

'বিগত ১২ই নভেম্বর ১৮৬৮ খ্রীঃ তারিখে লিখিত চিঠি নং ৪২১-এর প্রস্তাবানুসারে মাননীয় লেফটেনেন্ট গভর্ণর হেডম্যান নিয়োগ প্রথা অনুমোদন করেছিলেন। এরা পাড়াবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে রাজাদের দ্বারা নিযুক্ত হবেন। ডেপুটি কমিশনারের কাছে তাদের একটি তালিকা থাকবে। রাজারা যাবতীয় পরিবর্তনের সংবাদ যথাসময়ে তাকে অবহিত করবেন। হেডম্যানরা রাজাদের পক্ষে জুমকর আদায় এবং যাবতীয় নালিশ ডিপুটি কমিশনারের নিকট পেশ করবেন। এবং তা পরিচালনা ও প্রমাণাদি যোগাড়েরও দায়িত্ব তাদের উপর থাকবে। সাধারণতঃ তারা ডিপুটি কমিশনারের আদেশ পালনে বাধ্য থাকবেন।......রাণীকে এটা জানাবার অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ...যতদিন পর্যন্ত তার সতিন পক্ষীয় নাতি বাবু হরিশচন্দ্র এই সম্পত্তি ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়-দায়িত্ব পালনে সম্পৃক্ত থাকবেন, ততদিন রাণী কর্তৃপক্ষীয় আদেশ নিষেধের আওতায়, নিজ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। তাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিবেন যে, তিনি সর্দার প্রতিনিধি মাত্র। এই পর্বতাঞ্চলে তার কোন স্বত্বাধিকার নেই। লেফটেনেন্ট গর্ভনর ক্ষমতা দিচ্ছেন যে, রাণীর শাসনের অন্তর্ভুক্ত

পার্বত্য প্রথাভুক্ত ব্যাপারাদিতে আপনি আপত্তি উত্থাপন ও হস্তক্ষেপ করতে, এবং যাবতীয় তালুকদারী ও ইজারাদারী রহিত করার আদেশ দিতে পারবেন। এই সব তালুকদার যদি চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত হোন, তাহলে তারা রোয়াজা বা হেডম্যান হবেন। যদি রাণী পাহাড়ে বসবাস করতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হোন, তাহলে বাবু হরিশচন্দ্রই তথায় বাস করবেন, এবং ডিপুটি কমিশনারের সাথে স্বয়ং সম্পর্ক রাখবেন। যদি দেখা যায়, রাণী তাতে বাধা দিচ্ছেন বা কর্তব্য পালনে শৈথিল্য দেখাচ্ছেন, তখন তাকে সরবরাহকারের দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত করতে সরকার মোটেও ইতস্ততঃ করবেন না। এতদ ব্যাপারে তাঁকে সাবধান করে দেয়া হল।'

এ পর্যন্ত জুম করের পরিমাণ নির্ধারিত ছিলো না। হেডম্যানরা প্রজাদের সাথে বুঝাপড়া করে, একটা আপোষ রফায় উপনীত হতেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে বাংলার প্রাদেশিক সরকারের এক প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে, ১৮৬৯ সনে প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারের উপর বার্ষিক চার টাকা হারে কর ধার্যের বিষয় কর্তৃপক্ষীয়ভাবে উত্থাপিত হয়। পরে তা-ই হয় পর্বতাঞ্চলে, জুম রাজস্ব সংগ্রহের ভিত্তি। পরবর্তীকালে এর পরিমাণ বেড়ে প্রথমে পাঁচ টাকা ও পরে ছয় টাকায় পরিণত হয়েছে।

কৃষকদের উপর বাড়তি কোন রূপ দায় চাপানোর প্রতি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও, হেডম্যান ও রাজাদের পক্ষ থেকে বহুবিধ দাবী আদায় করা হতো, এবং যার পরিমাণ ছিলো অত্যন্ত চড়া। রাণী কালিন্দির একটি পাট্টায়-এর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সরকার চিঠি নং-১৯৮৫ এল আর ৭৮৭ তাং ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৮১ খ্রীঃ মূলে তিন উপজাতীয় সার্কেল ভাগ ও সেগুলোর সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে মাং সার্কেল স্বীকৃতি লাভ করে। বর্ণিত চিঠি অনুযায়ী গোটা পর্বতাঞ্চল তিন উপজাতীয় সার্কেল ও দুই খাস মহালে বিভক্ত হয়।

পরিবার প্রতি ৫ জন হিসাব ৪১২২০ জন। এই হিসাবে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরাসহ সামগ্রিক। তবে চিঠি নং-১২১ পিডি, তাং ২৩ এপ্রিল ১৮৮৪ মুলে বলা হয় ১৮৮১ এর আদমশুমারী অনুসারে চাকমা উপজাতীয় পরিবার সংখ্যা হলো মোট ঃ ৬২৭৫। পরিবার প্রতি ৫ জনের হিসাবে সে সংখ্যা হয় মোট ৩১২৭৫ জন। এই হিসাব স্থানীয়।

উজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট রাঙ্গামাটির প্রয়াত পরিচালক বাবু সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরার প্রদত্ত হিসাব অনুসারে ১৮৭২ সালে মোট চাকমা জনসংখ্যা ছিলো ২৫১১০ জন মাত্র। এতে মোট করদাতা জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ৬০৬৯টি। সরকার পরিবার প্রতি এক টাকা হারে বার্ষিক ৬০৬৯ টাকা জুমকর প্রাপ্য হোন। কিন্তু লুসাই অভিযানকালে হরিশচন্দ্র রায় সরকারকে মূল্যবান সহায়তা প্রদান করায়, ১৮৭২ সালের ৯ই অক্টোবরের চিণি নং ৫৭৬৩ মূলে বার্ষিক ১১৪৩ টাকা রেয়াত মঞ্জুর করা হয়। তাতে প্রদেয় খাজনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯২৬ টাকায়। পুর্বের ১০৮১/৪ পাই জমাকে ৪৯২৬ টাকায় সহসা উন্নীত করার প্রস্তাব, লেঃ গর্ভনর যুক্তিসঙ্গত মনে না

করায়, ক্রমান্বয়ে তা আরোপিত হয়।
রাজা ভুবন মোহন রায়ের অভিষেক উপলক্ষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ সালে, কলকাতার বেলভেডিয়া প্রাসাদে আহুত অনুষ্ঠানে লেঃ গর্ভনর স্যার উড বার্ণ নিম্নোক্ত ভাষণ দেনঃ
'আপনি উত্তরাধিকার সুত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সম্প্রদায়ের সর্দারী পদ লাভ উপলক্ষে, যে খেতাব লাভ করেছেন, তদ্বারা আজ আপনাকে বিভূষিত করা আমার এক সুখকর কর্তব্য। আপনার সম্প্রদায় সংখ্যায় অনেক এবং পার্বত্য অঞ্চলের বৃহদাংশ জুড়ে বসবাস করছে। আপনার সার্কেলের শাসন পরিচালনা, গুরুতর দায়িত্ব, যা সবিশেষ চাতুর্য্য, ও নৈপুণ্য সম্পন্ন কাজ। আপনি যুবক, অধিকন্তু দীর্ঘ বাল্যকাল কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে অতিবাহিত করে বয়ঃপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ, যা আপনাকে সময় সময় দেয়া হবে, তাতে সার্কেলের কার্যাদি সম্পাদনে এবং আপনার ব্যক্তিগত আর মাতবরগণের ও লোকজনের সুবিধা বৃদ্ধিতে আপনি সক্ষম হবেন।

পার্বত্য সম্প্রদায়সমুহের অবস্থার উন্নতিকল্পে যে সব উপায় অবলম্বন করা দরকার, তৎপ্রতি আপনি ও অন্যান্য সর্দারেরা সহায়তা প্রদান করবেন বলে সরকার আশাবাদী। সরকার পর্বতবাসীদের যাযাবর আদিম অভ্যাস পরিহার পূর্বক জমি যেখানে পাওয়া যায় সেখানে লাঙ্গলের চাষ অবলম্বন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বলে আপনার জানা আছে।

উল্লেখ্য যে রাজা ভুবন মোহন রায় ৬ই মে ১৮৭৬ খ্রীঃ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাকমা রাজ পরিবারের মাঝে প্রথম প্রবেশিকা উত্তীর্ণ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। উপজাতি বহির্ভুতদের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধের সূত্রপাত হয় তারই দুই পুত্র সন্তানের মাধ্যমে। এটি তার মর্যাদা ও কৌলিন্য বৃদ্ধির অনুকূল পদক্ষেপ ছিল।

৯। রীতিনীতি প্রথা ও দাসত্ব ঃ

উপজাতীয় জুমিয়াদের মাঝে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা নিষ্কর যথা ঃ খিসা, কারবারী, হেডম্যান, রোয়াজা, বিধবা, বিপত্নিক, চীর রোগী, প্রতিবন্ধী, কুমার, কুমারী, এতিম, দেওয়ান, তালুকদার ও ধর্মযাজক।
রাজা বাহাদুর প্রথা অনুযায়ী দেওয়ান, তালুকদার, খিসা, রোয়াজা হেডম্যান ও কারবারী ভিন্ন, অন্য কারো বাড়ীতে যান না। প্রয়োজনে ঐ ভিন্ন মর্যাদার সাধারণ ব্যক্তিদের উপরোক্ত পদবির যে কোন একটিতে উন্নীত করতে হয়। রাজপরিবার ব্যতীত সাধারণ প্রজাদের কারো অলঙ্কার পরিধান নিষিদ্ধ। সদর মৌজাধীন সাধারণ প্রজা বিশেষত ঃ ত্রিপুরা ও ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অবাঙ্গালী প্রজাদের পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ, জুতা-মোজা ব্যবহার, উচ্চ শিক্ষা ও পেশা গ্রহণের অধিকার নজরানা প্রদান সাপেক্ষ। সম্ভ্রান্ত পরিবার সমূহের মহিলা ব্যতীত অন্যদের পর্দা পালনীয় নয়। চাকমা

রাজাদের খাস দাসত্বভুক্ত কিছু ত্রিপুরা প্রজা আছে, যাদের পূর্ব পুরুষদের রাজ সেবার জন্য কিনে নেয়া হয়েছিলো। পরে বৈবাহিক সুত্রে কিছু বড়ুয়া মগ ও অন্যান্য লোকজনও ঐ দাস সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরা রাজ পারিয়া বা পাড়ালিয়া নামে অভিহিত। প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারের কাছে রাজা ও হেডম্যানদের বেগার শ্রম প্রাপ্য বার্ষিক চারদিন। অপারগতায় প্রতি শ্রম দিনের জন্য এক টাকা জরিমানা প্রদেয়।

দেওয়ান ও তালুকদারেরা রাজা থেকে নজর নিয়াজ ও সালামী পরিশোধের মাধ্যমে মৌজা ও তালুকের অধিকার আদায় করে নিতেন। রায়তদের নিকট থেকে নির্ধারিত জুমকরের অতিরিক্ত পরিবার প্রতি বার্ষিক ৩৪ টাকা পর্যন্ত এবং পনর দিনের বেগার শ্রম অথবা দিন প্রতি দু'টাকা জরিমানা আদায় করা হতো। তা থেকে ঘর প্রতি পঞ্চাশ পয়সা ও মোট বার্ষিক ১৫ দিনের বেগার শ্রম রাজা পেতেন। এটা ছাড়াও বছরের প্রথম ফল ফলস, শিকারলব্ধ প্রাণীর একটি রান, নিজেদের কারো বিবাহে প্রত্যেক প্রজা পরিবার থেকে এক টাকা চাঁদা, কিছু ভোজ্য সামগ্রী ও মদ আদায় করা হতো। রাজ পরিবারভুক্ত কারো বিবাহে সাধারণ প্রজা বাদেও হেডম্যান ও তালুকদারদের পাঁচ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত চাঁদা ও কিছু ভোগ্য সামগ্রী যোগান দিতে হতো। এর ভিন্নতায় প্রজাদের পাঁচ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যেতো।

নজর ও নজরানার মাধ্যমে দেওয়ান ও তালুকদারেরা রাজার নিকট থেকে কর আদায় সংক্রান্ত প্রজাস্বত্ব কিনে নিতেন। তজ্জন্য তাদেরকে নির্দিষ্ট এলাকার লোকসংখ্যা ভিত্তিক পাট্টা দেয়া হতো। পাট্টা বহির্ভুত প্রজারা রাজার খাস এখতিয়ারাধীন থাকতো।
রায়তদের বিবাহে এক বিড়া পান, আটটি সুপারি ও এক বোতল মদ ভেট সহ হেডম্যানের নিমন্ত্রণ প্রাপ্য। নালিশ প্রতি এক টাকা সেলামিও তাকে দেয়। হেডম্যানেরা বিচার কাজে সর্বোচ্চ পঁচিশ টাকা জরিমানা, রাজারা পঞ্চাশ টাকা এবং জেলা প্রশাসকের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ পর্যন্ত অপরাধীদের আটক করে রাখার অধিকারী হোন। জরিমানার টাকাতেও তাদের ভাগ প্রাপ্য।

১০। রাজস্ব খাত উশোল বন্টন।
১। কেপিটেশন টেক্স বা জুমকর ঃ এটা জুমিয়াদের প্রদেয়। রাজাদের পক্ষে মৌজা হেডম্যান বা মাতবরগণ তার সংগ্রাহক।

২। ভূমি কর ঃ সমতল লাঙ্গল ভূমি ও পাহাড়ভুক্ত ঢালু ও সমতল বাগান ভূমির উপর এটি প্রযোজ্য। এটি প্রথম শ্রেণী একরে বার্ষিক তিন টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী দু'টাকা ও তৃতীয় শ্রেণী এক টাকা হারে প্রদেয়। বন্দোবস্তির পর আবাদ কালিন প্রথম তিন বছর নিষ্কর, তবে এইকর সরাসরি ট্রেজারিতে উশোলযোগ্য, এবং হেডম্যানদের কাছেও প্রদেয়। এটা তাদের মৌলিক নয়, অতিরিক্ত দায়িত্ব।

৩। জমি বহির্ভুত কর ঃ এটা ট্রেজারিতে প্রদেয়।

৪। ছনখলা ও গর্জন খলা কর ঃ সরাকরি ট্রেজারিতে প্রদেয়।

৫। জলকর, বন্দুককর, খোয়াজ কর, চরানীকর, পারঘাটা কর, আবগারী কর ও বনজ শুল্ক সরাসরি ট্রেজারির মাধ্যমে সরকারের প্রাপ্য।

৬। সরকার জুমকর ও ভূমিকর বাদে অন্যান্য রাজস্ব উশোলের জন্য বার্ষিক নিলাম ও ইজারার মাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন। কর আদায়ের সুবিধার জন্য ১৮৯০ সালে চাকমা সার্কেলকে নয়টি তালুকে বিভক্ত করা হয়েছিলো। পরে সংরক্ষিত বন বাদে গোটা পর্বতাঞ্চলকে ৩৭৩টি মৌজায় বিভক্ত করে তালুক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হয়।

(ক) বিলুপ্ত চাকমা তালুক ও তার প্রধানদের তালিকা ঃ

১। তালুক ঃ কাঁচা লং, তালুকদার ঃ ইন্দ্রজয় দেওয়ান

২। তালুক ঃ চেঙ্গী, তালুকদার ঃ নীল চন্দ্র দেওয়ান

৩। তালুক ঃ মহা পুরুং, তালুকদার ঃ রাজ চন্দ্র দেওয়ান

৪। তালুক ঃ সর্তা, তালুকদার ঃ কমলাঙ্গ চৌধুরী

৫। তালুক ঃ ইছামতি, তালুকদার ঃ শরৎ চন্দ্র রোয়াজা

৬। তালুক ঃ রাঙ্গামাটি, তালুকদার ঃ কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান

৭। তালুক ঃ রাজ ভবন বা সদরঃ চাকমা রাজাদের খাস

৮। তালুক ঃ সুবলং, তালুকদার ঃ ত্রিলোচণ দেওয়ান

৯। তালুক ঃ বড়কল, তালুকদার ঃ কুমার রমণী মোহন রায়

পরে এই তালুকভুক্ত অঞ্চলগুলো ১২৪টি মৌজায় বিভক্ত হয়। এগুরো চাকমা সার্কেলভুক্ত। প্রত্যেক মৌজায় নিষ্কর সার্ভিস ল্যান্ড বা সেবা ভূমি নামে পঞ্চাশ একর উত্তম জমি সংরক্ষিত রাখা হয়। তা থেকে পঁচিশ একর হেডম্যান নিজ চাষাবাদে রাখেন। বাকী জমি সরকারী প্রয়োজন, রাজসেবা, সরকারী কর্মকর্তা সেবা কারবারী খি।া ইত্যাদি করসেবীদের ভোগে লাগান হয়।

(খ) কর, খাজনা ও মাসোহারার ভাগ বন্টন

ক) মাসোহারা ঃ

(১) রাজা বা সার্কেল চীফ মাসিক টাঃ	৫০০০/-
(২) হেডম্যান বা মৌজা প্রধান মাসিক টাঃ	৩০০/-
(৩) কার্বারী বা পাড়া প্রধান মাসিক টাঃ	২০০/-

(খ) জুমকরের ভাগঃ

(১) রাজা বা চীফঃ জুমিয়া পরিবার পিছু টাঃ	২.৫০
(২) হেডম্যান ঐ টাঃ	২.২৫,
(৩) সরকার ঐ টাঃ	১.২৫,
মোট জুমকর ঐ টাঃ	৬.০০,

এই তহসিল সরবরাহের অতিরিক্ত তাদের উপর সামাজিক বিচার ও কিছু প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত আছে। কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, ক্ষেত্র বিশেষে, তাদের দ্বারা ভূমি রাজস্ব আদায় করা হয়েও থাকে এবং তদোতিরিক্ত তারা যৌথভাবে ৫০ একর ভূমি নিষ্কর ভোগ করেন।

মাননীয়া রাণী কালিন্দি অবশ্য জমিদারী কর্তৃত্ব দাবী করেছিলেন এবং তার পূর্ববর্তী রাজা জান বখশ খাঁর সীলমোহরে ও তাদের জমিদার দাবীর উদ্বৃতি আছে, কিন্তু তার পক্ষে স্বীকৃতিমূলক কোন দলিল বা সনদ প্রাপ্তব্য নয়। ১৯০০ খৃঃ সালের রেগুলেশন নং ১ ভূক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৫০ ধারা মতে কোন পাহাড়ী লোকের বন্দোবস্তি ছাড়া গ্রাম ০.৩০ শতক ভূমি দখল ও ব্যবহার মান্য। পার্বত্য শাসন আইন মূলতঃ জুম ও জুমিয়াদের জন্য রচিত শাসন বিধি, যার প্রয়োগকারীদের মধ্যে রাজা এবং হেডম্যানরাও অন্তর্ভুক্ত। উক্ত আইন রাজা ও হেডম্যানদের, জুমকরের উশোলকারী অংশীদার, সরকারী
অংশের সরবরাহকারী এবং ভূমি প্রশাসনেরও ভাগীদার করেছে।

এই আইনগত সুবিধা সুযোগের বলে তাদের মাঝে এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয়েছে যে, এটা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল। এখানে তাদের অধিকার অবাধ। যেহেতু এতদাঞ্চলে তাদের প্রশাসনিক এখতিয়ার মান্য, সংখ্যাগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত এবং এই প্রচলিত আইন একমাত্র তাদেরকেই স্বীকৃতি দেয়, সেহেতু এখানে তাদের অধিকার একচ্ছত্র। এরই চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিদ্রোহে। এই ধারণা ভ্রান্ত হওয়ার পক্ষে প্রকৃত ইতিহাস ও যুক্তির চর্চা হচ্ছে না, যার অভাব জনীত আনুগত্যহীনতা এখন প্রকট।

এতোদিন এটা অনেকের কল্পনাতীত ছিল যে, জুমের উৎস ও প্রাচুর্য্য একদিন ফুরিযে যাবে। স্বাভাবিভাবেই জমির বন্দোবস্তহীন অবাধ ভোগ দখলের সুযোগ চিরদিন অব্যাহত থাকবে না। বহিরাঞ্চল ভাসী ভূমিহীনরা জায়গা জমির অভাবে দুর্গম পাহাড় জংগলে একদিন ভীড় জমাবে। উমেদারদের চাপের মুখে, কিছুই সংরক্ষিত রাখা যাবে না। বিপরীতে অধিকার হারানোর ভয়ে পাহাড়ীরা অস্ত্র হাতে বিদ্রোহ করবে। বাংগালীরা নিজেদের দেশের এই অংশে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। তারা হবে বাংগালীত্বের পরিচয় মুক্ত অউপজাতি। এক কালের বিদেশাগত অবাঙ্গালীরা তাদেরকে নিজ দেশে বহিরাগত আখ্যাযিত করবে। আর এটাই হবে দুর্যোগ পূর্ণ পরিস্থিতি।

১১। রাজা ধরম বকশ খাঁ কালিন্দী বিবি ও অন্যান্য।

রাণী কালিন্দির পিতা গুজাং চাকমা আসলে কুরাকুট্যা গোত্রভুক্ত সাধারণ রক্তজাত চাকমা ছিলেন। রাঙ্গামাটির নিকটকার কাঁটাছড়ি এলাকায় তার বাসস্থান ছিলো। তার মেয়ে সুন্দরী কালা বি, তরুণ চাকমা রাজা ধরম বখশ খাঁকে নিজ রূপে আকৃষ্ট

করেন। ঐ গুজাং চাকমাকে দেওয়ানে উন্নীত করে রাজা তার মেয়ে কালা বিকে কালিন্দি বিবি নাম প্রদানপূর্বক বিবাহ করেন। পরে ঐ একই গোত্রে রাণীর দুই জ্ঞাতি বোন আতক বি ও হারি বিকেও তিনি স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন। তার এই দুই শ্বশুর পক্ষকেও দেওয়ানে উন্নীত করা হয়। রাজা ধরম বখশ খার জীবন ও কার্যকাল রহস্যময়। জানা যায়, তার জন্মকাল ১৮১২ খ্রীঃ সাল। কিংবদন্তি মুলে তিনি আঠারো মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন বলে আঠারো মাস্যা ধরম বখশ খাঁ নামেও খ্যাত। পিতার মৃত্যুকালে তিনি মাতৃগর্ভে থাকায়, পিতৃব্য দুলামিয়া ওরফে ডুলপেটা সর্দারী পদের দাবীদার হোন। কিন্তু সমাজের সমর্থন দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সরকারও ইতস্ততঃ অবস্থায় পতিত হোন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার জন্ম হলে, নবজাত শিশুকে দুলাপক্ষ ছিনতাই পূর্বক মেরে ফেলার জন্য নির্জন বনে নিয়ে যান। এর বিপরীতে প্রতিপক্ষ সংঘবদ্ধ হয়ে শিশুটিকে খুঁজে পান ও উদ্ধার করেন। পরে শিশু হলেও তাকে রাজা ঘোষণা করা হয়। তিনি ১৮৩২ খ্রীঃ সনে মাত্র ২০ বছর বয়সে মারা যান। তখন দ্বিতীয়া বা কনিষ্ঠা স্ত্রী হারিবি মাত্র এক কন্যা সন্তান চিকন বিবি ওরফে মেনকার মা। মনে হয় কিছু অভিজাত চাকমা ধরম বখশ খাঁর সর্দারীর বিরোধী ও তার জন্মগত বিশুদ্ধতার প্রতি সন্দিহান ছিলেন, এবং তাই তাদের দ্বারা তিনি প্রত্যাখ্যাত, আর আঠারো মাস্যা খ্যাত হয়েছিলেন। এ কারণেই হয়তো তিনি অভিজাতদের দ্বারা বর্জিত হয়ে, অন্যতম শক্তিশালী গোত্র কুরাকুট্যাদের সাথে আত্মীয়তায় আবদ্ধ হোন। এ থেকে পরবর্তী রাজ বংশধরেরা সাধারণ কুরাকুট্যা দেওয়ান বংশ সংযোগে উদ্ভুত। মূল চার গোত্র ধুর্য্যা কুর্য্যা ধাবানা ও পীড়া ভাঙ্গাকেই কুলিন রাজবংশ ভাবা হয়ে থাকে। রাজপুত্র ধুর্য্যা তৈনছড়িতে রাজপদ গ্রহণকালে তাড়াহুড়ার ভিতর স্ত্রীর বুকবন্ধনীতে পাগড়ি বাঁধায়, সমাজ কর্তৃক পদচ্যুত হোন। তার বংশধরেরা তাই অবনমিত তালুকদার এবং অপর তিন বংশ দেওয়ান আখ্যায় আখ্যায়িত। পরে আত্মীয়তা ও নজরানার সুত্রে আরো অনেকে তালুকদার ও দেওয়ান পদবি লাভ করেছেন, এবং বৈবাহিক সুত্রে রাজবংশেরও সম্প্রসারণ ঘটেছে।

১২। পার্বত্য উপজাতি সমূহ তিন সর্দার পরিবার ও অন্যান্যদের ব্যাপারে বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় মূল্যায়নঃ

"(১) ১৮৯২ ইং সালের বিধির বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন চীফ এবং অন্যান্যদের ধারা ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮ইং তারিখে প্রদত্ত স্মারক লিপির উপর মন্তব্য। সুত্র ঃ সেলেকশন ফ্রম দি করেসপনডেন্স ওন দি রেভিনিউ এডমিনিসট্রেশন অফ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস।"

"(২) এই স্মারক লিপির উপর এসিসটেন্ট কমিশনার জেএ ব্রাউনের তারিখ বিহীন নোট, ভার প্রাপ্ত কমিশনার মিঃ জিই মেনিষ্টির পত্র নং ১২১ এইচ তাং-৩১ মার্চ ১৮৯৮ইং, যথাঃ-

উদৃতি ১০. এই উপজাতিগুলো সবাই যাযাবর। ভৌগোলিক সীমারেখা উপেক্ষা করে যেখানে সুযোগ পায় সেখানেই জুম চাষ করে থাকে। তারা পরস্পরকে অতিক্রম

করে, পরস্পরের সাথে মিলে মিশে এক বছর পার্বত্য ত্রিপুরায়, অন্য বছর আরাকানে, তৎপরের বছর লুসাই ভূমিতে, আর অন্য বছর চট্টগ্রাম জেলায় জুম চাষ করে। তবে তারা যেখানেই যাক না কেন একজন নির্দিষ্ট চীফের প্রতি অনুগত থাকে। তাদের জুম জমি পরিবর্তনশীল এবং সীমাহীন। এসব লোক ও চীফদের জমির উপর কোন অধিকার থাকে না এটাই তত্ব এবং এই তত্বটা কেবলমাত্র জুমিয়াদের বেলায় সত্য। বস্তুত স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী বোমাং এবং মাং রাজা নেপ্রুসাঁই-এর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে আমি তা প্রমাণ করবো। সরকারের মনোভাব হল, তাঁরা সামাজিক এবং প্রশাসনিক প্রধান হলেও ভূমির উপর এসব চীফদের কোন অধিকার নেই। তাদের আর্থিক অবস্থান হল কেবল একজন সরবরাহকারের। এই সরবরাহকার কথাটা পরবর্তী সব সরকারী আদেশে ব্যবহার করা হয়েছে (যথাঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত নির্বাচিত প্রত্রাবলী ১৩-১৪ নং অনুচ্ছেদ) আমার উপরোক্ত বক্তব্য সরকারের এই ধারণাকেই প্রমাণ করে। চীফদের এই অবস্থান মোগল আমলের জমিদারদের তাত্বিক মর্যাদার সাথে মিলে। এটা সাঁওতাল পরগনার পরগনা প্রধান, কোলহানের এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত খুদার বর্তমান কালের সরবরাহকারদের সমতূল্য। এটাই প্রকৃত ঘটনা যা সব সময় মনে রাখতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চ নীচ কেউই সরকারের অধীন দখলদার প্রজা স্বত্বের উর্ধ্বে কোন উচ্চতর স্বত্ব আইনতঃ এবং ঐতিহাসিকভাবে ভোগ করে না। চিরস্থায়ী মঞ্জুরী হিসাবে প্রদত্ত মাত্র কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্লটের উপর এই স্বত্ব রয়েছে। তবে সেসব সুনির্দিষ্ট প্লট হস্তান্তরের ক্ষমতা ও মালিকদের দেয়া হয়নি।"

"১১। ঐ বিধি গুলোতে যে মডেল যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, তাহল সাঁওতালদের মৌজা গঠন পদ্ধতি। সাঁওতালদের সুসংহত, সঙ্গবদ্ধ এবং অন্যান্য গোত্র ব্যবস্থার চেয়ে শক্তিশালী নজির ভারত আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেনি।

১২। তবে তিনজন চীফের মধ্যে চাকমা রাজাই একমাত্র যিনি একাধারে একটা গোত্রের সদস্য, গোত্র প্রধান এবং একটা গোত্র ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি পার্তব্য ১০৭২৮৬ জন লোকের মধ্যে ৩৫.২৮৮ জন লোক এবং এক তৃতীয়াংশ এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন। আরাকানী মগ মাংরাজা নেপ্রুসাঁই কিংবা বর্মী বংশোদ্ভূত বোমাংদের কেউই কোন গোত্রের সদস্য নন। তাঁরা কোন গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কিংবা কোন গোত্র প্রধানও নন। তাঁরা অসংখ্য অসমজাতি সত্তা এবং পরিবার অধ্যুষিত এলাকার স্থানীয় প্রধান হন। এসব অসম সত্তা জাতিগুলোর প্রধান হল চট্টগ্রামী মুলসান, হিন্দু, আরাকানী ও বর্মী মগ, রিয়াং এবং পার্বত্য ত্রিপুরার টিপরা খুমি, ম্রো পাংখো বনযোগী, টংটঙ্গ্যা এবং লুসাই দেশের বসবাসকারী সাধারণভাবে কুকি নামে পরিচিত বহিরাগত লোক। প্রথমোক্ত চীফকে অতি সাম্প্রতিককালে ব্রিটিশ সরকারই সৃষ্টি করেছেন। এই তিনজন চীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরাই হবে উত্তম নীতি।"

"**১৩। মাং চীফ ঃ** বর্তমানে মাং রাজা নামে পরিচিত নেপ্রুসাঁই একজন আরাকানী

মগ। তাঁর রাজা নামটা করদাতা চাষা প্রজাদের শাসক অর্থবোধক ভারতীয় শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়নি। আমার ধারণা এটা বর্মী ভাষার রোয়াজা বা গ্রাম হেডম্যানের বিকৃত রূপ।"

"তবে আমাকে বলা হয়েছে যে, শব্দটা একেবারে কম সম্মানসূচক অথবা কম শ্রদ্ধাজ্ঞাপক অর্থ বহন করে। ১৮৬০ ইং সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি হওয়ার পর এর উত্তর অংশকে পার্বত্য ত্রিপুরার একটা বিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে পাওয়া যায়। সেখানে কোন প্রধান এবং সাহায্য লওয়ার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। এটা ছিল নাম মাত্র চাকমা শাসিত এলাকা। কিন্তু চাকমা চীফ সেখান থেকে বহু দূরে বাস করাতে তাঁর পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। সবচেয়ে সম্মানিত এবং প্রতিষ্ঠিত বাসিন্দা ছিলেন একজন মগ, যিনি মাংরাজা কেজোসাঁই। পার্শ্ববর্তী সমতল অঞ্চলে তাঁর একটা জমিদারী ছিল এবং তাঁকেই সাহায্য পাওয়ার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে পছন্দ করা হয়। শাসন কাজের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষ তাঁর মর্যাদা এবং ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেন এবং সেই অঞ্চলের একটা ব্যাপক অংশের সরবরাহকার হওয়ার আগ পর্যন্ত তার উপনাম 'রাজা' ব্যবহার করা হয়।"

"তাঁর ছেলের মৃত্যুর পর প্রতিপাল্য আদালতের আওতায় এই সম্পত্তি সরকারের অধীনে আনয়ন এবং একজন দক্ষ বাঙালী অফিসার দ্বারা তা পরিচালনা করায়, চীফের এই পদের মর্যাদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ১৯শে আগস্ট ১৮১৯ ইং সালে লিখিত আমার প্রতিবেদন নং-১১৩৬ এইচটি এর ২ নং অনুচ্ছেদে একাধিক বার এই অফিসারকে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটও বলা হয়েছে এবং তিনি মাং সার্কেলের সত্যিকার অর্থে শাসক হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উত্তর অঞ্চলের সব বাসিন্দাদের উপর কোন অবস্থাতেই পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। আমি আমার প্রতিবেদনের ২নং অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করেছি (১৯শে আগস্ট ১৮৯১ ইং তারিখের পত্র ১১৩৬ এইচ,টি) সে সময় সেখানে ৫০০-এর অধিক চাকমা পরিবার ছিল। উপজাতীয় এবং আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি হেতু উক্ত চাকমা পরিবারগুলোর উপর ম্যানেজারের কর্তৃত্ব ছিল না। এমনকি উচ্চতর মর্যাদাধারী মগদের উপরও তাঁর পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পক্ষান্তরে সাধারণ প্রজাদের একটা বড় অংশ ছিল টিপরা। শেষোক্তদের দু'জন ১৮৮৯-৯০ ইং সালের অভিযানে ভাল অবদান রেখেছেন। সরকার তাঁদেরকে কিছুটা স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে আলোচনা করা হলে তারা 'নারাণ' উপাধি চেয়েছেন। আমি তদন্ত করে জানতে পারি যে শব্দটা ছিল 'নারায়ণ' এবং পার্বত্য টিপরার রাজাই সেই পার্বত্য উপাধি প্রদান করে থাকেন। আমি আরও জানতে পারি যে, এই লোকেরা টিপেরা এবং তারা রাজার কাছেই আনুগত্য প্রকাশ করে থাকেন এবং তাঁরই নজির অনুসরণ করে কঠোর এবং অত্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন। নেপ্রুসাঁই একজন বৌদ্ধ। মগেরা পার্শ্ববর্তী আকিয়াব জেলায় যেরূপ গোত্রবদ্ধ নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামেও তদনুরূপ গোত্রবদ্ধ নয়। রাটী এবং মিথিলা এবং স্মারশত ও কনৌজিয়া এবং অন্যান্য

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যেমন স্থানীয় এবং সামাজিক শ্রেণী রয়েছে, এদের (মগদের) মধ্যেও তেমন সামাজিক এবং স্থানীয় শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। তবে এসব কোন বিভাগ বা শ্রেণী চাকমাদের মত কোন একক প্রধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে না। রিগ্রেসা, পালেইংসা এবং বড় য়া মগেরা সবাই তাদের মধ্যে সামাজিক সমতা দাবী করে। তবে তারা সরকারী পদ এবং সম্পত্তির দ্বারা অর্জিত মর্যাদাকে-এ থেকে আলাদা করে দেখে থাকে। মাং সার্কেলে বিভিন্ন ধর্ম এবং জাতির লোক ও পরিবার রয়েছে। সেগুলোর শেষোক্তগুলোর কোন কোনটা গোত্রের অনুরূপ। তবে এসব গোত্র কিংবা গোষ্ঠী বিশেষের ব্যাপারে সার্কেল চীফের কোন কিছু করণীয় নেই।"

"১৪। বোমাং ঃ আমি যতদূর স্মরণ করতে পারি এবং যা সত্য তা হল বর্তমান বোমাং-এর পিতামহ অথবা প্রপিতামহ যিনি একজন বর্মী হিসাবে এক বিরাট পরিবার এবং অসংখ্য সশস্ত্র লোক নিয়ে আভার রাজার কাছ থেকে পালিয়ে এসে আব্রাহামের মত ভ্রমণ করতে করতে সেই রাজার নাগালের বাইরে সাঙ্গু নদীর তীরে বান্দরবনে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তিনি বর্তমানে একজন অতিবৃদ্ধ লোক। এই শরণার্থীরা পশ্চিমের চট্টগ্রামী মুসলমান এবং পূর্বের বিভিন্ন নামের কুকি এবং লুসাই জাতি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন অসম বন্য জাতিকে পদানত ও তাদের কাছ থেকে কর আদায় করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁদের আগে বসতি স্থাপনকারী আরাকানী মগেরা তাদেরকে স্বদেশীয় লোক এবং চীফ হিসাবে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যদিও মাংরাজা নেপ্রুসাইয়ের পরিবারের তুলনায় বোমাং-এর পরিবারের বৃত্ত অনেক বড় এবং পার্বত্য ত্রিপুরা ঠাকুরগণ ও চাকমা দেওয়ানগণের মত নিজেরাই একটা স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী হিসাবে গড়ে ওঠেছে, তথাপি তিনি পার্বত্য ত্রিপুরা চীফের মত মোটেও একজন গোত্র প্রধান নন। তাঁর প্রজারা বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের সংমিশ্রণ মাত্র। তিনি স্মারকলিপিতে উল্লেখিত কিংবা মিঃ ম্যানিষ্টির কল্পনা প্রসূত গোত্র ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করেন না।"

!১৫। চাকমা ঃ চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের কেন্দ্র স্থলে এবং কর্ণফুলীর অববাহিকায় বাস করে। বাস্তবিত পক্ষে তারা একটা শক্তিশালী এবং একক উপজাতি অথবা গোত্রের নজির। তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত বিবরণ হল, তারা নবাব শায়েস্তা খানের সৈন্য এবং মগ মহিলাদের মিলনেরই ফসল এবং বিগত ২০০ বছর কিংবা এরূপ কাছাকাছি সময়ে তারা গোত্রবদ্ধ হয়েছে। তাই বর্দ্ধমান জেলার ঐতিহাসিক ও জাতিগত দিক সম্পর্কে প্রদত্ত আমার নোটের ১৮থেকে ২৮ পৃষ্ঠার বিবরণ এবং নির্ঘন্ট অনুযায়ী তারা বিহার এবং বেনারস প্রদেশের ভুঁইয়া কিংবা বিহারের বাবনদের অনুরূপ এবং বর্দ্ধমান জেলার 'অগুরীদের' অধিকতর নিকটতর সম্পর্কযুক্ত লোক। তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পূর্ব পুরুষদের বৈশিষ্ট্যগুলোর সংমিশ্রণ ঘটেছে। কারণ তারা একদিকে বৌদ্ধ এবং অর্ধমঙ্গোলীয় ও পর্বতবাসী হিসাবে আমাদের স্থানীয় অফিসারগণ কর্তৃক ব্যবহৃত। তারা চট্টগ্রামী বর্বরশব্দ অর্থে যা বুঝায় তার পরিপূর্ণ নমুনা। অর্থাৎ তারা বিচক্ষণ, অস্থির, কর্মচঞ্চল, মামলাবাজ,

নাছোড়বান্দা, আলস্য স্বীকারে আসক্ত, কর্তৃত্বের বিরোধী এবং কাজ কিংবা শৃঙ্খলা বিমুখ। তারা জন্মগতভাবে বৌদ্ধ। তবে ধরমবক্স খান, জানবক্স খান, রণুখান এবং জামাল খান নাম ও পদবী থেকে বুঝা যায় যে, তাদের চীফেরা প্রথমে তাদের পিতৃকূলের অভিজাত ধর্মের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। তারপর আমাদের শাসনামলে যখন হিন্দুরা চট্টগ্রামে প্রাধান্য বিস্তার করে তখন তারা তাদের চট্টগ্রামী প্রতিবেশী হিন্দু ধর্মের দিকে ঝোঁকে। ক্যাপ্টেন লুইন তাদেরকে অনেকটা হিন্দু হিসাবেই দেখতে পেয়েছেন। (স্টেটিস্টিকেল একাউন্ট-এর পৃষ্ঠ নং-৪৫ দ্রষ্টব্য)।তারা শিব ও কালীর জন্য মন্দির নির্মাণ করে এবং এই সময়েই তাদের জন্য সেই অদ্ভুত কিংবদন্তি তৈরি করা হয়েছিল যে, তারা হল অঙ্গ নামক রাজ্যের রাজধানী (অদ্যাবধি ভাগলপুর শহরের একটা অংশ) চম্পকনগরের ক্ষত্রীয়দের একটা অভিবাসী উপজাতি এবং চাকমা শব্দটা ছিল চম্পানগর এর অনুচ্চারিত রূপ। কিন্তু ১৮৭৩ইং সালে ক্যাপ্টেন লুইন চলে যাওয়ার পর একজন প্রখ্যাত ফুঙ্গী (ধর্মযাজক/ভিক্ষু) মিশনারী হিসাবে বার্মা থেকে আসেন এবং তাদেরকে পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন থেকে তারা তা কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সাথে অনুসরণ করছে। চাকমারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী এবং ক্ষমতাশালী। কারণ তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সব পাহাড়ী উপজাতিগুলোর মধ্যে বেশী বুদ্ধিমান। চাকমা চীফই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ক্ষমতা ও স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন,যা স্যার রিচার্ড টেম্পল জুলাই ১৮৭৬ইং সালে দমিয়ে ছিলেন (পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচিত পত্রাবলীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫ দ্রষ্টব্য) এবং যা স্যার এলসি ইডেন জুলাই ১৮৭৮ইং সালে প্রত্যাহার করেছিলেন (পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত নির্বাচিত পত্রাবলী পৃষ্ঠা নম্বর ৫১ থেকে ৫৪ দ্রষ্টব্য) এবং যা ১৮৯২ইং সালের বিধি দ্বারা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, অর্থাৎ তারা দাবী করেন যে, তাদের চীফ এবং তাঁর দেওয়ান গণের ক্ষমতা ও অধিকার কোন ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁরা তাদের উপজাতীয় লোকদের উপর পুর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন এবং এই উপজাতীয় লোকেরা পার্বত্য ত্রিপুরা কিংবা চট্টগ্রাম জেলা কিংবা ১৮৬৯ইং সালে লর্ড উলিক ব্রাউন যেমন বলেছেন, তেমনি তারা কলকাতায়ও থাক না কেন, তাদের কাছ থেকে মাথা-গুণতি খাজনা আদায় করার অধিকার ও ক্ষমতা আছে বলে দাবী করেন। (পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত নির্বাচিত পত্রাবলীর ১২নং পৃষ্ঠার ২০ নং অনুচ্ছেদ এবং স্যার রিচার্ড টেম্পল এর কার্যবিবরণীর পৃষ্ঠা নং ৫০ অনুচ্ছেদ নং ৫১ দ্রষ্টব্য)।

১৬। পূর্ববর্তী মন্তব্য সমুহের উদ্দেশ্য দ্বিমুখী। একটা হল যে, স্মারক লিপিটা পুরোপুরি চাকমা রাজার দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি করা হয়েছে, কিংবা প্রকৃত পক্ষে তাঁর দু'জন প্রখ্যাত দেওয়ান ত্রিলোচন এবং রাজচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ থেকেই তৈরি হয়েছে। আমি দেখতে পাই যে, নীলচন্দ্রের স্বাক্ষর অন্যান্য স্বাক্ষরের আগে রয়েছে। কিন্তু তিনি বর্তমানে একজন অতি বৃদ্ধ লোক। তিনি ১৮৯১ইং সালের বিতর্ক এবং সম্মেলনে কোন আগ্রহ দেখাননি এবং সেগুলোতে অংশ গ্রহণ করেননি। অন্যান্য স্বাক্ষরগুলো হল নগণ্য।"

অধ্যায় (খ) নৃতত্ত্ব।

রং, গঠন সংস্কৃতি ও চরিত্র গত বৈশিষ্ট্যের গুণে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমূদয় অধিবাসীকে মূল তিনটি সমাজে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ

১। বাঙ্গালী
২। মঙ্গোলীয়
৩। আদিবাসী

যদিও রং ও গঠনের বিচারে ওদের কেউ অবিমিশ্র নয়, তবু তাদের মাঝে কিছু মৌলিক পার্থক্য দৃশ্যমান। সংকর চরিত্রের মাঝেও মূল রং ও গঠনের স্বাতন্ত্র্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়ে আছে। যদ্বারা প্রত্যেকের পৃথক পরিচয় চিহ্নিত হয়।

১। **বাঙ্গালী** ঃ সাধারণত ঃ বাঙ্গালীদের রং মিশ্র হাল্কা। সাদা,কাল, আর হরিতের মাখামাখিতে সে রংটি গঠিত। কড়া রং এর বাঙ্গালী দুস্প্রাপ্য না হলেও তার সে রংটিও শ্যামলিমায় মন্ডিত হয়। তাই সর্বাধিক উজ্জ্বল রং এর বাঙ্গালীকেও এক স্নিগ্ধ অনুজ্জ্বলতা ঢেকে রাখে। কাঠামো গত ভাবে বাঙ্গালীরা মধ্যম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অধিকারী। চেহারার আকৃতিতে সাধারণতঃ লম্বমান তীক্ষ্নতা বিদ্যমান। হালকা রং-এর সাথে, সুষম দেহ সৌষ্ঠব ও স্বল্প তীক্ষ্ন চেহারা, সামঞ্জস্যশীল। এই দেহ সৌষ্ঠবের সাথে, মাঝারী গড়নের, স্বল্প সরু ও আধা খাড়া নাক, নাতিদীর্ঘ ভুরু, ডিম্বাকার চোয়াল, অর্ধটানা চোখ আর আধা পুষ্ঠ ঠোঁটই, বাঙ্গালীর দেহ-সৌন্দর্যের ভিত্তি। পিংগল ও কুকড়া চুল এবং কটাচোখের বাঙ্গালী সংখ্যায় অত্যল্প। তবে ব্যতিক্রমী রং ও গঠনের বাঙ্গালী ও দুস্প্রাপ্য নয়। খাদা বোঁচা ও বেটে নাক, উঁচু চেপ্টা চোয়াল, ঢালু চিবুক, ছোট্ট গোল ও অর্ধ মিলিত চোখ এবং মোটা ঠোঁটের স্বল্প সংখ্যক কালো বা গোরা রং বিশিষ্ট বাঙ্গালী প্রাচীন দ্রাবিড় অনার্য্য আর আদিবাসীদেরই সংকর বংশধর। অতীতে মুসলিম সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনে হাফসীদের স্বল্প উপস্থিতি ছিলো। অধিককালও বাঙ্গালীরা সেই তাদেরই প্রজন্ম গোরা ও বোঁচামুখী বাঙ্গালীরা, মংগোলীয় সমাজ থেকে উদ্ভুত। ধর্মান্তর, দেশান্তর ও আন্তঃ বিবাহজনিত বিবর্তনে, এদের উদ্ভব হয়েছে। বাদ বাকি গোরা রং, তীক্ষ্ন

চেহারা ও মাঝারি অবয়বের বাঙ্গালীরা, ভারতবাসী আর্যদেরই স্থানীয় প্রজন্ম। তাদের রং, গঠন ও দেহ কাঠামোতে সে উত্তরাধিকারই বিদ্যমান। মোট কথা আর্য্য, দ্রাবিড় হাবসী ও মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণই বাঙ্গালী মৌলিকত্বে ভাস্বর।
আগে বড় য়া সমাজকে বাঙ্গালী সমাজ থেকে পৃথক জ্ঞান করা হতো। অধুনা যাবতীয় বাঙ্গালী চরিত্রেই তারা বিভূষিত। প্রাচীন মংগোলীয় ঐতিহ্য তাদের মাঝে প্রায় অবশিষ্ট নেই। এংলো ইন্ডিয়ান বা ফেরেঙ্গীরা আজকাল প্রায় বাঙ্গালীতে পরিণত। এই পর্বতাঞ্চলে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

২। উপজাতি ও আদিবাসী ঃ

বাঙ্গালীদের বিপরীতে নিজেদের উজ্জ্বল রং বোঁচা গঠন ও খাটো সাজ-পোষাকে অনাড়ম্বর ভিন্ন যে সমাজটি পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যাগুরু, তারা মংগোলীয় শ্রেণীভুক্ত লোক। পৃথক শারীরিক বৈশিষ্ট্যই তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়কে প্রতিভাত করে। দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় চিহ্নিত লোকজন দুভাগে বিভক্ত, যথা অবিমিশ্র, আর মিশ্র। মূলতঃ ঐ সব লোকই উপজাতি, যারা বৃহৎ কোন জাতিসত্বা নয়। তারা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু হিসাবে বন ও পাহাড়ে বা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র অভ্যাস আচরণ নিয়ে পৃথক জীবন যাপন করে। ওদের আদিম ও স্থানীয়রাই আদিবাসী।

এতদাঞ্চলের সাওতাল ও অন্যান্য বোছা গঠনের আদি ভারতীয়রা অবাঙ্গালী আদিবাসী। মঙ্গোলীয়রা আমার বিচারে মোট ছয়টি জনসমষ্টিতে বিভক্ত, যাদের মোট সম্প্রদায়গত সংখ্যা বাইশ। এ যাবৎ রোয়াংগ্যা মুসলিমদের মংগোলীয় গণ্য করা হয়নি। রোয়াংগ্যারা বৌদ্ধ, প্রকৃতি পূজারী ও ইসলামের অনুসারী, এই তিন ভাগে বিভক্ত। মূলতঃ সমুদয় উত্তর আরাকানী লোকজনই রোয়াংগ্যা। ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে তথাকার অধিবাসীদের এ নামটি ভৌগোলিক ও সার্বজনীন। মগ ও মারমা নাম, আঞ্চলিকতা ও সম্প্রদায়গত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের রোয়াংগ্যারা ধর্ম ও সামাজিকতার কারণে মুসলমান ও মগ সমাজে বিভক্ত।

মিশ্র মঙ্গোলীয়রা পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যায় অত্যল্প এবং এখনো একক কোন সম্প্রদায়ে পরিণত হতে পারেনি। যদিও তাদের মাঝে আদি রক্তমাংস অবশিষ্ট নেই, তবুও পূর্ব পুরুষদের পরিচয় রক্ষা করে এখনো তাদের কেউ নেপালী, কেউ ভুটানী আর কেউ আসামী ইত্যাদি নামে পরিচিত।

গোরা রং, বেটে আকৃতি, চেপ্টা অবয়ব, খাদা ও বোঁচা নাক, উঁচু চোয়াল, আধা পুরু ঠোঁট, স্বল্প শ্মশ্রু, অর্ধ নিমিলিত ছোট্ট-চোখ, ভূরু খাটো, পায়ের গোছা পুরু, বিরল লোমস দেহ এবং নাসা মুখ চেপ্টা এই হলো স্থানীয় মঙ্গোলীয় দেহ বৈশিষ্ট্য। এই সাধারণ মঙ্গোলীয় দেহ বৈশিষ্ট্য আজকাল আন্তঃসাম্প্রদায়িক মিশ্র প্রজনন ধারায় বিবর্তনমুখী। ফলে অনুজ্জ্বল রং ও গঠন তীক্ষ্ণতা আজকাল মংগোলীয় সমাজে দ্রুত সংক্রমণশীল। বাঙ্গালী আর মঙ্গোলীয়দের নতুন সংকর প্রজন্ম, মিশ্র বা মাঝামাঝি

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হচ্ছে। এরূপ মিশ্র রং ও গঠনের মঙ্গোলীয় সন্তানদের সংখ্যা এখন ভূরি ভুরি।

এতদাঞ্চলে সামান্য কিছু সংখ্যক সাওতাল বসবাস করে। মিশ্র মঙ্গোলীয়দের মত এরাও বহিরাগত। সরকারী সড়কের শ্রমিক হিসাবে বৃটিশ আমলে এদের পূর্ব পুরুষেরা এতদাঞ্চলে আনিত হয়। স্থানীয় নেপালী, ভুটানী ও আসামীদের পূর্ব পুরুষেরা প্রায়ই সিপাহী, দারোয়ান, পিওন, খালাসী ইত্যাদি চাকুরীতে নিযুক্ত হয়ে এতদাঞ্চলে আসে। অবসর গ্রহণের পর তারা আর স্বদেশে ফেরত যায়নি।

সংখ্যা স্বল্পতার কারণে, এই বহিরাগতরা, অপেক্ষাকৃত উদার মগ ও অন্যান্য সমাজের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই ধারায় তাদের বংশান্তর, ধর্মান্তর ও বিবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকাল তাদের নতুন প্রজন্ম মিশ্র ভাষায় কথা বলে। সাওতাল, নেপালী, ভুটানী ও আসামী ভাষা এখন আর তাদের মুখে শ্রুত হয় না। এখন অভিনব এক মিশ্র বাংলা ভাষায় তারা অভ্যস্ত, যা হয়তো ভবিষ্যতে কোন এক স্বতন্ত্র রূপ নিতে পারে, যথা ঃ

ক) আমি গেছি (বাংলা)

খ) মুই যেইয়ং (চাকমা)

গ) আমি যাইছি (অভিনব মিশ্র বাংলা)

রং আর গঠন বৈশিষ্ট্যে সাওতালরা কড়া কাল ও ঋজু। চেহারা আধা বুচা ও আধা তীক্ষ্ণ। এটা তাদের আদিবাসী দ্রাবিড়ীয় বৈশিষ্ট্য। এই রং ও গঠনের গুণে বাঙ্গালী ও মঙ্গোলীয়দের বিপরীতে, তারা তৃতীয় ধারার পরিচিতিতে ভাস্বর।

সমুদয় স্থানীয় সমাজকে আমি রং গঠন ভাষা আর ঐতিহ্যের বিচারে নয়টি সমষ্টিতে বিভক্ত করেছি।

মূল কুলিন চার গোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত চাকমারা অনোক্যা তঞ্চঙ্গ্যা চাক ও দৈংনাকদের নিজেদের সমাজভুক্ত জ্ঞান করতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু ভাষা আচার-আচরণ আর ইতিহাসের উত্তরাধিকার সুত্রে এদের সবাই অভিন্ন। চাক ও দৈংনাকেরা অবস্থান গত নৈকট্যের কারণে, আরাকানী মিশ্র ভাষী ও এবং তঞ্চঙ্গ্যা ভিন্ন চাকমা উচ্চারণে অভ্যস্ত। এতদসত্বেও চাকমাদের আরাকান বাসের ইতিহাসে ওদের ভূমিকা স্বীকৃত। আলোচ্য আনোক্যা খ্যাতরা ত্রিপুরা ও দক্ষিণী বংশোদ্ভুত, যে নামে ত্রিপুরাদের একটি শাখাও আছে। কুকি লোকজন, ভাষা আর ঐতিহ্যের সুত্রে লুসাই, পাংখু ও বনযোগীদের একই সমাজভুক্ত। ভাষা ও সাজপোষাকে তাদের পরস্পরের মাঝে ক্ষীণ পার্থক্য লক্ষ্যনীয়, যা অবস্থানগত ভিন্নতা ও বিজাতীয় পরিবেশ থেকে উদ্ভুত জ্ঞান করা যেতে পারে। ত্রিপুরা সমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত রিয়াং ও উসুই সম্প্রদায়, পরস্পর থেকে দূরে বিছিন্ন অঞ্চলে বাস করে। তাদের মাঝে ভাষা ও আচরণগত খানেক ভিন্নতা আছে। তবে মৌলিক মিলই বেশী। ম্রো ও মুরুংদের অভিন্নতা, তাদের অভিন্ন ধর্মাচার ও ভাষানুকরণের কারণে প্রমাণিত হয়। তাদের ত্রিপুরাভুক্ত হওয়া

সন্দেহজনক।

মূলতঃ মারমারা বর্মী আর মগেরা আরাকানী হলেও এখন অভিন্ন দেশবাসী হওয়ায় তাদের সবাই বর্মী জনগোষ্ঠী। ওদের অন্য সহযোগী লোক হলো রাখাইন, রোয়াংগ্যা, খুমি, খিয়াং, দৈংনাক ও সেন্দু সম্প্রদায়। তাদের সবাই মূলতঃ বার্মা থেকে আগত লোক। তবে নৃতত্ত্বের বিচারে ভিন্ন সমষ্টিতে বিভক্ত।

৩। চাকমা ঃ খাদা, বোঁচা, খর্বাকৃতি ও গোরা রং এর বৈশিষ্ট্যের গুণে চাকমারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর ভূক্ত লোক। ভাষার বিচারে তারা আঞ্চলিক বাংলাভাষী। তবে স্বতন্ত্র সংস্কার, সংস্কৃতি রং ও গঠনের পার্থক্য গুণে অবাংগালী হওয়ার দাবীদার। বাংলাভাষী অথচ অবাংগালী, এই দ্বৈত গুণের সংমিশ্রণে তারা কার্যতঃ একটি সংকর সম্প্রদায়। তাদের ভাষা, আচার-আচরণ, পরিধান আসবাবপত্র ও আয়োজনের অধিকাংশই, বাঙ্গালী লোকজ বৈশিষ্ট্যে পুষ্ট। নাম ও খেতাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনুকরণই বিদ্যমান। বাহ্যতঃ চাকমা ভাষাকে চাটগেঁয়ে বাংলার যমজ বলা যায়, যাতে প্রচুর আরবী, ফার্সি, হিন্দী আসামী আর ভওয়াইয়া শব্দাবলী মিশ্রিত। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো ঃ প্রাচীন চাকমা রাজাদের ব্যবহৃত সীলমোহর গুলোতে, খেমার ধর্মী নিজস্ব বর্ণ, বা বাংলা ব্যবহৃত হয়নি। একটি বাদে সব কটি সীলমোহরেই আরবী বর্ণ ও ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ রাজাদের অধিকাংশ মুসলিম নামও খেতাবে ভূষিত। আরাকানী রাজাদের মত তারা বিকল্প অমুসলিম নাম ও খেতাবের ব্যবহার করেননি। এই সম্প্রদায়টি অতি মাত্রায় রাজনীতি সচেতন সাতন্ত্রবাদী ও আত্মম্ভরী।

৪। চাকমা নামকরণ ও গোত্র গোষ্ঠী।

চাকমা নামে চিহ্নিত বিশেষ সম্প্রদায়টির পরিচয় সুত্রে চাকমা নাম শব্দটির ব্যবহারের কাল ও তার মূলসূত্র এখনো নিশ্চিত নয়। তাদের দেশান্তর, যুদ্ধাভিযান, রাজ্য, রাজত্ব, বিজয়, পরাজয়, প্রেম, বিরহ, আর সমাজ চিত্রের লোককাহিনী ও গীতিকা ভিত্তিক বিবরণের কোথাও ব্যক্তি নামের সাথে এই পদবীটি ব্যবহারে আসেনি। বৃটিশ আমল থেকে সরকারি বিবরণে ও প্রতিবেশী বাঙ্গালী অবাঙ্গালী লোকজনের পরিচয় সুত্রেই তারা চাকমা সম্বোধিত। জনপ্রিয় বিভিন্ন লোকগীতি, কথাকাহিনী ও জনশ্রুতিতে ব্যক্ত বহু নায়ক নায়িকা ও চরিত্রের পরিচয়ে নামের উল্লেখ থাকলেও, সম্প্রদায়গত চাকমা পদবীটি কোথাও কোন নামের সাথে যুক্ত পাওয়া যায় না। তাতে বুঝা যায়, তাদের নামের সাথে চাকমা পদবীটির ব্যবহার প্রাচীন বা স্বআরোপিত নয়। প্রতিবেশী ও সরকারী সম্বোধনের মাধ্যমেই তারা চাকমা পরিচিত।

কিছুই কার্যকরণ বহির্ভুত ও মূলহীন না হওয়ার সুত্রে চাকমা নামটি অবশ্যই কোন

মূলের সাথে সম্পর্কিত হবে। এটা নিশ্চয়ই শূণ্য সম্বন্ধযুক্ত কোন শব্দ নয়। দীর্ঘকালের সাধারণ প্রতিবেশী চট্টগ্রামী বাঙ্গালীরা তাদের চাম্মুয়া বলে। নিজেদের সম্বোধনেও তারা চাঙমা অভিহিত হয়। আরাকানেও নাকি স্থানীয় মগ ও অন্যান্যরা সে দেশবাসী চাকমাদের থেক, সেক ও দৈংনাক নামে ডাকে। অধুনা ভারতের লুসাই, অরুনা চল ও ত্রিপুরায় হুবহু এই নামের স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিবরণ পাওয়া যায়। বান্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দা চাকদের কেউ কেউ নিজেদের নামের সাথে 'সাঙমা' পদবি ব্যবহার করে থাকেন। গারোদের ও একটি শাখা এই 'সাঙমা' নামে পরিচিত। নিকট সাদৃশ্য যুক্ত এ 'চাঙমা' ও 'সাঙমা' পদবীদ্বয় চাকমা নামের মূল হতে পারে। চাকমাকে কেউ কেউ চাকের অপভ্রংশ এবং অনেকে থেক শব্দকে আরবী শেখের আরাকানী বিকৃতি জ্ঞান করে থাকেন। তবে চাঙমা ও সাঙমা শব্দদ্বয় উচ্চারণে প্রায় সামঞ্জস্যপুর্ণ।

অতীতে বর্তমান থাইল্যান্ড শ্যাম নামেই অভিহিত হতো। তখন চট্টগ্রামবাসী অনেকের বার্মা মালয় ও শ্যামদেশের সাথে যোগাযোগ ছিল। চাকমারা একদা দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত পথে চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ও আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা আরাকানী ও মালয়ী সম্প্রদায় থেকে ভাষায় ভিন্ন, তাই সম্ভবতঃ আরো দূরের শ্যাম দেশীয় জ্ঞান করে প্রতিবেশী চট্টগ্রামী লোকেরা তাদেরকে শ্যাম্যুয়া অভিহিত করে থাকবে। পরে হয়তো তাই চট্টগ্রামী কথন রীতিতে সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়ে চাম্যুয়া এবং অবশেষে লিখিত রূপ চাকমায় পরিণত হয়েছে। তবে আমার অনুসন্ধান ও গবেষণায় চাকমা শব্দের মূল সাঙমাই নির্ধারিত হয়।

প্রাসঙ্গিকভাবে সর্বাধিক ষোড়শ শতাব্দী থেকেই চাকমা পদবিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐ পদবিটি নামের সাথে যুক্ত করে ব্যবহারের সম্ভাব্য কাল হিসাবে, সর্বাধিক বৃটিশ আমলকেই চিহ্নিত করা যায়। স্বার্থের প্রয়োজনে তখন থেকেই চাকমারা নামের সাথে এই সম্প্রদায় জ্ঞাপক শব্দটির ব্যবহার শুরু করে। এখন ভাবা দরকার, চাকমারা যে নিজেদের চাঙমা নামে পরিচয় জ্ঞাপন করে, তার আদি সুত্র সম্বন্ধ কী। ভাবা যায় মূল চাকমা শব্দটি শাক্য, শ্যাম, চাম্পা, চম্পক, শেখ, থেক, চাক, সাক, সাঙমা, চাঙমা, বা চাম্যুয়া শব্দের যে কোন একটির অপভ্রংশ।

কোন কোন গবেষক মনে করেন ঃ মঘী চাঙ+মাঙ থেকে অপভ্রংশে চাকমা নামের উৎপত্তি হয়েছে। 'চাঙ' মানে হাতি 'মাঙ' মানে অধিপতি বা মালিক অর্থাৎ হাতিওলা সম্প্রদায়। মগ প্রতিবেশী কর্তৃক প্রথমে তারা 'চাঙমাঙ' নামে আখ্যায়িত হয়েছে, তারই অপভ্রংশ চাঙমা, যা চাকমাদের নিজেদের উচ্চারিত নাম। চট্টগ্রামী বাঙালীদের দ্বারা তা খানেক পরিবর্তিত হয়ে চাম্যুয়া উচ্চারিত হয়।এটা চট্টগ্রামী কথ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য যে, নাম ও বিশেষণগুলো সংক্ষিপ্ত হয়ে ইয়া উয়া প্রত্যয় যোগান্তে উচ্চারিত হয়। যথা বুড়া/বুঝ্যা, রহিম/রম্যুয়া, এজহার/এজায্যা ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে চাকমাদের স্বউচ্চারিত চাঙমা নাম, চাটগেঁয়ে ভাষায় চাম্যুয়া। এ

ব্যাপারে আরেক অভিমত হলোঃ এটা সেক মঙ নামের অপভ্রংশ। আরাকানে সেক সম্প্রদায় অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতঃ সেক ও চাকমারা আদতে অভিন্ন। মূল সেক নামের বৃৎপত্তিগত ইতিহাস ও এর সাথে জড়িত। মনে করা হয়, এটি আরবী শেখ উপাধির আরাকানী বিকৃতি।

আগে মনে করা হতো, চাকমা সমষ্টি মোট তিন শাখায় বিভক্ত যথা ঃ মূল চাকমা, দৈংনাক ও টুংটুঙ্গ্যা তঞ্চঙ্গ্যা। কিন্তু আজকাল থেক বা সেক এবং মতান্তরে চাক, তাতে যুক্ত হয়েছে। মূল শাখা-প্রশাখাভুক্ত গোত্র গোষ্ঠীগুলোকে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ধারায় বিচার করা হলে, তাতে বহু ক্ষুদ্র জাতি ও উপজাতিকে অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায়। আজকাল অনোক্যা চাকমাদের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি নেই। সম্ভবতঃ ওরা অন্যান্যদের মাঝে মিশে গেছে।

চাকমারা ব্যক্তিগত গোত্রীয় ও স্থান সংক্রান্ত নাম ও উপাধি নির্বাচনে রং, রূপ, গুণ, চরিত্র ও পরিবেশ ইত্যাদিকে ব্যবহার করে থাকে। যথা ঃ
ক) রং বাচক নাম ঃ ১। রাঙ্গা-চুলা ২। আগুন পুনা ৩। কালা, ৪। রাঙ্গামাটি, ৫। রাঙ্গাপানি ইত্যাদি।
খ) রূপ বাচক নাম ঃ ১। বোদা চোখী ২। সোনামুখী ৩। চান্দ বি ৪। গোলাপী ৫। আঁধার মানিক ইত্যাদি।
গ) গুণ বাচক নাম ঃ ১। পন্ডিত ২। মৈসাং ৩। সাধু ৪। জিরানী খলা ৫। ঠাকুয্যা ইত্যাদি।
ঘ) চরিত্র বাচক নাম ঃ ১। কান্দ্রা ২। আঘারা ৩। ভাতদ্যা ৪। কপাল্যা ৫। ইন্দুজ্যা ইত্যাদি।
ঙ) পরিবেশ বাচক নাম ঃ ১। ধূল্যাছড়ি ২। শীলছড়ি ৩। কলাবন্যা ৪। গোরস্তান ৫। কাউখালি ইত্যাদি।
চ) ঘটনাত্মক নাম ঃ ১। বাঙ্গালকাটি ২। কুকিমারা ৩। ঝগড়াবিল ৪। দেবতা ছড়া ৫। ছারবুয়াতলী ইত্যাদি।

চাকমা পরিচিতির বুৎপত্তি নিয়ে বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান স্বীয় পুস্তকঃ চাকমা জাতির ইতিবৃত্তে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তার আলোচনাটি অসমাপ্ত আছে। এই আলোচনায় সাঙমা নামটিও যুক্ত হওয়ার যোগ্য। সাঙমা আর চাঙমাতে ব্যবহৃত প্রথম অক্ষর স আর চ উচ্চারণে সামঞ্জস্যশীল। এলাকা গত পার্থক্যের কারণে এরূপ ভিন্ন উচ্চারণ অন্যান্য অনেক শব্দেও প্রচলিত। রংপুরের লোকেরা র বর্ণকে অ বলে উচ্চারণ করেন। এমনি শ কে হ উচ্চারণ করা পুর্বাঞ্চলীয় রীতি, যথা, শোয়াকে হোয়া ও শোনাকে হোনা বলা। রাজশাহীবাসীরা স-কে হাল্কা ভাবে উচ্চারণ করে থাকেন। কিন্তু অন্যত্র তা শ এর কাছাকাছি ভারি আওয়াজে উচ্চারিত হয়। সুতরাং চাঙমা ও সাঙমা শব্দদ্বয় ভিন্ন পরিবেশের সামান্য উচ্চারণ পার্থক্যে মন্ডিত, যা আসলে অভিন্নই হবে। এই অনুমান থেকে বলা যায়, গারোদের

সাঙমা অভিহিত লোকেরা এবং চাকদের সাঙমা পরিচিতরা চামকাদেরই প্রাচীন বিচ্ছিন্ন শাখা হতে পারে। এই সামঞ্জস্যশীল নামটি তাদের মূলতঃ এক ও অভিন্ন হওয়ার লক্ষণ। এই সম্ভাবনার আলোকে বলা যায়, সাঙমা বা চাঙমা আদতে মৌলিক নাম। তিন দলের দুই দল, যোগাযোগহীনভাবে সাঙমা অভিহিত হওয়ায়, সাঙমাই আসল নাম বলে মনে হয়। চাঙমা নাম ভিন্ন উচ্চারণের ফল। তা থেকে চাকমায় উত্তরণ, ব্যবহারিক বিকৃতি। চাম্পা, চম্পা, শ্যাম, চাক, সেক, থেক ইত্যাদির কোন একটিও তার উৎসমূল নয়, কল্পনাপ্রসূত। আমার বিচারে মূল শব্দ হিসাবে সাঙমা পদবীটি সর্বাধিক গ্রহণীয়। এটা বিকৃতি ছাড়াই, মৌলিক। কথিত তিন দলের ভিতর চাকমারা সংখ্যায় ভারি তাই চাঙমাই আসল পদবি, এ দাবী করা যায়, তবে তা শক্তিশালী নয়। বলা যেতে পারে চাকমা চাক ও গারো এই তিন দলের মাঝে মৌলিক যোগসুত্র থাকার ধারণা কল্পনাপ্রসূত। বাস্তবে তারা তিন ভিন্ন সম্প্রদায়। বাসস্থান, আচার আচরণ ভাষা ও সংস্কৃতিতে সবাই স্বতন্ত্র। এমতাবস্থায় মৌলিক অভিন্নতার ধারণা পোষণ যুক্তি সঙ্গত নয়। নাম শব্দের সামঞ্জস্যের ব্যাপারটি এবং তাদের সবার নাম ও পরিচয়ের একমূল হওয়া আকস্মিক। সুতরাং তাদের সবার নামেও পরিচয়ে একমূল হওয়া সন্দেহজনক। এর উত্তর হলোঃ মূলতঃ সব মঙ্গোলীয়দের আদি পিতৃভূমি মঙ্গোলিয়া। একক শ্রেণীভুক্ত হলেও, তারা এখন মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান জনগোষ্ঠী। পূর্ব গোলার্ধের সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সংস্কার সংস্কৃতি ও পরিচিতি নিয়ে তারা বিদ্যমান। সময় ও পরিবেশের বিশাল পার্থক্য আর সংখ্যাগত প্রাচুর্যের গুণে স্থানান্তর ও অভিবাসনের দ্বারা, তারা এখন বিভিন্ন দেশ ও জাতিতে বিভক্ত। মূল মঙ্গোলীয় ভাষা সংস্কৃতি এখন তাদের কাছে বিস্মৃত। একক সমাজ সম্প্রদায় জাতি ও দেশবাসী হয়ে, মূল মঙ্গোলীয়ায় সীমাবদ্ধ থাকা, তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংখ্যাধিক্য ও প্রযোজনের ভিন্নতার চাপে তাদেরকে দেশান্তরী হতে হয়েছে। তাই প্রয়োজনেও ভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে, পরিবর্তন ও ভিন্নতা সুচিত হয়েছে। সবাই হয়ে পড়েছে ভিন্ন পরিবেশের ভিন্ন মানুষ। ভাষা, আচার-আচরণ, সংস্কার সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। চেহারা রং ও গঠনে মৌলিকত্ব রক্ষিত হলেও, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের মানবিক চরিত্র আর অভ্যাস বদলে দিয়েছে। এখন তারা কেবল মৌলিক দেহ বৈশিষ্ট্যের গুণেই মঙ্গোলীয়। এর বাহিরে তাদের একতা নেই। এখন মঙ্গোলীয় মানে চেপ্টা বোঁচা গোরা বা পীত বর্ণের লোক। তাতে বহু দেশ, জাতি, ভাষা, সংস্কার ও সংস্কৃতির সংযোগ ঘটেছে। এখন তারা এক দেশ-জাতি-ভাষা ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ নেই। এতদসত্বেও মানব শ্রেণীগত বিচারে তারা এক ও অভিন্ন মঙ্গোলীয়। সুতরাং সাঙমা ও চাঙমাদের একতাও তদ্রুপ হওয়া সম্ভব।

সাঙমা পরিচিত গারোরা মধুপুর থেকে, গারো পাহাড় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। চাকরা অল্প সংখ্যায় বান্দরবনের নাক্ষৎংছড়ি অঞ্চলে বসবাস করে। সম্ভবতঃ তারা আরাকানী সেকদের দলভুক্ত লোক। চাক নামে তাদের আরাকানে থাকার কথা,

কোন বিবরণেই আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। দাবী করা হয়ে থাকে যে, তারা চাকমা সমষ্টিভুক্ত অন্যতম সম্প্রদায়। এই নৃতাত্ত্বিক তথ্যকে কেউ কেই সন্দেহ করেন। বিষয়টি অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে সাঙমা পদবি শব্দের দ্বারা আমি নিঃসন্দেহ যে, তারা আসলে অভিন্ন। সাঙমা পদবি তাদের ব্যবহারে না থাকলে আমার পক্ষে এ দাবী করা সম্ভব হতো না। খোদ গারোরাও চাকমাভুক্ত লোক এ দাবী কোনদিন করেনি, এই বিচারে আমার দাবীটি অভিনব। তবে অভিনব হলেও আমার এ ধারণাকে আজগুবী বলার অবকাশ নেই। যুক্তির ভিত্তিতে বিষয়টির মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। ১৭৮৭ সালে আরাকানের রাজা কর্তৃক লিখিত চিঠিতে ডুমকান, চাকমা, কায়কোপা, লাই, মেরিং ও মগ নামীয় সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন আরো সম্প্রদায়ের সে দেশে থাকা, তদ্বারা অস্বীকৃত হয় না। মিঃ ফেইর সহ নৃতাত্ত্বিক পন্ডিতদের বিবরণে সে দেশে চাক নামীয় কোন সম্প্রদায়ের উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিলো না, তাই তারা অতীত বিবরণে স্বতন্ত্র পরিচয়ে উল্লেখিত হয়নি। থেক, সেক বা শেখ বংশীয় মুসলিম আরাকানী ও বর্মীরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে রোয়াঙ্গ্যা ও জেরবাদী নামে পরিচিত।

চাকমাদের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি বহু ভাষী নাম ও উপাধি বৈচিত্র্য, এই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দেয় যে, প্রতিবেশী অনেক সম্প্রদায় ও বর্ণের সাথে তাদের সামাজিক সংযোগ ও সংমিশ্রণ ঘটেছে। পাশাপাশি বসবাসকারী অনেক স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র উপজাতি বাস্তুত্যাগ না করা সত্বেও, সংখ্যাগতভাবে বর্ধিত হচ্ছেনা, বা হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে এবং নিজস্ব নামে তারা চাকমা সমাজে গোজা বা গোত্রের আকারে সংযুক্ত হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, ঐ নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা চাকমাতে আত্মিকৃত হয়ে গেছে।

অতীত কাহিনী থেকে জানা যায়, এতদাঞ্চলে মগ, ত্রিপুরা ও কুকিদের প্রাধান্য ছিলো। শতাব্দীকাল অধিক আগে লুসাই অভিযান কালেও চাকমারা ছিলো সংখ্যায় নগণ্য। ১৭৭৬-৮৬ সালে অনুষ্ঠিত চাকমা বিদ্রোহে কুকি ও বাঙ্গালী জনবলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিদ্রোহটি চাকমা জন বলে নয়, নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিলো বলে অভিযান সুত্রের বিবরণ থেকে অবহিত হওয়া যায়। কুকি বাহিনী ও মুনগাজী পরিচালিত বাঙ্গালী বাহিনী তার সহযোগী ছিলো। লুসাই বা কুকি নৃশংসতা দমিত হওয়ার পর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চাকমারা সম্ভবতঃ ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ও আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে ছুটে আসে। দক্ষিণাঞ্চল মগ অধ্যুষিত, আর উত্তরাঞ্চল ত্রিপুরা প্রভাবিত হওয়ায় সম্ভবতঃ কুকি পরিত্যক্ত উত্তর পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলেই তারা ভীড় জমায়। এ সময় নিজেদের প্রাধান্য গুণে সম্ভবতঃ উত্তর-পূর্ব মধ্যাঞ্চলবাসী অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোকদের তারা জিম্মিতে পরিণত করে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ঐ জিম্মি লোকেরা নিজেদের স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পরিচয় ত্যাগ করে, চাকমায় পরিণত হয়, অথবা পরাজয়ের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি মেনে নেয়। প্রশাসনিক আনুকূল্য আর আইন বলে গঠিত সার্কেল ও মৌজা শাসন ক্ষমতা চাকমাদের হস্তগত হওয়াতেও চাকমা আধিপত্য জোরদার হয়। চাকমাদের

এই গ্রাসকরণ নীতিরই ফল তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি। সম্ভবতঃ এ গ্রাসকরণ প্রক্রিয়ারই স্মারক হয়ে আছে ভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিচয় বিশিষ্ট প্রচুর চাকমা গোত্র গোষ্ঠীর নাম, যা তাদের কৌলিন্যের অংশ, যথা ঃ

ক) মগ সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ঃ ১। আঙ্গুগোত্রভুক্ত মগগোষ্ঠী ও তার শাখা-প্রশাখা, ২। ধামাই গোত্রভুক্ত মগ গোষ্ঠী ও তার শাখা-প্রশাখা, ৩। বড় য়া গোত্রভুক্ত মগদের শাখা-প্রশাখা, ৪। বুঙ্গো গোত্রের নেনাঙ্গ্যা গোষ্ঠী ৫। মুলিমা গোত্রভুক্ত মগ গোষ্ঠী ৬। চেগে গোত্র ৭। ওয়াংঝা গোত্র।

খ) ত্রিপুরা সমাজভুক্ত লোক ঃ ১। উরসুরী গোত্রভুক্ত তিবিরা গোষ্ঠী, ২। খিয়াংজয় গোত্রভুক্ত তিবিয়া গোষ্ঠী ৩। কুরাকুট্যা গোত্র।

(গ) বাঙ্গালী ও অন্যান্য ১। খিয়াংজয় গোত্রভুক্ত নাপিতা ও বাঙ্গালী গোষ্ঠী ২। চাদাঙ্গে গোত্রভুক্ত সর্দাজ্যা ও গুরা সর্দাজ্যা গোষ্ঠী, ৩। চেককাবা গোত্রভুক্ত সমুদয় গোষ্ঠী। ৪। দাজ্যা গোত্রভুক্ত সমুদয় গোষ্ঠী, ৫। বগা গোত্রভুক্ত নেই নাঙ্গ্যা গোষ্ঠী, ৬। বরবুয়া গোত্রভুক্ত সমুদয় গোষ্ঠী, ৭। বাবুরা গোত্রভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী, ৮। লস্কর, গোত্রভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী, ৯। অধুনা সংগঠিত সাপ্যা গোষ্ঠী।

এসব লোকের অচাকমা হওয়ার প্রমাণ তাদের বিজাতীয় নাম পরিচয ভাষা ও চরিত্রে নিহিত।

এখন ভারত ও বাংলাদেশে যেসব চাকমা বসবাস করছে তাদের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। চাকমা রূপ কথা বলে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে আরাকান থেকে পার্বত্য চট্রগ্রামে চাকমারা আগমন করে। তখনকার সময় চাকমা জনসংখ্যা কম ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের দলপতির অধিনায়কত্বেই সদলবলে বসবাস করতো। অবশ্য প্রতিটি শাখা দলেও এক একজন দলপতি থাকতেন। এইভাবে তাদের পরিচিতি পেতো কে কোন দলের বা কার গোত্রের লোক। তখন বড় দলের লোকজন তাদের দলপতির নামে গোছা ও উপদলের লোকজন গোষ্ঠী বলে পরিচিত হতো। কোন বিশিষ্ট লোকের নামানুসারে গোষ্ঠী বা গোছা নির্ণীত হতো। কাম্বে নামক একজন লোকের নামানুসারে কাম্ভে গোছা এবং তার চার পুত্রের নামে চারটি গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছিল। এভাবে বিভিন্ন গোছাও গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে। আপাততঃ বহু চেষ্টায় ৩৪টি গোছার সন্ধান পাওয়া গেছে। নিম্নে সেসবের বিবরণ দেয়া গেলঃ

গোছা (গোত্র)	গোষ্ঠী
১। আঙু	১। মগ, ইহ্লিয়া
২। উস্‌সুরী	২। তিবিরিয়া (তিবিরা)
৩। ওয়াংঝা	৩। কালাকাঙারা, রাঙাকাঙারা
৪। কাম্ভে (বড়)	৪। দ্যায়া, অংগ্য, হ্মাধিএ্রা
৫। কাম্ভে (গুরা)	৫ ।মেন্দর, মানেয়া, গজাল্যা।

৬। কুদুগ	৬। সর্দার।
৭। কুরকুট্যা/কুরকুজ্যা	৭। নেন্দার, অঙরে, নন্দদেব, পীড়াভাঙ্গা, ফিরিয়াংজা,
	ভবা, নারান, লরকস্যা, সাঙজআনা, তাদেগা,
সুরসুরি,	সাউদা, পচা আগুনপুন, পেজার,সর্দার ডঙ্যা,
হ্যাধিএ্রা,	রাজাকাবা, উগুরেং।
৮। খ্যাংজয়/খ্যাংজে	৮। চৈয়দনী, দোয়াজা, নাপিতা, সেহ্ম চকই, বাঙালী, কবলা, তিবিরিয়া।
৯। চাদঙঅ	৯। সর্দায্যা বা কুরপাগালা।
১০। চেক্-কাব্য	১০। ধুর্যা, মেন্দর, চায্যা, বগা, বোয়া, খেহ্লঅ (খল্যুয়া)।
১১। চেগে (দুখ্যা	১১। কাঙারা, বগিলা, ভুলং, ভুরুঙ্যা মিন্যাঙ্যা, ধামালা, পীড়াভাঙা, আহ্গারা।
১২। তেইয়া	১২। পুইজগা, ফাদেঙা।
১৩। তৈন্যা	১৩। কুজ্যা, উর্যা, ধাম্মুয়া, মলিয়া, মেন্দর।
১৪। দার্য্যা	১৪। নাদুকতুয়া, কঙরে, কলা।
১৫। ধাবেঙ্যা	১৫। পীড়াভাঙা।
১৬। ধামেই/ধামাই	১৬। তদেগা, সুরসুরি, ঘরকাবা, (মগ), বোয়ের-কাবা, রাগকাবা, রাজ্জোকাবা, চার্য্যা, (মাঝ্যাং), কাংকঙ্যা, মাহগারা, মত্য, চাদঙ্যা, লোহ-পাটটুয়া।
১৭। পুয়া	১৭। কজরা, ফাতুয়া, লাংদা কককেংঙা
১৮। পুঙ্য	১৮। ঝান্দা
১৯। পেদাংছড়ি তৈন্যা	১৯। বামন্য (বাঙোন্যা)
২০। পেমা/ফেমা	২০। তিবিরা।
২১। ফাকসা (বড়) ফাকসা (গুরা) কবালা, লুকেয়া।	
	২১। দুয্যা
২২। বগা	২২। ধুর্য্যা, কাহ্তুয়া, রেগুাল, নেই-নাঙ্যা।
২৩। বংসা	২৩। চগদা, মোকচড়া, চেহ্ত্যা।
২৪। বর্চেগে	২৪। উন্দুরতালা, আসাচুল্যা, কুমুজ, হাইত্যাল, গজাল।
২৫। বর্বুয়া	২৫। ফেজেরা, পাগালা, তবা, ফরা, রণপাগালা,
ভেদুলী,	নাদুকতুক্, কাংসুরী, বাদালী, দজা, কবা, ভুদ, বিলেইগু, ভহ্দ, কার্বুয়া, পুওয়া-নামজা, মগ, বেঙ্য, সেহ্ম, আগুনিপুন, কাঙারা, (কুমুজ্য)।
২৬। বাবুরো	২৬। বাউরা, গজাল্যা, মানেয়া লৌহপাটটুয়া।
২৭। বুঙ্য	২৭। রুমসা, বাউজ রুস্তজ, লেনাংঙা।
২৮। মুহ্লিমা	২৮। ধাবানা, ছোল্যা, বাদালী, কলা, সিংহ পচা, কার্বুয়া, শেরপার্য্যা, রাঙাসিলুম্যা, মিধা,

	মানেয়া, অনিন্দ্যা, মগ।
২৯। মুহলিমাচেগে	২৯। সুখরা।
৩০। রাঙী/রাঙে	৩০। মেন্দর, চেগ, ভোঙেয়া, কাহ্ল্যা, ভারাল্যা, রেঙাল।
৩১। লকসর	৩১। গজাল, বংজা, ভেদুলী।
৩২। লাম্‌মা/লার্মা	৩২। পীড়াভাঙা, চড়চায্যা, মাঝ্যাং, চায্যা, চিকন, চায্যা, সাত-ভেইয়া, তদেগা, রাজাকাবা, আগুনপুন, বগা।
৩৩। লেবা	৩৩। লৌহপাটুটুয়া, সুকক/সককু, উদচেহ্দ/ উবুদচেহদ।
৩৪। হিয়া/হেয়	৩৪। জানা নেই।

সূত্র ঃ চাকমা দর্পণ, বাবু যামিনী রঞ্জন চাকমা। (ঈষৎ সংশোধিত)।

চাকমা গোত্র ও গোষ্ঠীগুলোর বিজাতীয় নাম ও পদবিগুলো তাদের সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা নির্ধারণের সহায়ক। তবে কিছু নাম ও পদবি দুর্বোধ্য হওয়ায়, ঐ লোকজনের সাম্প্রদায়িক মূল নির্ধারণ করা কঠিন। তা না হলে এটা পরিষ্কার হয়ে যেতো যে, বর্তমান চাকমা সম্প্রদায়, বিভিন্ন স্বতন্ত্র লোক সম্প্রদায়ের যৌগিক সমষ্টি। সবাই বিশুদ্ধ চাকমা নয়।

সর্দার ও লস্কর, চাকমা ভাষাভুক্ত পদবি নয়। এই দুই পদবিধারীরা আখ্যা গুণেই বিজাতীয়। দাজ্যা ও চেক কাবা মানে দাড়িওলা ও খতনাকৃত লোক। এটা পরিষ্কার মুসলিশ ঐতিহ্যধারীদের বুঝায়। খিয়াং, তিবিরা ও মগ পদবিগুলো ভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিচয় বহন করে। আগুন পুন মানে লালগুহ্য। রাঙ্গা কাঙ্গারা মানে লাল কাকড়া। নাংদা মানে নেংটা। কক কেঙ্গা মানে কক কক আওয়াজ কারী এক প্রকার সরিসৃপ। ফেজেরা মানে অপরিচ্ছন্ন। গজাল মানে গয়াল। পাগালা মানে পালকযুক্ত। নেই নেঙ্গ্যা মানে নামহীন। এই পদবিগুলো পরিচয় জ্ঞাপনে প্রত্যক্ষ না হলেও তাৎপর্যপুর্ণভাবে বিজাতি জ্ঞাপক। লাল গুহ্য উপাধিতে বুঝা যায় সংশ্লিষ্ট লোকেরা লাল গাত্র বর্ণ বিশিস্ট। এ জাতীয় লোক আসলে চাকমা সমাজে বিরল। এরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক হয়ে থাকবে। লাল কাকড়া মানে লাল বর্ণ লোক আসলে চাকমা সমাজে বিরল। এরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক হয়ে থাকবে। লাল কাকড়া সাধারণতঃ সমুদ্রের উপকূলে পাওয়া যায়। এই কাকড়ার মত রং ও চরিত্র ভুমিয়া ও চাকমাদের মাঝে থাকা স্বীকার্য নয়। কোন প্রাচীন বিবরণেই তাদের কারো নেংটা বা উলঙ্গ থাকার কথা বিবৃত হয়নি। ককেঙ্গা পদবিটি দুর্বোধ্যভাষী অর্থে ব্যবহৃত হলে, তাতেও বিজাতি বুঝা যায়। গয়াল পালক সমাজ হিসাবে কুকি পাংখো বনযুগী ও মুরং বুঝায়। ফেজেরা অর্থে গহীন পর্বতবাসী লোক, যারা পানি ও সাবানের অভাবে পরিচ্ছন্ন থাকতে অপারগ। এটা চাকমাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। পাখীর পালকের মুকুট পরা, কুকি সমষ্টিভুক্ত লোকদের মাঝে প্রচলিত। এই বিজাতীয় নামকরণের অর্থ এটা হতে পারে যে, মূল চাকমা সম্প্রদায় নিজেদের সামাজিক কৌলিন্য রক্ষায় বর্নভেদ প্রথার মত নিজেদের জনসমষ্টিতে ভিন্ন সমাজের অন্তর্ভুক্তদের স্বতন্ত্র পরিচিতি, তাদের প্রধান চরিত্রের ভিত্তিতে, পরিচিহ্নিত করে, গোষ্ঠীর আকারে জন

বিভাগের প্রবর্তন করেছে। যাতে ভবিষ্যতে কে কোন সম্প্রদায় ও সমাজের লোক, তা চিহ্নিত থাকে। গত আমদশুমারীগুলোর হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিগুলোর বৃদ্ধি না ঘটা ও হ্রাস পাওয়া প্রমাণিত।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে, অরাজক উপজাতিদের দমনের দ্বারা ব্যাপক হত্যা উৎপীড়ন ও বাস্তুত্যাগ ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত নয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও দেশের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যাপক বাস্তুত্যাগ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও তখনকার কোন বিবরণেই বিবৃত হয়নি। এমনতর ঘটনায় অবশ্যই রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হতো। এটা নীরবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। আরাকানী উদ্বাস্তুজনিত কারণে বৃটিশে ও বার্মায় বাদ প্রতিবাদ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আসামে ও আরাকানে বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ নির্বিবাদে অনুষ্ঠিত হয়নি। এটা মান্য নয় যে, কুকিসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিরা অতীতে এবং এখন সরকার কর্তৃক বিতাড়ন ও নির্মূলকরণের শিকার হয়েছে। যদ্দরুণ তাদের সংখ্যা বাড়েনি, বা হ্রাস পেয়েছে এবং এর বিপরীতে চাকমাদের নিরাপদ অত্যধিক জন্মহারই অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিদের গ্রাসকরণ ছাড়া চাকমাদের মাঝে বিজাতীয় গোত্র গোষ্ঠীর উদ্ভব হতে পারে না। আর এটাই ক্ষুদ্রদের বৃদ্ধি না ঘটা, সংখ্যা হ্রাস পাওয়া ও চাকমাদের বিজাতীয় নাম বিশিষ্ট লোক সহ সংখ্যা বৃদ্ধি জনিত অস্বাবাবিকতার অন্যতম যুক্তি গ্রাহ্য কারণ বলা যায়।
সতীশ চন্দ্র ঘোষ স্বীয় চাকমা জাতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, চাকমা রাজা অরুণ যুগের রাজধানী ছিলো উচ্চ ব্রহ্মের মইসা গিরি নামক স্থানে। তার সাথে মগ রাজা মেংদির যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, রাজা, তিন রাণী, তিন পুত্র দুই কন্যা এবং দশ হাজার স্বজাতীয় প্রজা বন্দী হোন। মগ প্রধানমন্ত্রীর পুত্র কনিষ্ঠ রাজকন্যাকেও রাজা মেংদি নিজে জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করেন। বন্দি প্রজারা ইয়ংক্ষং অঞ্চলে পুনর্বাসিত হয়। অনুরূপ আরো ঘটনায় মগদের সাথে চাকমাদের সংঘাত ও সামাজিক সংমিশ্রণ ঘটা প্রমাণিত। চাকমাদের সাথে ত্রিপুরাদের সংযোগ আর অভিন্ন হওয়ার বিবরণ মিঃ ফেইরকৃত হিষ্টরী অফ বার্মায় নিম্নাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

'যখন মেংবেং (ওরফে জেবকশাহ ১৫৩১-৫৩ খ্রীঃ) অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন, তখন উত্তরাগত জনৈক থেক রাজা, যাকে ত্রিপুরার অধিপতি জ্ঞান করা হয়, রামু পর্যন্ত অধিকার করেন। সূত্র ঃ বার্মার ইতিহাস ঃ পৃঃ ৭৯ মিঃ ফেইর।

এতে বুঝা যায়, থেক খ্যাত চাকমারা পরিচয়ে ত্রিপুরাদের সাথে সম্পর্কিত। চাকমা কিংবদন্তিতেও স্বীকার করা হয় ঃ রাজা সাথুয়া, প্রকাশ পাগলা রাজার মেয়ে অমঙ্গলী, জনৈক ত্রিপুরা কর্তায্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই পক্ষে জন্মলাভ করেন পীড়া ভাঙ্গা, যিনি তৈনছড়ি চাকমা রাজ্যের সিংহাসনের অন্যতম দাবীদার ছিলেন। মূল কুলিন চার চাকমা গোত্রের অন্যতম হলো ঐ পীড়া ভাঙ্গা গোত্র। এরা পিতৃ রক্তের সুবাদে মূলতঃ ত্রিপুরা।
চাকমাদের সমাজ বিস্তারের অতিরিক্ত প্রমাণ হলো ঃ মূল চার গোত্র থেকে প্রসারিত

হয়ে তা এখন ৩৪ গোত্র আর ১৭২টি উপগোত্রের সমষ্টি। আদি ধূর্য্যা, কুর্য্যা, ধাবানা ও পীড়া ভাঙ্গাই সব গোত্র আর উপগোত্রের মূল নয়। স্বতন্ত্র ৩৪টি ও তার বহু শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়ে চাকমা সমষ্টি গঠিত। বর্ণিত চার রাজ পুরুষকে তৈনছড়ি সিংহাসনের প্রতিযোগী পাওয়ার সুত্রে এটা নিরুপিত হয় যে, এরা মৈসাং রাজার বংশধর পরবর্তী পুরুষ। প্রতি ২০ বছরে এক পুরুষ ধরা হলে, কিংবদন্তীয় কর্মকাল প্রায় দু'শত বছরে ব্যাপ্ত হয়। তাতে মৈসাং এর আরাকান ত্যাগের ঘটনাকাল পঞ্চদশ খ্রীঃ সন এবং ধাবানাদের সময়কাল হয়ে দাঁড়ায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল। সে থেকে গত তিনশত বছরে গোত্র গোষ্ঠীগুলো বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌছেছে। ধাবানাদের দু-পুরুষের মাথায় রাজা মোগল্যার অবস্থান থাকায়, এই হিসাবেও তা মোগল আমলে পড়ে। সুতরাং ভাবার অবকাশ আছে যে, এই সময়ের ভিতর বিপুল সংখ্যক লোকের চাকমা সমষ্টিভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক জন্মগত বৃদ্ধি নয়।

<u>৫। চাকমা পদবির মূল সন্ধান।</u>

আগেই বর্ণিত হয়েছে, এ পদবিটির উৎস বর্ণনায় পন্ডিত মহল সহ অনেকে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে আমি যে ভিন্ন মত পোষণ করি, তার সূত্র সম্বন্ধ ভিন্ন। চাকমাদের চাঙমা এবং গারো আর চাকতের সাঙমা উপাধি, আমাকে এই তিন দল লোকের অভিন্ন মূল আর একই পদবিধারী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে প্রলুব্ধ করে। আমার এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে, চাকমাদের লোকগীতি ও কাহিনী ভিত্তিক দেশান্তর বর্ণনা ও সাম্প্রতিককালের পত্র-পত্রিকাভিত্তিক দুটি বিবরণ এখানে উপস্থাপনযোগ্য।

<u>ক) লোককাহিনী ভিত্তিক সমর্থন।</u>

চাকমা লোককাহিনী হলোঃ হিমালয় দক্ষিণের কোন এক কল্পনগর থেকে চাকমা পুর্ব পুরুষেরা বিতাড়িত বা স্থানান্তরিত হয়ে, হিমালয় ঢালের কোন এক নদী উপত্যকায় চম্পক নগর নামক নতুন এক রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করেন। একদা ঐ রাজ্যের যুবরাজ বিজয় গিরি, সাত চামুচ বা ছাব্বিশ হাজার সৈন্য সহ দিগ্বিজয়ে বাহির হোন। নদী পথে ছয় দিবা রাত্রি যাত্রার পর তারা তেওয়া নামক নদীর তীরে কালাবাঘায় অবতরণ করেন, ও তা বিজিত হয়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, পরবর্তী যাত্রায় ঘাঘট নামীয় একটি নদীও তাদেরকে পাড়ি দিতে হয়েছে। তৎপর তাদের যাত্রা পথে খৈ গাঙ, তিবিরা, মেঘনা দয্যা, চাটিগাঙ, হাঙরকূল, অকসাদেশ, কালিঞ্জর, কুকি রাজ্য, মগ রাজ্য এবং যুদ্ধাভিযানে সে সব অঞ্চল জয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। লোকগীতিতে ব্যক্ত এই বিশাল দিগ্বিজয়ে ১২ বছর কাল অতিক্রান্ত হয়। সেনাপতি রাধামোহন স্বদেশ চম্পক নগর ফিরে যান। রাজকুমার ফিরতি পথে খবর পান যে, পিতা বৃদ্ধরাজা সমর গিরি তিরোধান করেছেন এবং তদস্থলে ছোট ভাই উদয় গিরি রাজা ঘোষিত হয়েছেন। তাই ভাই ও স্বজাতিদের সাথে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য তিনি স্বীয় বিজিত রাজ্যে ফিরে যান। এবং স্থানীয় মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পেতে সৈন্যদের বিজিত দেশে থেকে যেতে নির্দেশ দেন এবং নিজেও একজন আরি

মহিলাকে বিবাহ করেন। (সূত্র : চাকমা রাজ কাহিনী, রাধা মোহন ধনপতির পালা, ভাটিগাং ছাড়া পালা ইত্যাদি)।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই যাত্রা বা অভিযান হিমালয়ের দক্ষিণ ঢাল থেকে শুরু হয়ে আরাকানে পৌঁছে শেষ হয়েছে। এর মধ্যাঞ্চলে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা অবস্থিত। এই বিস্তৃত অঞ্চলটি নির্বিঘ্নে ও স্বল্প সময়ে পাড়ি দেয়া সম্ভব হয়নি। তেওয়া মানে করতোয়া আর কালা বাঘা মানে করতোয়া মোহনার ভাটিতে অবস্থিত বাঘা অঞ্চল হওয়াই সম্ভব। ঘাঘট নদীটিও হুবহু একই নামে তার উজানে গাইবান্ধায় অবস্থিত। এতে বুঝা যায়, সুদূর অতীতে বাংলাদেশ সন্নিহিত উজানের হিমালয় ঢাল থেকে কোন কারণবশতঃ এই সম্প্রদায়ের একদল অভিযাত্রী করতোয়ার ভাটি পথে বাঘা পর্যন্ত ছয় দিন ছয় রাত্রি ধরে যাত্রা করেছেন। সেই প্রাচীন যুগে পাহাড়ী লোকের যাত্রার বাহন বাঁশ গাছের চালি হয়ে থাকলে, তাতে ছয় দিবা রাত্রি লাগাই সম্ভব। তৎপর দ্বিতীয় যাত্রা স্থল খৈগাং বা খেয়াই নদী ও ত্রিপুরা অঞ্চলে যেতে তাদেরকে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে পূর্ব তীরবর্তী গারো অধ্যুষিত এলাকাসমূহ অতিক্রম করতে হয়েছে। সম্ভবতঃ মত বিরোধ বা উপদলীয় কলহে সেখানে তাদের মাঝে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে বিচ্ছিন্ন একটি শাখা, গারো পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে থেকে যায়। এখানে একদল গারো সাঙমা নামে পরিচিত। তৎপর অবশিষ্টরা ত্রিপুরার দিকে প্রস্থান করে। তারা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল হয়ে মধ্যবর্তী সমতল পাড়ি দেয়। তারই নির্দশন হলো সরাইলের চাকমার গ্রাম ও শাহবাজপুরের অদূরে চম্পকনগর নামীয় পাড়ার অবস্থিতি। তারপর খোয়াই ত্রিপুরা মেঘনা চাটিগাঙ, কুকি রাজ্য, কালিগঞ্জর হাঙরকুল, ওকসা দেশ ও মগ রাজ্য ইত্যাদি আরাকান পর্যন্ত পর পর প্রায় অবিকৃত নামে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত আছে। শেষ প্রান্তেচাংমা চাক বা থেকদের বাস। যারা চাকমাদের আরেক বিচ্ছিন্ন শাখাই হবে। সম্ভবতঃ মগ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, অধিকাংশ চাকমা আরাকান ত্যাগ করলেও থেক বা চাকেরা দ্বিমতবশতঃ নিজেদের অবস্থান অব্যাহত রাখে। পরে ভিন্ন অবস্থানগত কারণে তাদের মাঝে স্বজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি এবং জন্মগত বিশুদ্ধতার প্রাচীন ঐতিহ্য লোপ পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই তিন শাখার মাঝে ভাষা ও সংস্কৃতিতে ও ভিন্নতা সূচিত হয়েছে। তবে অজানতে অলক্ষ্যে অভিন্ন পরিচয়ের অবশেষ, সাধারণ ভিন্ন উচ্চারণে সাঙমা ও চাঙমা পদবি অবশিষ্ট থেকে গেছে। এই যোগসূত্র বিস্ময়কর হলেও বাস্তব নয়। আর এটাও বিস্ময়কর হলেও বাস্তব যে, যাত্রা পথের ভৌগোলিক নামগুলো অশিক্ষিত লোক গীতিকার গেংকুলিদের মুখে ব্যক্ত হয়, যাদের এত প্রাচীন ও দূরবর্তী ব্যাপক ভৌগোলিক জ্ঞান থাকা অসম্ভব। সুতরাং ভৌগোলিক বাস্তবতার গুণেই বর্ণিত চাকমা দেশান্তর কাহিনীটির বিশ্বাসযোগ্যতা মান্য। তবে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় কাব্যিক অতিরঞ্জন ঘটা স্বাভাবিক। তাই দ্বিগ্বিজয় সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোকে উৎসাহ বর্ধক সংযোজন ভাবা যেতে পারে।

খ) পত্র-পত্রিকা ভিত্তিক সমর্থন।

১। একটি অপরাধ সংক্রান্ত খবরে নিম্নোক্ত ব্যক্তি পরিচয়টি সংবাদপত্র সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে : রমলা মারাক, পিং নিতাই সাঙমা, সাং জোড়া আমগাছা, মধুপুর, টাঙ্গাইল। (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, তাং-২৫-১২-৮৯)।

২। চাক রূপকথা টিয়া কাহিনীর নায়িকা, হলেন জনৈকা আলু সাঙমা। সূত্র : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী : গিরি নির্ঝর, ১ম ও ২য় সংখ্যা মে ১৯৮২।

৩। বিখ্যাত গারো নেতা পি. এ. সাঙমা, যিনি ভারতীয় লোকসভার সাবেক স্পীকার। বাসস্থান ঃ গারো পাহাড় বা মেঘালয় অঞ্চল।

সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে, গারো ও চাকদের মাঝে সাঙমা, পদবিটি প্রচলিত আছে। এ তথ্যটি হলো চাঙমা ও সাঙমা এই তিন সম্প্রদায়ের অভিন্ন মূল হওয়ার একটি সূত্র।

৬। চম্পক নগরের অবস্থান নির্ণয় ও চাকমা দেশান্তর।

এখন চাকমাদের মূল বাসস্থান চাম্পক নগরের অবস্থান ও বাস্তবতা নির্ণয় করা আবশ্যক। লোক কাহিনীর বর্ণনানুযায়ী তা ব্রহ্মপুত্রের হিমালয় অংশ সাংপো বা ঐ পর্বতের পূর্ব-দক্ষিণ ঢালের ইরাবতী নদীর তীরবর্তী কোন অঞ্চল বা দেশ। কিন্তু তা প্রাচীনকালের ভেলা বা চালি বাহিত তেওয়া বা করতোয়া নদীপথের ছয় দিবারাত্রি দূরের অঞ্চল নয়। করতোয়াকে সুত্র ধরে ভাবা যায় ছয় দিবা রাত্রি দূরের, হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালের নেপাল সংলগ্ন কোন অঞ্চলেই তার অবস্থান থাকা সম্ভব। যাত্রা পথে তেওয়া বা করতোয়া বাঘা ও ঘাঘট নদী পড়ায় মূল কাহিনীর দ্বারাই তার অবস্থান উত্তর ভারতীয় তরাই অঞ্চলে নির্ণীত হয়। এ ব্যাপারে অন্য সহায়ক সুত্রগুলো হলো, যথা ঃ

ক) অভিযাত্রী দলের দলপতির গিরি উপাধি।
খ) চাকমা কটুবাক্য ঃ মগধা।
গ) চম্পক নগরের নগর বিশেষণ।
ঘ) চাকমা ভাষার ভাওয়াইয়া ও হিন্দী চরিত্র।
ঙ) চাকমা রাজসূত্রের স্বীকৃতি।
চ) ঘটনা সুত্রে ব্যক্ত সামঞ্জস্যশীল নামের সমর্থন।

ক) উত্তর বিহার অঞ্চলকে গাড়োয়াল অঞ্চল বলা হয়ে থাকে। ওখানকার অনেক লোকের গিরি উপাধিযুক্ত নাম রাখার প্রবণতা আছে। আমরা বৃটিশ আমলের বিখ্যাত সন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাসে অনেক সন্যাসী গুরুর গিরি উপাধিযুক্ত নাম লক্ষ্য করে থাকি। সাধারণতঃ ওরা ছিলেন হিন্দী ভাষী উত্তর বিহারবাসী লোক। এই গিরি উপাধিসূত্রে বিজয় গিরির বাসস্থান চম্পক নগরের অবস্থান উত্তর বিহারের বাংলা সীমান্তের কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব।

খ) চাকমারা কুপিত হলে, বিপক্ষের প্রতি মগধা বা মগধামু এই কটুবাক্যটি প্রয়োগ

করে থাকে, যা মগধ নাম জাত কটু বিশেষণ বলেই আমার ধারণা। অতীতে কখনো তাদের মগধবাসীদের দ্বারা উৎপীড়িত হওয়া সম্ভব। যদ্দরুণ মাঘধীরা তাদের কাছে ঘৃণিত মগধা। এটা চাকমা ভাষাজাত নিজস্ব কটু বিশেষণ। কেউ কেউ মগধাকে মৌতা শব্দের অপভ্রংশ মনে করে থাকেন, কিন্তু তা ভুল ও দুর্বল যুক্তি। এই সুত্রে বুঝা যায় মগধের অভ্যন্তরে বা কাছাকাছি হিমালয় ঢালেই কথিত চম্পক নগরের অবস্থান ছিলো।

গ) নগর বিশেষণপ্রবণ অঞ্চল হলো নেপাল. বিহার ও বাংলাদেশ। দক্ষিণপূর্ব নেপালের বৈরাট নগর, বিহারের জমশেদ নগর, বাংলার নবীনগর ইত্যাদি তার প্রমাণ। সুতরাং এই সুত্রেও চম্পক নগরের অবস্থান এই তিন আঞ্চলিক ত্রিভুজের ভিতরই পড়ে।

ঘ) চাকমা ভাষা আঞ্চলিক বাংলা হলেও, ভাওয়াইয়া ও হিন্দীর দ্বারা প্রভাতিত, যথা ঃ

১। চাকমা গান :

'রাজা বাদাত পান হেদুং।
গুরু সাধি নাং পেদুং।
সাধি ঘরত আবুচতুং।
পর্বুয়া পন্দিত মুই হদুং।
দর্য্যা করলি পায় গন্দুং।
আকাচ চান তারা আদত পেদুং।
(সূত্র : গজেনোর লামাঃ শিব চরণ ফকির)
বাংলা : রাজার বাটায় পান খেতাম!
গুরু সাধি নাম পেতাম!
সাধি ঘরে বসতে পেতাম!
দরিয়ার কাকড় পায়ে গুণতাম!
আকাশ চাঁদ তারা হাতে পেতাম! (সূত্র ঃ গজেনর লামা ঃ শিব চরণ ফকির)

২। ভাওয়াইয়া গান : হাত ধরং ওরে কালা পাও বা ধরং তোরে
ওরে গাছের কাপড় পাড়িয়া দে তুই যাং এলা ঘরে রে!

এখানে উল্লেখিত চাকমা গান ও ভাওয়াইয়া গানে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে বিস্ময়কর মিল ব্যক্ত হয়েছে।

৩। হিন্দী কথ্য রীতি : হাম যায়েংগে, এর চাকমা রূপান্তর হবে, আমি যেবোং গে। এখানে সর্বনামে ও বহুবচনে হাম এর পরিবর্তে আমি এবং যাওয়া ক্রিয়াপদে ংগের স্থলে ংগে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দির মত চাকমাতেও ক্রিয়ার আগে না পদ বসে, যথা হিন্দি, নেহি যায়েঙ্গে, চাকমা ন যেবোংগে। শব্দ ও বাক্যে ব্যবধান সামান্যই লক্ষ্যণীয়। এতেও প্রমাণিত হয়, এই ত্রয়ী কথারীতির লোকেরা পরস্পরের এককালিন প্রতিবেশী হয়ে থাকবে।

ঙ) চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে প্রয়াত রাজা ভুবন মোহন রায় উল্লেখ করেছেন :

অনেক দিন পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে শাক্য নামে এক রাজা বাস করতেন, কল্প নগর তার রাজ্যের রাজধানী ছিলো। ....মন্ত্রী শ্যামল কল্প নগর ত্যাগ করে হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব ঢালে একটা নতুন রাজ্যের পত্তন করেন। ....চম্পা কলি নামে তার এক পুত্র ছিলো। তিনি ইরাবতী নদীর পূর্ব পারে একটা নতুন নগর গড়ে তুলেন। পুত্রের নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয় চম্পক নগর।

এখানে চাকমাদের আদি বাসস্থান কল্পনগর শাক্য অধ্যুষিত হিমালয় পাদদেশে অবস্থিত বলে বর্ণিত হওয়ায় তা নেপালের দক্ষিণের তরাই অঞ্চলই নির্ণীত হয়। অপরদিকে চম্পক নগরটি উপরের পরিবেশগত বর্ণনায় ইরাবতী উপত্যকায় অবস্থিত বলে সমর্থিত হয় না।

যেহেতু ভাওয়াইয়ার জন্মস্থান উত্তর বাংলা এবং মাগধীও হিন্দির প্রচলন ক্ষেত্র, তার পশ্চিমাঞ্চল, এই দুই ভাষা শৈলীর সাথে মৌলিকভাবে সামঞ্জস্যশীল চাকমা ভাষারও জন্মক্ষেত্র ঐ পরিবেশেই হওয়া সম্ভব। এহেতু চম্পক নগরের অবস্থান উত্তর বাংলা ও মগধ অঞ্চলের ধারে কাছে বা ভিতরই হবে।

চ) ঘটনা সুত্রে ব্যক্ত সমর্থন ঐতিহাসিক বিবরণ থেকেও পাওয়া যায়, যথা :

১) কামগার খান মুইন চম্পানগর নালায়, শিবির সন্নিবেশিত করেছিলেন। ......অধুয়ায় নবাবের (মীর কাশেম আলী খাঁ) সৈন্যরা প্রায়ই রাত্রিকালে গুপ্তপথে বেরিয়ে এসে ইংরেজ সৈন্যদের বিপর্যস্ত করতো। (সূত্র : রিয়াজুস সালাতিন পৃ : ৬০৯, বাংলা অনুবাদ: বাংলা একাডেমি ঢাকা)।

২। মীর হাবিব ও তার (মারাঠী) বন্ধুরা চম্পা নগরের নদীতে আলীবর্দী খাঁকে বাঁধা দিতে ব্যর্থ হয়ে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে। (সূত্র : সিয়ারুল মোতায়াখ খিরিন থেকে উদ্ধৃতি ঐ পৃ : ৫৬৫)।

উপরোক্ত সূত্রে বিহারের উদয় নালায় একটি চম্পানগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা উত্তর-পূর্ব বিহারের পুর্ণিয়া জেলার নেপাল সীমান্তে অবস্থিত। তারই সামান্য পরিবর্তিত রূপায়ন চম্পক নগর। সম্ভবত ঃ ঐ অবস্থান থেকে মূল মাগধী শাসক গোষ্ঠীর উৎপীড়নের ফলে চাকমারা স্থান ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম দিনাজপুর বা নিম্ন দার্জিলিং অঞ্চলের দিকে আসে। মগধ রাজ্যাধীন অঞ্চলে না থাকার মনোভাবের ভিত্তিতে তারা আরো দূরে কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পার্শ্ববর্তী কোন এলাকাও তাদের মনঃপুত হয়নি। ফলে একটি ছড়া পথে নেমে এসে করতোয়া নদীতে পড়ে। তৎপর নীচের দিকে দীর্ঘ যাত্রার শুরু। সম্ভবতঃ নির্বিরোধ নির্জন পাহাড়ী অঞ্চলই তাদের কাম্য ছিলো, যা জুম চাষ ও সংঘাত প্রতিযোগিতাহীন জীবন-যাপনের উপযোগী। তাই ত্রিপুরায় ও তাদের স্থিতিলাভ ঘটেনি। আরো দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ের দিকে তারা ক্রমান্বয়ে সরে যেতে থাকে। গোমতি নদী তীরের চম্পক নগর ও ফেনী নদী তীরের চম্পক নগর পরিচিত স্থানগুলো হয়তো তাদের অন্তরবর্তীকালিন বাসস্থান ছিলো। নির্বিরোধ নির্জন পাহাড়ঞ্চলকেই বাসস্থান হিসাবে

অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকায়, তারা চট্টগ্রামের বসতিপুর্ণ সমতল অঞ্চলকে এড়িয়ে ফেনী নদী হয়ে উজানের দিকে এগিয়ে থাকবে। তৎপর ঠেকানদী হয়ে চীন পাহাড় অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছে। পরে তারই দক্ষিণের পাহাড় ও উপত্যকা ভূমিকে কাঙ্খিত বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছে। ওটাই তাদের দীর্ঘদিনের বসবাস ক্ষেত্র কথিত মইসা গিরি রাজ্য, যা উত্তর আরাকানের রোসাং রাজ্যভুক্ত এলাকা।

হয়তো তাদের আধিপত্য আর অবাধ্যতায়, ঐ অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতার ভয়ে, মগ জনগণও রোসাং অধিপতি তাদের প্রতি রুষ্ট হোন, অথবা তারা সেখানে রাজকীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় বিদ্রোহ করেছিলো। যদ্দরুণ আক্রান্ত আর বিতাড়ির হয়। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহগুলোর সাথে এটিকেও মিলিয়ে দেখলে অনুমিত হয়, ওটাও ছিলো ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। মাগধীদের দ্বারা আক্রান্ত আর বিতাড়িত হওয়ার কার্যকারণটিও অনুরূপ বিদ্রোহজনিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং বলা যায়, এ সম্প্রদায়টি মূল থেকেই চরিত্রগত ভাবে বিদ্রোহপ্রবণ, স্বাধীনচেতা ও উচ্চাকাঙ্খী। চম্পকনগর হলো তাদের দীর্ঘ পোষিত স্বাধীনতা আকাঙখার প্রতিকীভূমি। কাঙ্খিত ক্ষমতা কেন্দ্র হিসাবে এই নামটি তাদের অন্তরের গভীরে গ্রথিত হয়ে আছে। জুম্মল্যান্ডের ধূঁয়া ঐ চম্পক নগরেরই বাহ্যিক অবয়ব।

৭। টুং টুঙ্গ্যা, টং টঙ্গ্যা ও তঞ্চঙ্গ্যা

টুং টুং ঙ্গ্যা হলো চাকমা সমাজের অন্যতম বৃহৎ একটি শাখা। এ নামটি শুনতে যেমন ঝংকারময়, তেমনি তার উচ্চারণটিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেউ বলেন চং চঙ্গ্যা, কেউ তঞ্চঙ্গ্যা, তবে বাঙ্গালীদের কাছে তা প্রায় অভিন্নভাবেই টুং টুঙ্গ্যা বা টং টঙ্গ্যা। উপজাতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, আরাকানী ভাষায় টং মানে পাহাড়, এবং টঙ্গ্যা মানে পাহাড়ী বা জুমিয়া , যার পূরা অর্থ পাহাড়ী জুমিয়া। তবে টং টঙ্গ্যা নামটি আরাকানে প্রচলিত নেই। সেখানে এ নামের কোন জনগোষ্ঠীর থাকার কথা কোন বিবরণেই ব্যক্ত হয়নি। সুতরাং টং পাহাড় অর্থ জ্ঞাপক আরাকানী শব্দ হলেও টং টঙ্গ্যা চট্টগ্রামী বাংলা শব্দ। নামটির অর্থবহ বাংলা সুত্র হলো ট ং অর্থ মাচা ঘর, টঙ্গ্যা অর্থ মাচা ঘরের বাসিন্দা। চট্টগ্রামী আঞ্চলিক ভাষায় শব্দের শেষে ইয়া উয়া উপসর্গ বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য আর বিশেষণ গঠিত হয়। এই নিয়মে টং থেকে টংঙ্গ্যা শব্দ গঠিত। এ নামের অপর সুত্র হলো : পূর্বাঞ্চলের আলী কদম থানাধীন তৈনছড়ি এলাকায় এককালে চাকমা উপজাতির ঘন বসতি ছিলো। তারা ছিলো সাধারণতঃ মাচাঘরে বসবাসে অভ্যস্ত। তাই নিম্নাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীরা তাদেরকে মাচাঘরবাসী অর্থেও প্রথমে তৈন টঙ্গ্যা নাম দিয়ে থাকবে। তৎপর তা থেকে দীর্ঘদিনে পরিবর্তিত হয়ে টং টঙ্গ্যা হয়েছে। টুং টুঙ্গ্যা নামের সাধারণে প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো, ঐ সমাজের বিশেষ শাখার মেয়েরা রূপার হাসুলী, খাড় বাজুবন্দ ও টাকার লহর অলংকার হিসাবে পরে থাকে, যা চলাফেরা ও নড়াচড়াকালে টুংটাং ঝংকার তুলে। ঐ টুং টাং শব্দের সাথে চট্টগ্রামী ইয়া উয়া প্রত্যয় যুক্ত হয়ে টুং টাংকারী অর্থে টুং টুঙ্গ্যা নামের

উদ্ভব হয়েছে। আরেক ব্যাখ্যা হলো, তারা গৃহপালিত পশুগলোকে গলায় বাঁশ বা কাঠের খোদাইকৃত ঘন্টি পরিয়ে জঙ্গলে চরতে দেয়, যার টুং টাং আওয়াজে পশুগুলোর অবস্থান নির্ণীত হয়। এই সুত্রেও তারা টুং টুঙ্গ্যা।

৮। সেক, থেক, চাঙমা ও সাঙমা।

স্যার আর্থার পি ফেইর স্বীয় পুস্তক History of Burma তে উল্লেখ করেছেন : আরাকানে Thek অথবা Sak নামীয় একটি সম্প্রদায় আছে। আধুনিক চাকমা পন্ডিত বাবু সুগত তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : আরাকানী ও বর্মীরা চাকমাদেরকে Sak বা Thek বলে। (সূত্র : মোন কথা : চাকমাদের ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস, পৃ : ২৩/১৯৯১)।

এখানে আর্থার পি ফেইর এর গোটা বক্তব্যটি দ্রষ্টব্য ঃ

When Meng Beng was thus engaged, an enemy had appeared from the north, called in Arakanese history the thek or sak king, by which Raja of Tippera to be meant, He had penetrated to Ramu, but was driven back, and Meng Beng again occupied Chittagong. (Ref : The History of Burma, page 79/1883)

বাংলা : মেং বেং অন্যত্র ব্যস্ত থাকাকালে উত্তর থেকে আগত জনৈক শত্রুর আবির্ভাব ঘটে, যিনি আরাকানী ইতিহাসে থেক বা সেক রাজা নামে অভিহিত হোন, যে নামের দ্বারা ত্রিপুরা রাজাকে বুঝান হয়ে থাকে। তিনি রামু পর্যন্ত অগ্রসর হোন, তবে তাকে হটিয়ে, দেয়া হয়। এবং মেং বেং পুনরায় চট্টগ্রাম দখল করেন।
(সূত্র : হিষ্টোরী অফ বার্মা পৃ : ৮৯/১৮৮৩)

উল্লেখ্য যে সেক বা থেক নামের উচ্চারণে আমি সুগত বাবু ও অন্যান্য স্থানীয় লেখকদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। আসলে তা সাক বা চাক নয়, সেক। প্রতিশব্দ থেক এর উচ্চারণের সাথে সেকই সামঞ্জস্যপুর্ণ, সাক বা চাক নয়। শব্দ দুটির মূল শব্দ হলো আরবী শেখ, যার প্রথম অক্ষর একারে উচ্চারিত হয়, আকারে নয়। ইংলিশ উচ্চারণ রীতিতেও তিন অক্ষর যুক্ত শব্দের মধ্যবর্তী, A সচরাচর একারেই উচ্চারিত হয়। মধ্যবর্তী বর্ণ U হলে আকারের প্রয়োগ ঘটে। সুতরাং সাক বা চাক উচ্চারণ ভুল।

থেক বা সেক যে আরবী শেখ শব্দের অপভ্রংশ, তার সাথে মাননীয় আর্থার ফেইরও একমত, যথা : তখন এতদাঞ্চলে (আরাকানে) কিছু পশ্চিমা লোক বাণিজ্যে উপলক্ষ্যে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন, যাদের অনেকের উপাধি ছিলো শেখ, যা থেকে থেক বা সেক নামের উৎপত্তি হয়েছে। সূত্র : জার্নাল ওফ এশিয়াটিক

সোসাইটি ওফ বেঙ্গল, সংখ্যা ১৪৫/১৮৪৪ পৃ: ২০১-২। আমার জানা মতে, আরাকানী ভাষায় এস এইচ বা শ বর্ণটি হালকা উচ্চারণে টি এইচ বা এস এর আকারে থ বা স হয়ে দাঁড়ায়। কে এইচ বা খ হয়ে পড়ে কে বা ক। এ কারণে মূল আরবী শব্দ শেখ Shekh রূপান্তরিত হয়ে সেক হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে আরবের শেখ ও আরাকানের সেক এর অভিন্ন হওয়ার প্রমাণ কী?

হাজার বছর আগের ভুগোল ও ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে আরবী ইরানী বণিক ও ইসলাম প্রচারকগণ, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ও দ্বীপাঞ্চলে, বিভিন্ন পণ্য আর ধর্মীয় বাণী নিয়ে বিপুল সংখ্যা ও উৎসাহে, স্থানীয় লোকদের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় পরিচয় ছিলো শেখ। তাদের অধিকাংশ বিদেশকে স্বদেশ করে নিয়ে আত্মীয়তার মাধ্যমে স্থানীয় সমাজের সাথে একিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। এরই ফল হলো ভারত, আরাকান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে ইসলামের প্রসার ও মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি। সেই তাদেরই স্থানীয় বংশধরেরা দেশে দেশে শেখ নামে অবিহিত হোন। বিজাতীয় ও বিরূপ প্রভাবে অনেক বিছিন্ন পরিবেশে সেই শেখ বংশধরদের অনেকে নিজেদের পিতৃ ধর্মীয় ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছেন। তবে সংস্কৃতি ও সামাজিকতার পৃথক একটি পরিচিতি তাদের মাঝে বিদ্যমান থেকে গেছে। যার মাঝে, মুসলিম ভাষা আদব, কায়দা, আচার-আচরণ, নাম উপাধি ইত্যাদির স্বতন্ত্র একটি ধারা পরিস্ফুট। থেক বা সেকদের সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও, তাদের কথিত জ্ঞাতি চাকমাদের বিষয়াদি দীর্ঘদিন যাবত একান্তে অধ্যয়ন করছি। তাতে এ সত্যই প্রতিভাত হয় যে, এ সমাজটি আচার আচরণ, সংস্কার সংস্কৃতি, ভাষা ও নামকরণে, বিপুলভাবে মুসলিম প্রভাবিত। যে ধর্মীয় পরিভাষা ও আদব কায়দা একজন খাঁটি মুসলমানেরই অনুকরণীয় এবং যার প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র মুসলিম গৃহকোণ, তা চামকাদের মাঝে প্রচলিত। একজন পৌত্তলিক আর একজন একত্ববাদী মুসলিমের সামাজিক আচার-আচরণ ও ভাষায় বিস্তর অমিল পাওয়া যায়। কিছু ধর্মীয় পারিভাষিত শব্দ তাদের দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারে স্থান পায় ও পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য তদ্বারা নির্ধারিত হয়। চাকমা আচরণ ও ভাষায় সেই স্বতন্ত্র মুসলিম চরিত্রই প্রবিষ্ট আছে।

মোগল আমলের শেষকাল থেকে বৃটিশ আমল পর্যন্ত সময়কালেই চাকমা সম্প্রদায়, উত্তর আরাকান অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের দিকে আস্তে আস্তে পাড়ি দিতে শুরু করে। যদিও ১৭৮৭ খ্রীঃ সালে লিখিত আরাকানের রাজার চিঠি ও তখনকার আরাকানী উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সরকারী দলিলপত্রে, চাকমা সম্প্রদায় স্বনামেই উল্লেখিত হয়েছে। তবু তাদের স্থানীয় শাখা ভিত্তিক বিকল্প নাম সেক বা থেক হওয়াটাও সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে সঠিক ধরে ফেইর সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী উত্তর আরাকানে একদা চাকমা বাসস্থান ও আধিপত্য থাকার কথা জানা যায়। প্রাচীন ঐতিহাসিক বক্তব্যে উত্তরে ত্রিপুরা ও দক্ষিণে বার্মা ছাড়া কোন স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিলো না। তবে উত্তর দিক ও সেক পরিচয় ঘটনার সাথে ব্যক্ত হওয়ায় বলা যায় :

কার্যতঃ সেকদের বাসস্থান আরাকানের উত্তর সীমান্তে ছিলো। তবে সে পর্যন্ত তারা স্বাধীন শক্তি ছিলো না। ত্রিপুরা সমাজে সেক ও থেক নামের কোন জনগোষ্ঠী আগেও ছিলো না, বর্তমানেও নেই। তবে একদা প্রাচীনকালে ঐ ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা সমাজের সঙ্গে চাকমাদের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা তাদের লোককাহিনীর দ্বারা সমর্থিত হয়। এই সুত্রে কর্ণফুলীর অন্যতম উপনদী ঠেকার ও কিছুটা যোগসুত্র আছে বলে মনে হয়। থেক থেকে বিশেষণে থেকা হতে পারে, যা বাংলায় ঠেকা উচ্চারিত হয়। বাংলাদেশ ও মিজোরামের মধ্যবর্তী অধিকাংশ সীমান্ত রেখা ঠেকা নদীর দ্বারা চিহ্নিত। তার উৎসস্থল হলো আরাকান, মিজোরাম ও বাংলাদেশ সীমান্তের ত্রিভূজ অঞ্চল। ঠেকা মোহনা প্রাচীন ত্রিপুরার সীমান্ত সংলগ্নও বটে। ত্রিপুরাবাসী চাকমা নামীয় থেকদের উত্তর আরাকানে পাড়ি দিবার নিরাপদ পথ হিসাবে এ নদী ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। অদ্যাবধি ঠেকা উপত্যকা চাকমা অধ্যুষিত হয়ে আছে। এই সুত্রে এই নদীটির থেকা তথা ঠেকা নাম ধারণ সম্ভব। পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও দে বারোজের অঙ্কিত মানচিত্রের সুত্রে ও প্রমাণিত হয়, মিজোরামের কাছাকাছি অঞ্চলে উত্তর আরাকানে প্রাচীনকালে একটি চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চল ছিলো। সুতরাং রামু আক্রমণকারী উত্তরাগত শত্রু সেকদের বেনামে চাকমা হওয়াই সম্ভব।

এখানে আরেকটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ্য যে, আরাকানে কলা কালা বা কেলা অর্থে বাঙ্গালী বুঝায়। বর্ণিত তিন দেশীয় ত্রিভুজের আরাকান অংশে কলাদন, কালাদন বা কেলাদেইন নামীয় একটি নদী ও উপত্যকা অবস্থিত। এই নদী বাংলাদেশ ও আরাকানের কিছু অংশের সীমান্ত ও বটে। চাকমারা আঞ্চলিক ধরণের বাংলায় কথা বলে, যা অংশতঃ চট্টগ্রামী, ও ভাওয়াইয়া আঞ্চলিক বাংলার সমগোত্রীয়। বাংলাভাষী চাকমাদের বসবাস সূত্রে স্থানীয় মগদের দ্বারা ঐ অঞ্চলটি কলাদন, কালাদন বা কেলাদেইন নাম ধারণ করে থাকবে।

চাকমা ও আরাকানী লোককাহিনী, তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের অনেক ঘটনাই ব্যক্ত করে, যা একদা তাদের পরস্পরের প্রতিবেশী হওয়ার ও প্রমাণ।

আরাকানী, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশী ইতিহাসে, এই ত্রিদেশীয় পরিবেশের কোথাও কোনকালে কোন চাকমা রাজশক্তির অস্তিত্বের কথা স্বীকৃত নয়। তবু বিভিন্ন ঘটনা সুত্রে অবহিত হওয়া যায় যে, বর্ণিত তিন দেশীয় ত্রিভুজ অঞ্চলে জনবল ও রাজনৈতিক সামর্থে চাকমা সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য শক্তির অধিকারী ছিলো।

এটা বিস্ময়কর যে লোক কাহিনী আর নানা ঐতিহাসিক সুত্র অনুযায়ী চাকমা সম্প্রদায়কে বারবার রাজশক্তির অধিকারী বৃহৎ প্রতিবেশীদের দ্বারা আক্রান্ত ও নির্বাসিত হতে দেখা যায়। তাদের প্রাচীন আবাসভূমি কল্পনগর ও চম্পকনগর, সম্ভবতঃ মগধবাসীদের দ্বারা বিজিত হয়। তৃতীয় আবাসভূমি ত্রিপুরার চম্পক নগর গুলো ত্রিপুরাদের হাতে পরিত্যক্ত হয়। চতুর্থ আবাসভূমি আরাকানের মইসাগিরি অঞ্চল, মগদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়। তৎপর তাদের শেষ আবাসভূমি বাংলাদেশের এই পার্বত্য চট্টগ্রামেও অশান্তি আর অস্থিরতা বিদ্যমান। এ জন্য সম্ভবতঃ দায়ী তাদের

অসহিষ্ণুতা, উচ্চাকাঙ্খা ও মানিয়ে চলতে না পারার একরোখা চরিত্র।
দক্ষিণ এশীয় ধর্মীয় ও জাতিগত পরিবেশ এখানে প্রণিধানযোগ্য। তদ্বারা চাকমাদের ভাষা ও চরিত্রে বাঙ্গালী মুসলিম প্রভাবের অনুপ্রবেশ আঁচ করা সম্ভব হবে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে আরাকানের রাজা সুলত ইঙ্গ চন্দ্র ৯৫৩ সালে জনৈক সামন্ত বা রাজশক্তির অধিকারী সুরতানের দখল ও প্রভাব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে চট্টগ্রামে অভিযান করেন। কুমিরা পর্যন্ত তার দখল সম্প্রসারিত এবং তথাকার কাউনিয়া ছড়া নামক স্থানে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপিত হয়। সুরতানের মূল শব্দ আরবী সুলতান হওয়াই সম্ভব, যার অর্থ রাজা। সুতরাং দেখা যায় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালে এতদাঞ্চলে রাজত্ব স্থাপনের মত মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করে ফেলেছে। আরাকান অঞ্চল তখনো মগ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে ইসলাম ও মুসলিম জনসংখ্যার অনুপ্রবেশ সেখানেও ঘটে গেছে। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে তা রাজনৈতিক শক্তির আকার ধারণ করে নিয়েছে। ইতোমধ্যে আরাকানের সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশ অঞ্চলে মাতামুহুরী উপত্যকার আলী কদমকে কেন্দ্র করে, জনৈক খোদা বখশ খাঁন সামন্তের নেতৃত্বে, বাংলার সুলতানী রাজত্ব সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। তখন বাংলায় সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকাল। সেই পরিবেশে ১৪০৬ খ্রী: সালে আরাকানের রাজা নর মিখলা সিংহাসনচ্যুত হোন। তিনি পালিয়ে গিয়ে গৌড়ের সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই নর মিখলা সুলতান জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ সাহেব সহায়তায় ১৪৩২ খ্রী: সালে স্বরাজ্য পুনর দখল করেন। তিনি পুনরায় সিংহাসনচ্যুত হওয়া থেকে বাঁচতে ও বর্মী আক্রমণের ভয়ে প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈনিক ও আমলাদের স্বরাজ্যে নিযুক্ত করেন। বিপুল সংখ্যক সাধারণ ভাগ্যান্বেষী বাঙ্গালীও তখন তাদের সঙ্গী হয় ও সর্বত্র অনুপ্রবেশ করে। এই বহিরাগতরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে আত্মীয়তার সুযোগ পায়। শুরু হয় মিশ্র প্রজন্মের। এই নব প্রজন্মের লোকজনের ভাষা ও আচার-আচরণে মাতৃপিতৃ উভয় দিকের চরিত্র সংক্রমিত হয়। পিতৃ-মাতৃ প্রভাবের অভাবে অনেক বিচ্ছিন্ন পরিবেশে কেউ কেউ ধর্মীয় ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তখন আরাকানের সমাজ ও রাজনীতিতে মুসলিম প্রভাব অপ্রতিরোধ্য ছিলো। রাজা নর মিখলা বাংলার সীমান্তের কাছাকাছি ম্রোহং অঞ্চলে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনিও তাঁর বংশধরেরা বিকল্প মুসলিম নাম ও খেতাবে ভূষিত হোন। মুদ্রায় ও ইসলামী কলিমা খোদাই করা হয়। ঐ মুসলিম প্রভাবিত ম্রাকু রাজ বংশের ৩৫২ বছরের দীর্ঘ রাজত্বকালকে অনেকে মুসলিম শাসন আমল বলেও অনুমান করে থাকেন। তখনই আরাকানে বাংলা সাহিত্য চর্চার সূত্র পাত হয়। আলাওলসহ অনেক বাংলা সাহিত্যসেবী আরাকানী রাজশক্তির সহায়তা লাভ করেন। তখনকার আরাকানী মিশ্র জনশক্তি সম্বন্ধে কবি আলাওলের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

নানা দেশী নানা লোক   শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ

আইসন্ত নৃপছায়াতলে
আরবী মিসরী শামী তুর্কী হাবশী রুমী
খোরাসানী উজবেকী সকলে
লাহোরী মুলতানী সিন্ধী কাশ্মীরী দক্ষিণী হিন্দী
কামরুপী আর বঙ্গদেশী
অহ পাই খোটান চারী কর্ণালী মলয়াবারী
আচি কুচি কর্ণাটকবাসী
বহু শেখ সৈয়দ জাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু লামা জাতি
আভাই বর্মা শ্যাম ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু ভাতি ভাতি।
সূত্র ঃ পদ্মাবতি পুঁথি

সম্ভবতঃ বিদেশীদের মাঝে সাধারণ বাঙ্গালীদের সংখ্যা সর্বাধিক ছিলো। তাই শেখ প্রজন্মদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রভাব পড়েছে বেশী। সেই সাথে আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী শব্দাবলীও স্থান করে নিয়েছে। পিতৃ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেমে মুক্ত ও পরিত্যক্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক শেখ প্রজন্ম, ইসলাম ধর্মীয় আচার-আচরণ ও মুসলিম সামাজিকতা থেকে মুক্ত অবস্থায়, নিজেরাই সেক নামীয় স্বাধীন স্বতন্ত্র সমাজে পর্যবসিত হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ মুসলিম থেক বৌদ্ধ উভয় সমাজের সাথে তাদের রক্তগত উত্তরাধিকার গড়ে ওঠে। ওরা কালক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। নিষ্ঠাবান মুসলিমেরা জেরবাদী ও মাতৃবংশের সাথে অধিক সম্পৃক্তরা বৌদ্ধে পরিণত হয়। তৃতীয় দলটি ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারায় যথেচ্ছাচারীর রূপ গ্রহণ করে। এখনো এ কারণে এই তিনের মাঝে অধর্মীয় সামাজিক একাত্মতা বিদ্যমান। ভাষা, আচার-আচারণে ওরা প্রতিরূপী মগ।

আরাকানে সেক সমাজের প্রভাব ১৭৮৪/৮৫ খ্রীঃ সালের বর্মী আক্রমণ ও দখলের দ্বারা প্রথম দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ম্রাকু রাজবংশের পতন ও স্থানীয় শাসনের অনুপস্থিতি, সেক তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা ও উদারপন্থী মগদের, স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করে। তারা নিজেদের প্রতি রক্তগত কারণে সহানুভুতিশীল বাঙ্গালীদের আবাস ক্ষেত্র দক্ষিণ চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে ও স্বদশভূমি উদ্ধারে ব্রতী হয়। তাদের ঐ স্বদেশভূমি উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টারই পরিণতি হলো : বার্মা ও বৃটিশ ভারতের পারস্পরিক উত্তেজনা ও ১৮২৪ খ্রীঃ সালের যুদ্ধ। তাতে ব্রিটিশ কর্তৃক বিজিত আরাকান ভারতের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়, যাকে মাত্র ১৯৩৬ খ্রীঃ সালে বার্মার নিকট ফেরৎ দেয়া হয়েছে।

চাকমাদের শেখ প্রজন্মে মিশ্রিত হওয়ার প্রমাণ হলো : তাদের মুসলিম নাম উপাদি ধারণ, আরবী বর্ণ ব্যবহার, ইসলাম ধর্মীয় পরিভাষা ও মুসলিম সামাজিক কথাধারার অভ্যাস এবং মোগলাই আড়ম্বর প্রীতি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালের এক

শতাব্দীকাল পর্যন্ত চাকমা অভিজাতেরা পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে অনেকে মুসলিম নাম ও খেতাবে ভূষিত হতেন। মোগলাই লেবাস ও সম্বোধনে তারা ছিলেন অভ্যস্ত। এর প্রমাণ হলো : একটানা দশজন চাকমা রাজা ও রাণীর মুসলিম নাম ও খেতাব গ্রহণ, ৯টি রাজকীয় সীলমোহরে আরবী বর্ণের দপ্তরী ব্যবহার, খান, দেওয়ান, তালুকদার, খিশা বিবি ইত্যাদি নাম ও পদবির সামন্তীয় পরিচিতি, খোদা, ওক্ত, দোজখ, সালাম ইত্যাদি ইসলাম ধর্মীয় পরিভাষার অবাধ চর্চা এবং রাজবংশে মোগলাই দরবারী লেবাস ও অনুষ্ঠানের প্রচলন।

প্রত্যেক মানব গোষ্ঠীতেই মূল ভাষা, আচার-আচরণ ও শিল্পজাত অনুকরণ বিদ্যমান পাওয়া যায়। গঠন সাদৃশ্য মানব পরিচিতি নির্ণয়ের আরেক সুত্র। ঠিক এভাবেই একদা সামঞ্জস্যের ধারা ও মূল পরিচিতি নির্ণীত হয়। ভারত থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত আর্য্য পরিচিতি, তাদের উজ্জ্বল রং, গঠনজাত তীক্ষ্ণতা ও ভাষাগত একাত্মতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভারতীয় আর্য্যরা জনক জননীকে বলে মাতা-পিতা, ইরানীরা বলে মাদর পিদর, ইংল্যান্ডবাসীরা বলে মাদার ফাদার। উচ্চারণে সামান্য ভিন্ন হলেও শাব্দিক মৌলিকত্বে প্রায় এক। চাকমা ভাষাও নামকরণে মুসলিম অনুকরণ অনুরূপ পরিচিতি নির্ণয়ের শক্তিশালী সুত্র। তাদের মঙ্গোলীয় দেহসৌষ্ঠব কার্যতঃ মাতৃ-পিতৃ পক্ষীয়। ক্ষেত্র বিশেষে তীক্ষ্ণ গঠনের অবয়ব সম্ভবতঃ এ দেশীয় সংমিশ্রনজাত উত্তরাধিকার। তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, চাকমারা সংকর সম্প্রদায়। তাদের মাঝে মুসলিম বাঙ্গালীর সংমিশ্রণই বেশী। যদ্দরুণ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের প্রধান অভ্যস্ত বিষয়। এই সূত্রে তাদের বাঙ্গালীত্ব কিছুটা যৌক্তিক। রং ও গঠনে মঙ্গোলীয়, ভাষা ও আচরণে বাংলা দেশী, এই বৈচিত্র্যের গুণে তাদের স্বাতন্ত্র্য গঠিত। তারা নিজেরা অন্যতম বাঙালী জনগোষ্ঠী বলে দাবী করলে, উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কেও আচরণে গ্রহণযোগ্যতার গুণ বাড়তো। ধর্মীয় আর সামাজিক পার্থক্য রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারতো না। এমনিতে বাঙালী সমাজে ধর্মীয় ও বর্নগত শ্রেণী বিভেদ বিদ্যমান। তবু সবাই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাঙ্গালী। এখানে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যজাত ভেদাভেদ অনুসরণীয় নয়। তবে চাকমাদের বৃহৎ ও শক্তিশালী বাঙ্গালী সমাজের অতলে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ই তাদেরকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সক্রিয় রেখেছে। কার্যতঃ তারা বাঙ্গালী চরিত্রসম্পন্ন অন্যতম মঙ্গোলীয় সম্প্রদায়। এরূপ বাঙ্গালী চরিত্রসম্পন্ন দ্বিতীয় মঙ্গোলীয় সম্প্রদায় হলো বড়ুয়ারা। অতীতে বাঙ্গালী হিন্দু মহাজনদের অপ্রিয় শোষণ, শাসন ও শঠতাই উভয়ের মাঝে তিক্ততা সৃষ্টির প্রধান কারণ বলে ধরে নেয়া যায়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে ব্যবহারিক উদারতা অনুসৃত হলে এবং উভয় দিক থেকে মিশ্র বসবাসকে উৎসাহিত করা গেলে, পরিবেশের উন্নতি ঘটতে পারতো। মিশ্র বসবাসের অর্থ পারস্পরিক সৌহার্দ্যময় নৈকট্য ও সহাবস্থান, হারিয়ে দেওয়া বা গ্রাস করার প্রতিযোগিতা নয়। দুঃখজনকভাবে উপরোক্তরূপ কিছু বিরূপ আচরণেই চাকমাসহ উপজাতিরা বিদ্বিষ্ট। তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস ও আরেকটি প্রধান অশান্তির কারণ।

৯। টিপরা ত্রিপুরা ও পাটিকারা।

ত্রিপুরা সমাজের পন্ডিতেরা নিজেদের বৃহৎ বড়ো জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকই মনে করেন, যারা অনেক আসামী, বর্মী ও থাইল্যান্ডবাসীর পুর্ব পুরুষ। তবে প্রতিবেশী বাঙ্গালীদের কাছে তারা টিপরা নামেই পরিচিত। আসলে ত্রিপুরা লোক অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলই ত্রিপুরা রাজ্য। এই ত্রিপুরা বা টিপরা নামের শব্দ মূল এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট নয়। আমার মনে হয় এটা প্রাচীন পাটিকারা নামেরই অপভ্রংশ। বহুল ব্যবহার ও প্রাচীনত্বের কারণে তা সংক্ষিপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে টিকারা, টিপারা ও ত্রিপুরায় পরিণত হয়েছে। মূল পাটিকারা অঞ্চল ও তার নিকটবর্তী এলাকা, প্রাচীনকাল থেকেই পাটি উৎপাদক অঞ্চল। মূর্তা বেত থেকে প্রস্তুত এই মাদুর শিল্পের কদর অদ্যাবধি থাকলেও অতীতে তার কদর ছিলো আজকালের কার্পেটের সমান। বস্তুতঃ এটা অদ্যাবধি গরীবের কার্পেটই বটে। সংশ্লিষ্ট এলাকার অবাঙ্গালী সমাজের উচ্চারণে অনেক বাংলা শব্দ আকারযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, যথা : মুক্তাগাছা, আম গাছা ইত্যাদি পাটি শিল্পী অর্থ জ্ঞাপক পাটিকার শব্দটির এভাবে অবাঙ্গালী ব্যবহারে পাটিকারায় পরিণত হওয়া সম্ভব।

অতীতে এককালে বর্তমান ত্রিপুরা থেকে শুরু করে আরাকান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পাটিকারা নামে একটি রাজ্য ছিলো বলে প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়। তারই স্মারক নাম হিসাবে কুমিল্লার একটি পরগনা পাটিকারা নামে অদ্যাবধি অভিহিত হয়। একদা ঐ পাটিকারা রাজ্য আরাকানীদের দ্বারা অধিকৃত এবং তৎপর ১০৫৯ খ্রী: সালে বার্মার অন্যতম রাজ্য পঁগার দ্বারা বিজিত হয়। এই সুত্রে ত্রিপুরা দখলাধীন দক্ষিণ সিলেটবাসীদের পগাঁ আখ্যাটি, বাঙ্গালীদের বহুল কথিত মগ, হার্মাদ, বর্গী আর চাকমাদের মগধা সম্বোধনের সমগোত্রীয়। বাঙ্গালীদের কাছে লুটেরা আরাকনীরা মগ, অত্যাচারী পর্তুগীজরা হার্মাদ এবং নৃশংস মারাঠীরা বর্গী। পঁগা আর মগধা আখ্যা দুটিও সমঅর্থবোধক হবে।

প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যটি অতীতের অধিকাংশ সময় স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিলো। সাময়িক আরাকান ও পঁগা শক্তির দ্বারা বিজিত হলেও সে বারবারই নিজ স্বাধীনতা পুনরোদ্ধারে সমর্থ হয়। পরবর্তীকালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে ঠেকাতে না পারলেও সে অন্যতম দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লাভ ও ইউনিয়ন গঠনের পরবর্তীতেও একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে। অতীতে অনেক সময় ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তরে সিলেটের কুশিয়ারা নদী ও পশ্চিমে মেঘনা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। দক্ষিণে আরাকান অথবা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল এবং পুর্বে লুসাই ও সন্নিহিত বর্মী অঞ্চলই ছিলো তার সীমান্ত। তবে উত্তর ও পশ্চিমের সীমান্ত মোগল ও পাঠান শাসনামলে সঙ্কুচিত হওয়া শুরু করে, বৃটিশ আমলে তা স্থায়ী রূপ নেয়। দক্ষিণ ও পূর্বের সীমান্ত দুটি ও বৃটিশ আমলেই সুনির্দিষ্ট হয়েছে।

১০। মগ মারমা রোয়াঙ্গ্যা ও রাখাইন

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে আরাকানী ও বর্মী জনগণ মগ নামে অভিহিত। এই নাম বা বিশেষণটি সুনাম দুর্নাম উভয় চরিত্রেই মন্ডিত। মগ শব্দের অর্থ দস্যু হওয়ার ধারণা আসলে কৃত্রিম। কিন্তু এই অর্থের বহুল প্রচারের প্রতিক্রিয়ায় আজকাল বর্মী ও আরাকানী বংশোদ্ভুতরা এ নামে পরিচিত হতে কুণ্ঠিত। তারা তৎপরিবর্তে অধুনা মারমা নামে অভিহিত হচ্ছেন। যদিও মারমা আর মগ দুই ভিন্ন সম্প্রদায়। আদতে মারমারা বর্মী বংশোদ্ভুত আর মগেরা আরাকানী। নিকট অতীতের পাকিস্তান আমলেও মারমা নাম বা বিশেষণ অল্পই ব্যবহৃত হতো। ১৯৬৪ সালে বোমাং চীফ প্রয়াত মংশোয়ে প্রু চৌধুরী বান্দরবন মহকুমা প্রশাসকের নিকট এক চিঠির মাধ্যমে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে, মগ নয়, মারমা নামই তাদের কাছে অভিপ্রেত। সে থেকেই মারমা নামের প্রচলন শুরু।

আরাকানের নিজের বা নিকটবর্তী প্রতিবেশী কোন অঞ্চলের ভাষায়ই মগ শব্দের অর্থ দস্যু নয়। এই অর্থে শব্দটি আরাকানী, বাংলা, আসামী, বর্মী, মালয়ী বা এসবের আওতাধীন কোন অঞ্চলের কোন ভাষা বা উপভাষারই ব্যবহৃত শব্দ নয়। অপর কোন বিদেশী বিজাতীয় ভাষায় অনুরূপ কোন শব্দের প্রচলন থাকা অসম্ভব না হলেও নৈকট্যের অভাবে, তদ্দারা বর্মী বা আরাকানী জনগণের বহুলভাবে মগ অভিহিত হওয়া সম্ভব নয়। নিকটবর্তী প্রতিবেশী অথবা নিজেদের দ্বারাই অনুরূপ নামকরণ সম্ভব। সুতরাং দূরবর্তী কারো দ্বারা অথবা তাদের ভাষায় প্রচলিত শব্দে, মগ নাম প্রচলন, যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা নয়। ঐতিহ্যগতভাবে মগ নামটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। এই সমাজের কিছু লোকের সাময়িক দুরাচারের দ্বারা একদা তার চরিত্রহানি ঘটেছে। মগ আদতে একদল সম্ভ্রান্ত আরাকানীর নাম, তার সাথে ডাকাত লুটেরা ও অত্যাচারী একদল আরাকানীর পরিচয়ও যুক্ত। তাই এই নামটি কলংকিত বলে সম্ভ্রান্ত লোকদের দ্বারা পরিত্যক্ত। বোমাং প্রধানের বর্ণিত চিঠিখানাই তৎপরিবর্তে মারমা নাম প্রচলনের সুত্র।

ইতিহাস পাঠের দ্বারা জানা যায়, প্রাচীনকালে উত্তর আরাকানের লেম্রু নদীর তীরে ম্রাক-উ নামের একটি সম্ভ্রান্ত বসতি ছিলো। ১৪৩২ খ্রীঃ সালে রাজা নর মিখলা, ঐ ম্রাক-উকে কেন্দ্র করে, সমস্ত উত্তর আরাকান জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ম্রোহং নামীয় একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৪-৮৫ খ্রী: সালে বর্মীদের দ্বারা আরাকান অধিকৃত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত, ৩৫২ বছরকাল ঐ ম্রোহং রাজ্য শাসনকারী রাজারা পারিবারিকভাবে ম্রাক-উ রাজবংশ নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ ম্রাক-উ নামেরই ক্রমিক বিবর্তিত রূপ ম্রাকু, ম্রাগু ও পরিশেষে মগ, অথবা এটি মং বা মাং পদবির অপভ্রংশ। অধিকন্তু এ নামটির কৌলিন্য আর তার প্রাচীনত্বের স্মারক হয়ে আছে মঘী ও মঘা নামীয় পঞ্জিকা ও চিকিৎসা শাস্ত্র। কথিত আছে, পোপা স্বরাহন নামীয় জনৈক মঘী রাজা ৬৩৮-৩৯ খ্রী: সালে ঐ সনটি চালু করেন এবং ঐ চিকিৎসা শাস্ত্রটিও এমনি প্রাচীন। সুতরাং মগ বা মঘ নাম একটি গৌরবজনক প্রাচীন

উত্তরাধিকার। কোন ক্ষুদ্র কলঙ্ক কালিমার দ্বারা তা কোনভাবেই পরিত্যজ্য নয়। আরাকানী ও বর্মী বংশোদ্ভূতদের নাম পরিচয় ছাড়াও তা সভ্যতার অঙ্গিভূত এক গৌরবজনক শাস্ত্রীয় ও সংখ্যাতাত্ত্বিক নাম। এটা নিষ্কলঙ্ক অম্লান পরিচিতি।

দুটি কারণে এ নামটি কলুষিত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জলদস্যু পর্তুগীজদের প্ররোচনায়, সমুদ্র উপকুলবাসী কিছু দুষ্ট প্রকৃতির আরাকানী, বাংলার উপকূল অঞ্চলে, ডাকাতি ও লুটতরাজ চালাতো। উপদ্রুত বাঙ্গালীরা সেই অত্যাচারী পর্তুগীজদের ঘৃণা করে বলতো হার্মাদ, আর আরাকানীদের মগ। অনুরূপভাবে রাজ্য বিস্তার অভিযানে নিয়োজিত আরাকানী সৈনিকরা, বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে নৃশংস অত্যাচারে মেতে উঠতো। তাই তখনকার উপদ্রুত সাধারণ বাঙ্গালীদের কাছে মগ হয়ে দাঁড়ায় অত্যাচারীর বিকল্প নাম। বর্তমানে অত্যাচারী ও লুটেরা অর্থে কেউ মগ নামের ব্যবহার করে না। তবে শব্দটির সাথে ঐতিহ্যগত কিছু ঘৃণার ভাব অদ্যাপি বিদ্যমান। তবু অতীতে নির্দ্বিধায় মগ নাম ব্যবহৃত হওয়ায় এবং তার সাথে এক গৌরবজনক ঐতিহ্য জড়িত থাকায়, এ নামটির ব্যবহারে বর্তমানেও কুণ্ঠাবোধ থাকা উচিত নয়। ভাষা সংস্কার সংস্কৃতি আর লোকাচারে ও মারমা আর আরাকানী মগদের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। চট্টগ্রামী অধিবাসীদের কাছে উত্তর আরাকানবাসী মুলিমদের বিকল্প নাম রোয়াঙ্গ্যা এবং কক্সবাজারবাসী আরাকানী ও বর্মী বংশোদ্ভুতরা রাখাইন অভিহিত।
ম্রোহং শব্দেরই অপভ্রংশ রোসাং এবং আরাকানী শব্দের অপভ্রংশ রাখাইন। কথিত আছে, মগধের কিছু লোক প্রাচীনকালে আরাকানে স্থানান্তর গ্রহণ করে তথায় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তারাই কালক্রমে মগ নামে অভিহিত। চাকমারাও সেই মগধ তাড়িত ভিন্ন একটি দল। এই অর্থে মগধ নাম মগ নামের তৃতীয় মূল সূত্র।

১১। লোক বিভাগ।

ন্যাত্ত্বিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সমুদয় পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী লোকদের নিম্নোক্ত সমাজ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত পাওয়া যায়, যথা ঃ

ক) মঙ্গোলীয় সমাজ	১। চাকমা সমষ্টি	১। চাকমা
		২। চাক বা সেক বা থেক
		৩। দৈংনাক
		৪। টুংটুংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যা
	২। কুকি সমষ্টি	১। কুকি,
		২। লুসাই (মিজো এর অন্তর্ভুক্ত)
		৩। পাংখো
		৪। বনযুগী (বোম-এর অন্তর্ভুক্ত)
	৩। ত্রিপুরা সমষ্টি-	১। টিপরা
		২। রিয়াং

৩। উসুই

৪। বর্মী আরাকানী সমষ্টি- ১। মগ,
২। মারমা,
৩। রোহিঙ্গ্যা,
৪। রাখাইন,

৫। বর্মী আরাকানী আদিবাসী, ১। খুমি,
২। খিয়াং,
৩। সেন্দু
৪। মুরুং (ম্রু-এর অন্তর্ভুক্ত)

৬। মিশ্র পাহাড়ী ১। নেপালী
২। ভুটানী
৩। আসামী

(খ) ভারতীয় আদিবাসী সমাজ ৭। সাওতাল ইত্যাদি ১। সাওতাল
২। গারো
৩। কুচ রাজবংশী ইত্যাদি

(গ) বাঙ্গালী সমাজ ৮। বাংগালী ১। হিন্দু,
২। মুসলমান,
৩। বড়ুয়া,
৪। এংলো ইন্ডিয়ান বা ফেরেঙ্গী নামীয় খৃষ্টান।

উপরোক্ত হিসাবে মোট তিনটি সমাজ আটটি সমষ্টি আর তিরিশটি সম্প্রদায় নিয়ে, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমন্ডলী গঠিত। এতদিনকার বিকৃত জন বিভাগ অনুযায়ী অবাঙ্গালীদের দশ থেকে তেরটি সম্প্রদায় হওয়ার বিবরণটি সঠিক নয়। উপরোক্ত হিসাবে তারা ৭টি সমষ্টিও ২৬টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

অধ্যায় (গ) কৌলিন্য গাথা

১। রাজা ভুবন মোহন রায় লিখিত চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাস
(ক) অনেকদিন পুর্বে হিমালয়ের পাদদেশে 'শাক্য' নামে এক রাজা বাস করতেন, কল্প নগর নামক স্থানে তার রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেখানে তিনি ঈশ্বরের মূর্তি তৈরি করে তার আরাধনাতেই নিজেকে মগ্ন রাখতেন। সানকুশি নামীয় 'মন্ত্রীরন্ব জন্ম ও এই পরিবারে। তিনি দুষ্টের দমন নীতিতে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন করতেন। সুধন্য নামে শাক্য রাজার এক সাহসী পুত্র ছিলেন। তিনি ক্ষত্রীয় বীরদের মত শত্রুদের দমন করতেন। রাজা শুধন্য সেনাপতি জয়ধনকে সঙ্গে করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। রাজা সুধন্যের দুই রাণী ও তিন পুত্র ছিল। প্রথম রাণীর পুত্র 'গুন ধন' রাজকীয় আনন্দ পরিত্যাগ করে মোহমুক্তির জন্য কঠোর তপস্বীর জীবন-যাপন করতেন। কনিষ্ঠ রাণীর 'আনন্দ-মোহন' ও 'লাঙ্গলধন' নামে দুই পুত্র ছিলেন। আনন্দমোহন সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হলুদ বস্ত্র পরিধান করে নেন।
দ্বিতীয় পুত্র 'লাঙ্গলধন' রাজা হয়ে প্রজাদের শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

লাঙ্গলধনের পুত্র 'সুদ্রজিৎক্ষ কয়েক বছর রাজ্য শাসন করলেন। সেনাপতি জয়ধনের পুত্র 'সুবল' এবং সুবলের পুত্র 'শ্যামল' পর পর তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। সুদ্রজিতের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে 'সমুদ্রতিজ' রাজা হলেন। মন্ত্রী শ্যামলের সাহায্যে তিনি কয়েক বছর রাজ্য শাসন করলেন। ২০ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়ে রঙ্গীন বস্ত্র পরে বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যেরও অবসান ঘটলো। মন্ত্রী শ্যামল কল্প নগর পরিত্যাগ করে হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব ঢালে একটা নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করলেন। তার নতুন রাজধানী নানা রকমের ফুলের বাগান, পুকুর ও মন্দির দিয়ে সাজান হল।
চম্পাকলি নামে তার এক পুত্র ছিলেন। ইরাবতী নদীর পূর্বপারে তিনি একটা নতুন নগর গড়ে তুললেন এবং তাঁর নাম অনুসারে এর নাম রাখা হল চম্পকনগর। তিনি ইরাবতী নদীর তীরে একটা মন্দির নির্মাণ করে ঈশ্বরের মূর্তি স্থাপন করলেন। চম্পাকলির পুত্র সাধনগিরি খুব ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি পুরাপুরি যোগসাধনের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ব্রহ্মযোগের সাহায্যে স্বর্গীয় জ্ঞানের আগুনে তিনি অজ্ঞানতার আঁধার এই পাপপুর্ণ দেহ পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে মোহমুক্তি লাভ করেছিলেন।

তাঁর পুত্র চেঙ্গিয়াসুর রাজা হলেন এবং ইটের মন্দির তৈরী করে ভগবানের মূর্তি

প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেশের লোক এবং রাজা একই গোত্রের তাই তারা রাজার প্রতিষ্ঠিত মূর্তির পূজা করতে লাগলো। চেঙ্গিয়া-সুরের দুই পুত্র ছিলেন ধর্মসুর ও চান্দাসুর। চেঙ্গিয়াসুর খুব ধার্মিক ছিলেন এবং অনেক ভাল কাজ করে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসন ছেড়ে রঙ্গীন বস্ত্র পরে ধার্মিক জীবন-যাপন করতে লাগলেন, আর দ্বিতীয় পুত্র চান্দাসুর রাজা হয়ে দুষ্টের দমন নীতিতে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। মহারাজ চান্দাসুরের তিন পুত্র ছিলেন সুমেসুর, দেবাসুর ও বিশ্বাসুর।

জ্যেষ্ঠপুত্র সুমেসুর রাজা হলেন। তাঁর পুত্র ভিমঞ্জয়। ভিমঞ্জয় বড় বীর ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি শিকারে বের হয়ে একা একা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতেন। সিংহ, গণ্ডার, মহিষ ও বাইসন ধরা ছিলো তার শিকার। একদিন কিছু সৈন্য নিয়ে শিকার করতে করতে হিমালয় পর্বতের পূর্ব ঢালে অবস্থিত গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। হরিণ শিকারের আগ্রহে ঘুরতে ঘুরতে একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। এর উপর একটি সোনার মন্দির দেখতে পেয়ে মহারাজ তাঁর সৈন্যদের বললেন, 'চলো আমরা এই মন্দিরের দরজা খুলি এবং দেখি কার মূর্তি এর মধ্যে স্থাপন করা আছে'। দরজা খোলার পর দেখতে পেলেন সেখানে বুদ্ধের মুর্তি স্থাপন করা আছে। এর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের মত ও মুর্তির সামনে একখণ্ড পাথরের উপর বুদ্ধের কিছু বাণী ক্ষোদিত আছে। রাজা সেই সব ধর্মানুশাসন নকল করে নিলেন এবং এই মূল্যবান বাণী নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। 'সম্বুদ্ধ' রাজা ভিমঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন।

রাজা সম্বুদ্ধের বিজয়গিরি ও উদয়গিরি নামে দুই পুত্র ছিলেন। বিজয়গিরি চম্পকনগর পরিত্যাগ করে নদী পথে ছয় দিন ও ছয় রাত্রি চলার পর কোন এক স্থানে এসে নামলেন। তার সঙ্গে চারজন পণ্ডিত ও ৭ 'চামুস' (প্রায় ২৬ হাজার) সৈন্য ছিল। বিজয়গিরি নিজের সাথে এক দল সৈন্য রেখে 'তেওয়া' নদীর তীরে 'কালাবাঘা' নামক স্থানে থেকে গেলেন। অবশিস্ট সৈন্যে সঙ্গে দিয়ে সেনাপতিকে সম্মুখ-যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর আমরা বিজয়গিরির আর কোন সংবাদ জানি না। তাঁর সেনাপতি 'ইনডাং' বা 'ক্রিনডাং' পাহাড়ে ও 'টেকনাফে' যুদ্ধ করেছিলেন। অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে সেনাপতি যুদ্ধে জয়ী হয়ে বিজয়গিরিকে সংবাদ দিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে বিজয়গিরি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করেন এবং বিজিত রাজ্য শাসন করার ব্যবস্থা নেন। এরপর সেনাপতি তার জন্মভূমিতে ফিরে গেলেন। পরবর্তী কালে বিজয় গিরিও দেশে ফিরছিলেন, কিন্তু কালাবাঘা অঞ্চলে পৌঁছেই শুনতে পান যে তার পিতা মারা গেছেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়গিরি অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করে বসেছেন। এই সংবাদ পেয়ে তিনি দেশে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার বিজিত রাজ্যে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি একজন 'আরি' মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তবে রাজা বিজয়গিরির কোন বংশধর ছিল না।

বার্মার ইতিহাস 'চুইজাং' 'কিয়াথা'-তে বর্ণিত আছে যে, বার্মা সাম্রাজ্য তিনটি দেশে

বিভক্ত ছিল এবং তার একটি চাকমা রাজার অধীন ছিল।

যে সব চাকমাকে সম্মুখ যুদ্ধে পাঠান হয়েছিল শ্বেতহস্তি তাদের একজনকে মাথায় তুলে নিয়ে এলো এবং তাকেই রাজ-সিংহাসনে বসান হল। এই রাজার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর মেয়ের নাম ছিল 'মানিকবি'। তাঁর স্বামী বাঙ্গালীদের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি মগদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছেন এ জন্য তাঁকে বলা হত 'বাঙ্গালী সর্দার'। এই সব যুদ্ধ ১১১৮ ও ১১১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রোয়াং (আরাকান)-এ হয়েছিল। (আরাকানের ইতিহাস দান্যা ওয়াদি আরেদ ফুং-এর ১৭ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা দ্রবষ্ট।) মানিকবির পুত্র 'মানিকগিরি' মানিক (মুক্তা) পেয়ে রাজা হলেন। তাঁর পুত্র 'মাদালিয়া' তারপর রাজা হলেন। তারপর 'মাদালিয়ার' পুত্র 'রামাথংজা' রাজা হলেন। রামাথংজার পুত্র 'কামালচেগা'। তাঁর রাজত্বের সময়ই রোয়াং-এ যুদ্ধ হয়েছিলে এবং চাকমারা সে সময় ঐ দেশ থেকে দেশান্তরিত হয়ে যায়।

কামালচেগার পুত্র রতনগিরি তারপর সিংহাসনে বসেন। তাঁর পুত্র 'কালাথংজা' তারপর রাজা হন। তারপর তাঁর পুত্র 'সেরমত্যা রাজাহন। তাঁর রাজত্বের সময় নামকরা সেনাপতি 'রাধা মোহনের' নেতৃত্বে চাকমারা রোয়াং-এ যুদ্ধ করেন। ঐ সময় চার্টিগাং ছাড়া কবিতা রচিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অরুণ যুগ রাজা হন। মগদের সঙ্গে তাঁর বহুবার যুদ্ধ হয়েছিল। অরুণ যুগের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। আরাকানের ইতিহাস ডেঙ্গা ওয়াদি আরোদফুং -এ বর্ণিত আছে যে, ১৩৩৩-১৩৩৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বার্মার রাজা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বিজ্ঞোচিত মনে না করে বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছায় তাঁর উজিরকে চাকমারাজ অরুণ যুগের নিকট পাঠান। দুত গিয়ে জানান যে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁকে পাঠান হয়েছে এবং বর্মার রাজা চাকমা রাজাকে উপহার রূপে একজন মহিলা সঙ্গে পাঠিয়েছেন। অরুন যুগ যখন সেই মেয়েকে নিয়ে রাজধানী 'মইসাগিরিতে' আনন্দ করছিলেন (মেয়েটিকে বর্মা রাজার বোন বলে পরিচয় দেয়া হয়েছিল), হঠাৎ রাত ১২টার সময় তিনি উজির কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বন্দী হন। তাঁর ছেলে-মেয়েদেরকেও বন্দী করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ছেলেকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তৃতীয় ছেলেকে সামুদ্রিক বণিকদের নিকট থেকে আবগারী শুল্কের 'আদায়কারী' নিযুক্ত করা হয়। সে জন্য তাকে ঘট্যা বা 'ঘাওটিয়া রাজা' (খাজনা আদায়কারী রাজা) বলা হতো। মগ রাজা জ্যেষ্ঠ রাজকুমারী 'সোনাবিকে' বিয়ে করেন। কনিষ্ঠাকে পারিষদদের একজনের সঙ্গে বিয়ে দেন। বসবাস করার জন্য দুই রাজকুমারীকে দুইটি দেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁদের নাম অনুসারে দেশ দুইটির নাম হলো 'সোনাপুর ক্স ও 'মানিকপুর'। ঘাট্যা রাজার নাম ছিল 'চান্দুথংজা'। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মইসাং রাজা হলেন। এই মইসাং কর দিতে না পেরে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে গেলেন। সে জন্যই তাঁকে মইসাং (বৌদ্ধ ভিক্ষু) রাজা বলা হতো। তাঁর সময়েই চাকমাদের উপর মগেরা খুব অত্যাচার করতো, এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা গোপনে ঠিক করলো এই দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। এই রাজা সম্বন্ধে একটা শ্লোক আছে যার অর্থ মইসাং রাজা আমাদের সঙ্গে

আসলেও আমাদের কোন আনন্দের কারণ নাই এবং না আসলেও কোন দুঃখ নাই।'

মইসাং রাজার পুত্রের নাম ছিল 'মারিকিয়া'। মারিকিয়ার রাজত্বকালেই চাকমারা রোয়াং ছেড়ে এসে কদমতলীতে বসবাস করতে থাকে। এই জন্যই 'মারিকিয়ার' পুত্রকে এই স্থানের নাম অনুসারে কদমথংজা বলে ডাকা হতো।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র 'রদংছা' রাজা হলেন। তারপর তাঁর পুত্র 'তিন সুরেশ্বরী' রাজা হলেন। 'জানু' তিন সুরেশ্বরীর পুত্র ছিলেন। তাঁর সেনাপতি রণ-পাগলা (যুদ্ধ পাগল) মগদের সঙ্গে তৈন ছড়ায় বহুবার যুদ্ধ করেছেন। জানু রাজার এক মেয়ের স্বামীর নাম ছিল 'বুড়া (বৃদ্ধ) বড় য়া। জানু ১২০ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। রাজার প্রথম মেয়ে 'সাজেম বি'র মগ রাজার সঙ্গে এবং দ্বিতীয় মেয়ে 'রাজেম বিম্বর বুড়া বড় য়ার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো।
বুড়া বড় য়ার ছেলে 'সাথুয়া' রাজা হলেন। তিনি পাগলা রাজা বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন এবং যোগ সাধনা অবলম্বন করতেন। কথিত আছে যে, তিনি তার হৃৎপিণ্ড ও নাড়ি ভুঁড়ি মন্ত্রবলে টেনে বের করে ধুয়ে আবার সেগুলিকে যথাস্থানে রেখে দিতে পারতেন। কোন এক সময় তিনি যখন তার হৃৎপিণ্ড ও নাড়ি ভূঁড়ি বের করে ধুচ্ছিলেন তখন রাণী উঁকি মেরে দেখে ফেলেন। যার ফলে তিনি আর তাঁর হৃৎপিণ্ড ও নাড়িভুঁড়ি যথাস্থানে রাখতে পারলেন না। এর ফলে তিনি সত্যিকারের পাগল হয়ে গেলেন। তারপর রাণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি মানুষ মারতে শুরু করলেন। একটা প্রবাদ আছে যে কোন এক সময় পাগলা রাজা বাইরের ঘরে বসে থাকা অবস্থায় পুর্ব পরিকল্পনা অনুসারে একটা লোক বন্য হাতী এসেছে বলে চীৎকার করতে থাকে, রাজা হাতিটি দেখার জন্য গলা বাড়ালে একজন লোক পিছন দিক থেকে এসে এক আঘাতে তাঁর মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তার দুই পুত্র 'চানান খাঁ' ও 'রতন খাঁ' কেও হত্যা করা হয়।

পাগলা রাজার মৃত্যুর পর রাণী নিজ হাতে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। খুনী মেয়ে বলে তাঁর বদনাম হলো। পাগলা রাজার অমঙ্গলী নামের এক কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল 'মুলিমাথংজা'। একটা বাঁশের সিংহাসন তৈরি করে, ' তৈন ছড়ি' নদীর মুখে স্থাপন করা হল। ধুর্য্যা কুর্য্যা ধাবানা ও পিড়াভাঙ্গা এই চারজন মন্ত্রীর মধ্যে ধাবানা খুব ভোরে উঠে ঐ সিংহাসন দখলকরে রাজা হলেন, আর একটা কারণ হলো যে, তিনি শেষ রাজার কন্যার পুত্র ছিলেন। অমঙ্গলীর আরও একজন পুত্র ছিলেন-তাঁর নাম ছিল পিড়াভাঙ্গা।

ধাবানার পুত্র 'ধারা মিয়া' তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হলেন। তারপর ধারা মিয়ার পুত্র মগল্যা রাজা হলেন। 'জুবাল খাঁ' ও 'ফতেহ খাঁ' নামে তাঁর দুই পুত্র ছিলেন। মগদের সঙ্গে জুবাল খাঁর অনেক যুদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর সেনাপতি কালু খাঁ সর্দার মুসলমান নবাবদের সঙ্গে অনেক বড় বড় যুদ্ধ করেছেন। ঐ সব যুদ্ধে দুইটি বড় কামান দখল

করা হয় এবং সেনাপতি ও রাজার ভাইয়ের নাম অনুসারে যথাক্রমে সেগুলোর নাম রাখা হয় কালু খাঁ ও ফতেহ খাঁ। জুবাল খাঁ অল্প বয়সে মারা যান এবং রাজ্য শাসনের জন্য তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

জুবাল খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তাঁর ভাই ফতেহ খাঁ রাজা হন। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে ফতেহ খাঁ নবাবদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ফররুখ শাহ ও মোহাম্মদ শাহ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নিম্নভূমির বেপারীদের সঙ্গে ১১ মণ তুলার বিনিময়ে জুম-চাষীদের সঙ্গে ব্যবসা করতে দিলেন।
ফতেহ খাঁর তিন পুত্র শেরমস্ত খাঁ, রহমত খাঁ ও শেরজান খাঁ। জ্যেষ্ঠপুত্র শেরমস্ত খাঁ ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে রাজা হলেন। তার সময়ই চট্টগামের শাসনকর্তা 'মিঃ হেনরী ভেরেলিষ্ট' নিজামপুর (ঢাকা) রাস্তা, কুকি রাজ্য, ফেনী ও সাঙ্গু দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমি চাকমা রাজার রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। (মিঃ হাসিনসন-এর গেজেটিয়ার থেকে)।
শেরমস্ত খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন তাই শুকদেবকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে যখন শুকদেব রাজা হলেন তখন তিনি এক বিরাট ভুখন্ড বসবাসের উপযোগী করেছিলেন যা এখন 'তরফ শুকদেব' নামে পরিচিত। তিনিও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।
রাজা ফতেহ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র রহমত খাঁর এক পুত্র ছিল। তাঁর নাম 'শের দৌলত খাঁ'। শুকদেবের মৃত্যুর পর শের দৌলত খাঁ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। শের দৌলত খাঁর রাজত্বে ইংরেজ ও চাকমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। মিঃ লেন ও মিঃ তুরমারস দুই বার আক্রমণ করে অকৃতকার্য হয়েছিলেন (মিঃ কটনের রেভিনিউ হিস্ট্রি দ্রষ্টব্য)।
জান বক্স খাঁ শের দৌলত খাঁর পুত্র। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে জান বক্স খাঁ রাজা হন।

১৭৮৩, ১৭৮৪ ও ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে জান বক্সের যুদ্ধ হয়। তাঁর সেনাপতি ও ভগ্নিপতি রনু খাঁ দেওয়ানকে ইছামতির মুখে, সেনাপতি জানু দেওয়ানকে ধুরুং-এ এবং নারান দেওয়ানকে হাজারীবাগে রাখা হয়েছিল। জান বক্স খাঁ নিজে 'মহাফ্রুং'-এর পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিলেন। সেই সময় একজন গর্ভবর্তী নারী পালিয়ে যাবার সময় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিল। রাজা হঠাৎ সেই কথা শুনে ফেলে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা গিয়ে বড় লাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ৫০০ মণ তুলা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে ঘোষাল পরিবারের নামকরা জমিদার সেই সময় রাজাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। জান বক্স খাঁর তিন পুত্র ছিলেন তব্বার খাঁ, জব্বার খাঁ ও দুলা।
জান বক্স খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তব্বার খাঁ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি রাজানগরে একটি 'সাগর' (বিরাট দীঘি) খনন করেন। তব্বার খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জব্বার খাঁ ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে রাজা হন।
তাঁর মৃত্যুর পর তৎ পুত্র 'ধরম বক্স খাঁ' ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজাহন। রাজা চট্টগ্রামের ভট্টাচার্য পরিবারের (পুরোহিত শ্রেণী) নিকট থেকে হিন্দু মন্ত্র গ্রহণ করে 'মহারাজ

ভট্টাচার্য' নাম গ্রহণ করেন। ধরম বক্স খাঁর তিন রাণী ছিল 'কালিন্দি' রাণী, 'আতক' ও হারি' রাণী। হারির এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম 'মেনকা (চিকনবি)। গোপনীথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মেনকার প্রথম পুত্র হরিশচন্দ্র।

মহারাজ ধরম বক্স খানের মৃত্যুর পর সরকার মুলিমা গোত্রের সুখলাল দেওয়ানকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেণ। তাঁর ব্যবস্থাপনায় সন্তোষজনক কোন ফল না হওয়ায় কালিন্দি রাণী নিজের হাতে জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ের ভার নেন। ব্রিটিশ সরকারের বার বার চাপ দেওয়া সত্বেও হরিশচন্দ্র সাবালক হয়েও কালিন্দি রাণীর নিকট থেকে জমিদারীর দায়িত্ব বুঝে নেন নাই। রাণীর প্রতি অগাধ ভক্তিই এই দায়িত্ব না নেওয়ার কারণ। কালিন্দি রাণী যোগ্য ও সুশাসনের দ্বারা জমিদারী সম্প্রসারিত করেছিলেন। তিনি মহামুণি মন্দির নির্মাণ, বাৎসরিক মহা-মুণির মেলার সুত্রপাত, মহামুণি দীঘি খনন এবং অন্যান্য ধর্মীয় কাজ করে অমর হয়ে আছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যেসব সিপাহী শাস্তির ভয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিল তিনি তাদেরকে ধরে সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। ১৮৭১-১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'লুসাই' অভিযানের সময় রাণী তার পৌত্র হরিশচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্র রাষ্ট্রের প্রতি খুব অনুগত ছিলেন এবং খুব মূল্যবান সাহায্য করেছিলেন, যার ফলে তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়, এবং একটি সোনার ঘড়ি ও চেন দেওয়া হয়, যার মূল্য ১০০ পাউন্ড। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে হরিশচন্দ্র 'কালিন্দি রাণীর মৃত্যুর পর রাজা হন। সরকার তাঁকে রাজানগর ছেড়ে রাঙ্গামাটিতে প্রজাদের সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য করেন। রাজার দুই রাণীর দুই পুত্র ছিল। ভুবন মোহন বড় রাণীর, রমনী মোহন ছোট রাণীর পুত্র। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে হরিশচন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর জমিদারী ও চাকমা ভুখন্ড 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস' নিয়ে নেয়, কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার ভুবন মোহন নাবালক ছিলেন। 'রায় বাহাদুর কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান' চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের চাকমাদের দৃঢ় হস্তে শাসন করে সুনাম অর্জন করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে কুমার ভুবন মোহন রায় সাবালক হয়ে রাজা হন। বাংলার মহামান্য গভর্ণর স্যার উডবার্ন তাঁকে নিম্নোক্তরূপে অভিনন্দিত করেনঃ

(খ) গভর্নরের অভিষেক ভাষণ ঃ

আপনি 'চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা গোত্রের প্রধান হয়ে এমন এক পদবী লাভ করলেন যে পদবী অর্পণ করা এক মহা আনন্দের ব্যাপার।

আপনার গোত্রের জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশী এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী স্থান অধিকার করে আছে। আপনার সার্কেলের ব্যবস্থাপনা বড় দায়িত্বপুর্ণ কাজ। এতে দক্ষতা ও দুরদর্শিতার প্রয়োজনহয়। আপনি যুবক কিন্তু ভাল শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, স্থানীয় অফিসারদের উপদেশ যা আপনাকে সব সময় দেওয়া হবে, তাদের সাহায্যে আপনার সার্কেলের সু-ব্যবস্থা

করতে সক্ষম হবেন। এতে আপনার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবেও লোকজনের সুবিধা হবে। সরকার আপনাকেও পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য প্রধানদেরকে সবরকম সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব যাতে উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি হয়।
এটা সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ যে আপনি পাহাড়ীদের যাযাবর অভ্যাস ত্যাগ করান। এবং যেখানে জমি পাওয়া যায় সেখানে আবাদ করান।'
রাঙ্গামাটি রাজবাড়ী
ভুবন মোহন রায়
চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল
৪৫ তম চাকমা রাজ
১৮ই অক্টোবর ১৯১৯ খ্রীঃ
ডি. ও. নং ৪৭

২। চাকমা কিংবদন্তির মূল্যায়ন।

রাজা ভুবন মোহন রায় বর্ণীত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসটি, ঐ পরিবার সম্বন্ধে একটি উচ্ছ্বাস পূর্ণ ধারণা প্রদান করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় লোকদের প্রাধান্য, তাদের রাজনৈতিক আলোড়ন ও উচ্চাভিলাস, চাকমা আধিপত্য মণ্ডিত। এই আধিপত্যকে চাকমা রাজকীয় মাহাত্ম্য অধিক ঐশ্বর্য্য মন্ডিত করেছে। বোমাং রাজকীয় মাহাত্ম্য, অনেকটা বর্মী আভিজাত্যের উত্তরসূরী এবং এদেশীয় অতীত ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায়, তাকে টেক্কা দেয়ার লক্ষ্যে, আরো অধিক কৌলিন্যের উদ্ভাবন আকাঙ্খাই, এই ইতিহাস রচনায় ভুবন বাবুকে উদ্বুদ্ধ করেছে। অথচ লোক সমর্থিত চাকমা ইতিহাসটি নিম্নাকারে চর্চিত হয় যথাঃ

"আদি রাজা শের মস্ত খাঁ রোয়াং ছিলো বাড়ি
তার পর শুকদের রায় বান্ধে জমিদারী।
(সূত্র ঃ চাকমা লোকগীতি)

ভূবন বাবুর তৃতীয় উর্দ্ধ পুরুষ রাণী কালিন্দি রাজা নগর রাজবাড়ি সম্মুখে মহামুণি মন্দির নির্মাণ করে তার গাত্রে লিখে গেছেনঃ
'সর্ব সাধারণের অবগতার্থে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছি যে অত্র চট্টগ্রামের পর্বতাধিপতি আদি রাজা সের মস্ত খাঁ তৎপর রাজা শুকদেব রায় অতঃপর রাজা সের দৌলত খাঁ পরে রাজা জান বকস খাঁ অপরে রাজা টব্বর খাঁ অনন্তর রাজা জব্বর খাঁ আর্য্যপুত্র রাজা ধরম বক্স খাঁ তৎ সহধর্মিনী আমি শ্রীমতি কালিন্দি রাণী....। দ্রঃ
এই দুই বর্ণনায় চাকমাদের এতদাঞ্চলীয় আদি রাজা বা মূল রাজা রূপে শের মস্ত খাঁই সমর্থিত। অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনের তথ্যানুসারে তিনি ১৭৩৭ সালে আরাকান ত্যাগ করে চট্টগ্রামে আসেন। তাকে চট্টগ্রামের মোগল নায়েব জুলকদর খান কোদালার মাওদায় কিছু পাহাড়ী জমি বন্দোবস্ত দেন। আর স্থানীয় পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের তহসিলদার নিযুক্ত করেন। তখন তার সঙ্গি হয়ে কিছু সাধারণ চাকমাও এদেশে আসে। যারা তার জমি

আবাদে নিযুক্ত হয়। তখন মূল চাকমা সম্প্রদায় ও তাদের সর্দার পক্ষ আরাকানে ছিলেন, যার অকাট্য দলিল হলো রাজা শের জব্বার খাঁর সীল মোহরটি, যার কার্যকাল হলো ১৭৪৯-৬৫ খ্রীঃ সাল। ১৭৫৮ সালে সেই আদি রাজা শের মস্ত খাঁ নিঃসন্তাম মারা যান। তার পোষ্য পুত্র তৎপূর্বেই নিঃসন্তান গত হয়েছেন। তাদের উত্তরাধিকারী কোন সন্তান না থাকায় পরবর্তী স্থানীয় চাকমা প্রধান কে এবং কি ভাবে হয়েছিলেন, তার কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ নেই। এ ব্যাপারে ভুবন বাবুর বক্তব্য হলো ঃ শেরমস্ত খাঁ হলেন ফতেহ খাঁর পুত্র। তার অপর দুই সহোদর হলেন রহমত খাঁ ও সের জান খাঁ। শের মস্ত খাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছেন রহমত খাঁর পুত্র শের দৌলৎ খাঁ। অথচ অকাট্য প্রমাণ সীল মোহর সূত্র বলে ফতেহ খাঁ ১৭৭১ সালে চাকমা প্রধান ছিলেন। তার পরবর্তী চাকমা প্রধান রূপে ১৭৭৩ সালে শের দৌলৎ খাঁ বরিত হোন। ঐ ফতেহ খাঁর পুত্র রুপে ১৭৩৭ সালে শের মস্ত খাঁনের রাজা রূপে অভিষিক্ত হওয়া মানে, পিতা ফতেহ খানের ৩৪ বছর আগে পুত্র শেরমস্ত খাঁনের ক্ষমতা গ্রহণ এবং পিতৃব্যের ৩৬ বছর আগে উত্তরাধীকারী রূপে ভ্রাতুস্পুপুত্র শের দৌলৎ খানের ক্ষমতা লাভের বিষয় নিশ্চিত হওয়া। শেরমস্ত খাঁ ১৭৫৮ সালে গত হয়ে থাকলে ১৭৭৩ সালে কি করে শের দৌলৎ খাঁ উত্তরাধিকারী হন? সুতরাং রাজা ভুবন বাবু বর্ণিত এই রাজকুষ্ঠিও ক্ষমতা লাভের ফিরিস্তি বিভ্রান্তিকর। আসলে শেরমস্ত খাঁ আরাকান বাসী মূল চাকমা প্রধান শের জব্বার খাঁর জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। তার পুত্র নরুল্লাহ খাঁ, ফতেহ খাঁ ও শের দৌলৎ খাঁ। নুরুল্লাহ খাঁ সীল মোহর নিঃসন্দেহ করে তিনি শের জব্বার খাঁর পুত্র। ১৭৫৮ থেকে ১৭৭৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এতদাঞ্চলীয় চাকমাদের প্রধান কে ছিলেন এবং কিভাবে হয়েছিলেন তা দলিল প্রমাণের দ্বারা স্পষ্ট নয়। শের দৌলৎ খাঁর সীলমোহর, আর তখনকার বৃটিশ বিরোধী চাকমা বিদ্রোহের নেতৃত্বের সূত্রই প্রমাণ করে, তিনি ১৭৭৩ সাল থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত এতদাঞ্চলীয় চাকমাদের প্রধান ছিলেন। এরূপ আরো সীলমোহর পাওয়ার সূত্রে প্রমাণ হয় জনৈকা সোনাবি ১৭৪০ সালে, শের জব্বার খান ১৭৪৯ সালে নুরুল্লাহ খাঁন পিতা শের জব্বার খাঁন ১৭৬৫ সালে এবং ফতে খাঁর ১৭৭১ সালে চাকমা প্রধান ছিলেন। এদের মধ্যবর্তী শের জব্বার খাঁর সীলমোহর স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে তিনি মূলতঃ ইসলাম ধর্মবলম্বী ও আরাকানের রোসাংবাসী ছিলেন। অপর তিন জনের সীলমোহর তাদের মুসলিম সমাজ ভূক্ত হওয়াকে নাম খেতাব ও আরবী বর্ণমালার ব্যবহার সূত্রেই নিশ্চিত করে। তবে তাদের বসবাস ক্ষেত্র সম্বন্ধে এই সূত্রটি নীরব। আমরা নিসন্দেহে জানতে পারছি যে, শেরমস্ত খাঁর উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের ব্যাপারটি ভুবন বাবুর বর্ণনা অনুসারে সত্যই বিভ্রান্তিকর। বিশ্বাস যোগ্যতার মাপ কাঠিতে ভুবন বাবু বর্ণিত সর্বাধিক নিকটকার পারিবারিক ইতিহাসটি অগ্রহণ যোগ্য। সুতরাং এই ইতিহাসের প্রাচীন অংশটি আরো অধিক অবিশ্বাস্য ভাবা সঙ্গত। বোমাং পারিবারিক ইতিহাসটি এই তুলনায় অধিক সত্য বর্ণনা সমৃদ্ধ, যদিও তাতে কৌলিন্য বাড়ানোর প্রচেষ্টা যুক্ত আছে। তাদের পূর্ব পুরুষদের অবিচ্ছিন্ন বর্মী রাজ রক্তধারী হওয়ার দাবী অতিরঞ্জিত বলা যায়। তবে এটা সঠিক যে, এ দেশীয় বর্মীও

আরাকানী প্রশাসনের সাথে তাদের পূর্ব পুরুষদের কেউ কেউ জড়িত ছিলেন, যে গৌরব জনক উদাহরণ চাকমা রাজ পরিবারের প্রাপ্ত নয়। সুতরাং কৌলিন্যে বোমাং রাজ পরিবারই শ্রেষ্ঠ। ভুবন বাবু নিজের শ্রেষ্ঠ রাজ কৌলিন্য প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আরো আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

ভুবন বাবু বর্ণীত দীর্ঘ রাজ তালিকাটি অবিশ্বাস্য উচ্ছাশা প্রসুত। তাকেও টেক্কা দিয়ে ঐ রাজ তালিকাটি চাকমা সমাজভূক্ত অন্য কেউ কেউ আরো বর্ধিত করে বই পুস্তক লিখেছেন, যা নিজেদের রাজ মাহাত্ম্য বাড়ানোর অপচেষ্টা মাত্র। এই অপচেষ্টার সাথে তাদের এই পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যাধিকারী হওয়ার কথাও কারো কারো দ্বারা যুক্ত হয়েছে, যা সত্যই বিতর্কিত দুষ্ট চিন্তা প্রসূত। চাকমা পরিচিতি পুস্তকের রচয়িতা পণ্ডিত বাবু সুগত চাকমাই বর্ণীত তথ্যটির প্রবক্তা। তিনি চট্টগ্রামের ইংরেজ শাসক হেরি ভেরে লষ্টের একটি বক্তব্যকে আংশিক ধারণ করে এই বিভ্রান্তিকর দাবীটি উথাপন করেছেন। পরে তাই স্বাতন্ত্র্যবাদী চাকমা অনুসারীরা অকাট্য সত্য রূপে ধারণ করে নিয়েছেন।

চাকমা লোক কাহিনী রাধা মোহন ধনপতির পালা, চাটিগাং ছাড়া পালা, ধান্যা ওয়াদি আরেদ ফুং পালা ও চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস তাদেরকে রূপ কথার রাজ্যাধিকারী করেছে। সে রাজ্যগুলো হলো কল্প নগর, চম্পক নগর, কালা বাঘা, ওক্সা দেশ মৈশা গিরী তৈনছড়ী, আলী কদম ইত্যাদি। এখনো তাদের স্মৃতিতে প্রাচীন স্বাধীন স্বাদেশ চম্পক নগর আকর্ষনীয় হয়ে আছে, তাই এখনো নেতৃ পর্যায়ের ব্যর্থতায় আক্ষেপ উচ্ছাসের সাথে এ গানটি গীত হয়, যথা ঃ-

এলে মৈশাং লালচ নেই
ন এলে মৈশাং কেলেচ নেই
চল ভেই লোগ চল যেই
চম্পক নগর ফিরি যেই।

মুসলিম সুলতানী ও বাদশাহি আমলে একটি মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠে ছিলো। তখন শিক্ষার মাধ্যম ছিলো আরবী ও ফারস্রী ভাষা এবং লেখ পদ্ধতি ছিলো আরবী বর্ণ ভিত্তিক। প্রাথমিক শিক্ষা হতো মসজিদ ও মক্তবে। অভিজাত আমীর ওমারা ও রাজ পুরুষরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহ শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তাতে আরবী বর্ণ ভাষা ও ফার্সির মাধ্যম ব্যবহৃত হতো। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধরা ও ঐ শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তবে তারা নিজেদের ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃত ও পালির চর্চা এবং ধর্ম শিক্ষার নিজস্ব ব্যবস্থা ও অব্যাহত রাখতেন।
চাকমা রাজ পুরুষদের ব্যবহৃত সীলমোহর গুলো এই বিস্ময়কর তথ্য প্রদান করে যে, তারা মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। সাধারণ শিক্ষালয়ে অথবা গৃহশিক্ষা পদ্ধতিতে তারা লেখাপড়া করে থাকবেন। বর্ণিত মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণের কোন প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ অবশ্যই তাদের ছিলো না। সুতরাং এই রাজ পরিবারটি ধর্ম ও ঐতিহ্য সূত্রেই এই শিক্ষা পদ্ধতিতে নিজেদের জড়িয়েছেন, যা

মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিলো, এমনটি ভাবা স্বাভাবিক। রাজা শের জব্বার খাঁর সিলমোহরীয় বক্তব্য এটাই দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করে যে, ব্রিটিশ আমলের পূর্ব পর্যন্ত জাতিগত ভাবে চাকমা ও তাদের সর্দার বংশ আরাকানের বাসিন্দা ছিলেন। তখন সাধারণ চাকমারা কোন ধর্মালম্বী ছিলো তার কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও তাদের সর্দার বংশ যে মুসলমান ছিলেন তা ঐ সিলমোহরের দ্বারা নিশ্চিত হয়। তখন আরাকান ছিলো অমুসলিম মগ শাষিত, তবে মুসলিম প্রভাবিত। সেখানে মঘী ও মুসলিম মিশ্র পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো বলা যায়, সেখানকার ম্রাকু রাজবংশ ছিলো ঐ মুসলিম প্রভাবে প্রবর্তক। ম্রাকু রাজপুরুষরা মঘী ও মুসলিম নাম খেতাবে ভূষিত হতেন। স্থানীয় চাকমা সর্দাররা বিকল্প মঘী নাম খেতাব ব্যবহার না করায় ভাবা যায় তারা খাটি মুসলমান ছিলেন। এবং সেখানে প্রচলিত মুসলিম সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থায় লেখা পড়া করেছেন। চাকমা সম্প্রদায় ছিলো ম্রাকু শাসনাধীন প্রজা। তারা ছিলো মূলত থেক তথা শেখ সম্প্রদায়ের লোক, যারা নিজেদের নামের সাথে সাংমা উপাধি ব্যবহার করতো। পরে সম্ভবত বাংলা অঞ্চলে সাংমা উপাধিটি চাকমা নামে পরিণত হয়েছে। তবে নিজস্ব উচ্চারণে চাকমারা নিজেদের চাঙমাই বলে যা সাঙমা শব্দেরই কাছাকাছি অপভ্রংশ।

মধ্য প্রাচ্যে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার আগে পরে তথাকার সামুদ্রিক বণিকেরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত ছিলেন। ঐ বণিকদের সাধারণ পরিচয় ছিলো শেখ। ঐ শেখদের জাহাজ বহর আরাকান উপকুলে ঝড়ের কবলে পড়ে অনেক সময় বিপর্যস্ত হতো। সৌভাগ্য ক্রমে তাদের অনেকেই ভেসে এসে অথবা স্থানীয় জাহাজীদের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে উপকূলে আশ্রয় নিতেন। স্থানীয় প্রশাসনের আনুকুল্যে তাদের অনেকে সে দেশে পুনর্বাসিত হতেন। তারা স্থানীয় লোকদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে একাত্ম হয়ে যেতেন। ঐ শেখদের স্থানীয় স্ত্রীদের ঔরস জাত আরাকানীরা নতুন এক প্রজন্মে পরিণত হয়। প্রতিবেশীরা তাদের শেখ তথা থেক নামে আখ্যায়িত করতো। এদেরই এক অভিজাত বংশ যারা ছিলেন পরবর্তী কালের মুসলিম এবং অর্থে বৃত্তে প্রভাবশালী, তারা শেখ বংশধরদের নিজেদের অধীনে সংঘব্ধ করে আপদে বিপদে দুঃখ দূরশায় নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এভাবে তাদের সামাজিক সর্দারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সর্দার বংশ ধর্মতঃ মুসলমান হলেও সাধারণ শেখ বা থেকেরা ছিলো মিশ্র ধর্ম বিশ্বাসী। তখন স্বদেশ স্বধর্ম স্বজাতি আত্মীয় ধর্ম আচার অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য একত্রিত হয়ে অভিনব এক ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির জন্ম হয়। নিজেদের সামাজিক প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সর্দার গোষ্ঠী ঐ ধর্মীয় বৈচিত্র্যে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন। এখনো ঐ ধর্মীয় বৈচিত্র্য চাকমা ও থেক সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান। কালের বিববর্তন দেশান্তর ও ভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এখন ঐ সর্দার পরিবার সাবেক মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্যে আবদ্ধ নেই। সম্ভবত তারাই এখন এদেশে চাকমা রাজপরিবার আখ্যায়িত।
দেখা যায় কিংবদন্তীয় চাকমা রাজ তালিকা প্রামাণ্য নয়। এখানে লোক সমাজ

সমর্থিত এবং দলিল দস্তাবেজে বর্ণিত প্রামাণ্য রাজ তালিকাটি উপস্থাপিত হলো, যথাঃ-

১। শের মস্ত খাঁ কার্যকাল	১৭৩৭ খ্রীঃ
২। সোনা বি	১৭৪০ খ্রীঃ
৩। শের জব্বার খাঁ	১৭৪৯ খ্রীঃ
৪। নূরুল্লা খাঁ	১৭৬৫ খ্রীঃ
৫। ফতেহ খাঁ	১৭৭১ খ্রীঃ
৬। শের দৌলৎ খাঁ	১৭৭৩ খ্রীঃ
৭। জান বকশ খাঁ	১৭৮৩ খ্রীঃ
৮। তব্বার খাঁ	১৮০০ খ্রীঃ
৯। জব্বার খাঁ	১৮০১ খ্রীঃ
১০। ধরম বকশ খাঁ	১৮১২ খ্রীঃ
১১। কালিন্দি বিবি	১৮৪৪ খ্রীঃ
১২। হরিশ চন্দ্র রায়	১৮৭৩ খ্রীঃ
১৩। ভুবন মোহন রায়	১৮৯৮ খ্রীঃ
১৪। নলি নাক্ষ রায়	১৯৩৬ খ্রীঃ
১৫। ত্রিদিব রায়	১৯৫৩ খ্রীঃ
১৬। দেবাশীষ রায়	১৯৭৭ খ্রীঃ

বর্ণিত এই ১৬ জনের প্রামাণ্য রাজ তালিকার বিপরীতে কিংবদন্তীয় তালিকা হলো ৪৮ জনে সমৃদ্ধ, যা ভুবন বাবুর কৌলিন্য বৃদ্ধির প্রয়াস প্রসূত বলা যায়। চাকমা মাহাত্ম্যবাদীরা পরে তা আরো বর্ধিত করেছেন।

(৩) বোমাং রাজ কুষ্ঠী।

বোমাংরা হলেন পার্বত্য অঞ্চলের দ্বিতীয় সর্দার বংশ। তাদের বংশ তালিকাটি ম্রাকু রাজ আত্মীয় চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসক মংচপাই বা মংশুয়ে প্রু পর্যন্ত বিস্তৃত, যিনি পেগু রাজ কুমার। ১৬১৪ খ্রীঃ সালে ম্রাকু রাজা কর্তৃক তিনি চট্টগ্রামের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭৫৬ সালে চট্টগ্রামের শেষ আরাকান শাসিত অঞ্চল নাফ নদী অববাহিকা হারানো পর্যন্তই মংগ্রো প্রু, হারি প্রু, হারিঞো এবং কংহ্লা প্রুই ছিলেন চট্টগ্রামে আরাকানী শাসক। মোগলদের হাতে ঐ সালে পরাজিত হওয়ার ফলে শেষ মগ শাসক কংহ্লা প্রু নিজ লোকজন সহ আরাকানে পত্যাবর্তন করেন। তিনি অবশ্য রাজ রক্তধারী ছিলেন না। তার পূর্ববর্তী হারিঞোর পিতা জনৈক আংসুন্যা সাধারণ আরাকানী ছিলেন। ঐ কংহ্লা প্রু ১৭৭৪ সালে ব্রিটিশ আমলে পুনরায় স্বদেশ ত্যাগ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফিরে এসে অভিবাসন গ্রহণ করেন। তারই বংশধর হলেন বর্তমান বোমাংরা। সুতরাং তারা সাধারণ আরাকানী বংশজাত লোক। তৎপর এদেশবাসী বোমাংরা হলেন যথাক্রমেঃ

১। কংহ্লা প্রু কার্যকাল	১৭৭৪ খ্রীঃ

২। হাতান প্রু	১৮১১ খ্রীঃ
৩। অং প্রু	১৮৪৪ খ্রীঃ
৪। কংলাপ্রো	১৮৪৬ খ্রীঃ
৫। মং প্রু	১৮৬৬ খ্রীঃ
৬। সানাই প্রো	১৯৭৫ খ্রীঃ
৭। চহ্লা প্রু	১৯০১ খ্রীঃ
৮। মংশা প্রো	১৯০৬ খ্রীঃ
৯। কিয়ো সাঁই প্রু	১৯২৩ খ্রীঃ
১০। কে জো সাঁই প্রু	১৯৩৩খ্রীঃ
১১। মংশোয়ে প্রু চৌধুরী	১৯৫৯ খ্রীঃ
১২। অং শোয়ে প্রু চৌধুরী	১৯৯৪ খ্রীঃ

(৪) মাং রাজ কুষ্ঠী

মাং রা হলেন তৃতীয় সর্দার বংশ। আরাকানী উদ্বাস্তুদের মাঝ থেকে ১৭৮৪ সালের পরে এই বংশের উদ্ভব হয়েছে। এই বংশের প্রথম পুরুষ হলেন ম্রাচাই নামীয় জনৈক পেলেইংছা উদ্বোস্তু সরদার। এই বংশটি বর্তমানে ৮ম পুরুষে উপনীত। তবে এই বংশে খাটি আরাকানী মগ রক্ত নেই। এর সাথে ত্রিপুরা রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। ভবিষ্যতে হয়তো এই বংশ ধারায় শাওতাল ও চাকমা রক্তের ও সংযোগ ঘটতে পারে। প্রয়াত মাংসর্দার নিঃসন্তান মংপ্রু সাঁই ও নিহার বালা দেবীর দত্তক কন্যা উনিকা দেবী রক্ত সূত্রে সাওতাল বলে কথিত। তার স্বামী চাকমা রাজ রক্তধারী রাজীব রায় মাং সদারীর অন্যতম দাবী দার। বর্তমানে ঘোষিত সর্দার পাইলা প্রু চৌধুরীও নির্ভেজাল সর্দারী রক্তের অধিকারী নন। এই সর্দারীর দাবিটি হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে। মামলা জয়ের সম্ভাবনা উভয় দিকে সমান সমান। এই বংশের সর্দার তালিকা নিম্নরূপঃ

১। ম্রাচাই কার্যকাল	১৭৮৪ খ্রীঃ
২। সাইলেং	১৭৮৭ খ্রীঃ
৩।খেদু	১৭৯৬ খ্রীঃ
৪। কুঞ্জ ধামাই	১৮০০খ্রীঃ
৫। কে জো সাঁই	১৮২৬ খ্রীঃ
৬। নরবদি	১৮৭০ খ্রীঃ
৭। কে জো প্রু	১৮৭৯ খ্রীঃ
৮। নে প্রু সাঁই	১৮৯৪খ্রীঃ
৯। হানুমা চৌধুরী	১৯৩৬ খ্রীঃ
১০। মং প্রু সাঁই চৌধুরী	১৯৫৩ খ্রীঃ
১১। নিহার বালা দেবী	১৯৮৪ খ্রীঃ
১২। পাই লা প্রু চৌধুরী	১৯৯১ খ্রীঃ

কমিশনার বাহাদুরের চিঠি নং ৫৬৫ তাং ৩-৬-১৮৮১ মূলে তখনকার চাকমা জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিলো ঃ
রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের সার্কেলভুক্ত করদাতা ঃ

চামকা জুমিয়া	৫০১১ পরিবার
মাং সার্কেলভুক্ত চাকমা	১০৫৮ পরিবার,
নিষ্কর ১৫% হিং	৯১০ পরিবার,
স্বাধীন বন্দোবস্তি প্রাপ্ত চাকমা	১২৬৫ পরিবার,
	মোট ঃ ৮২৪৪ পরিবার
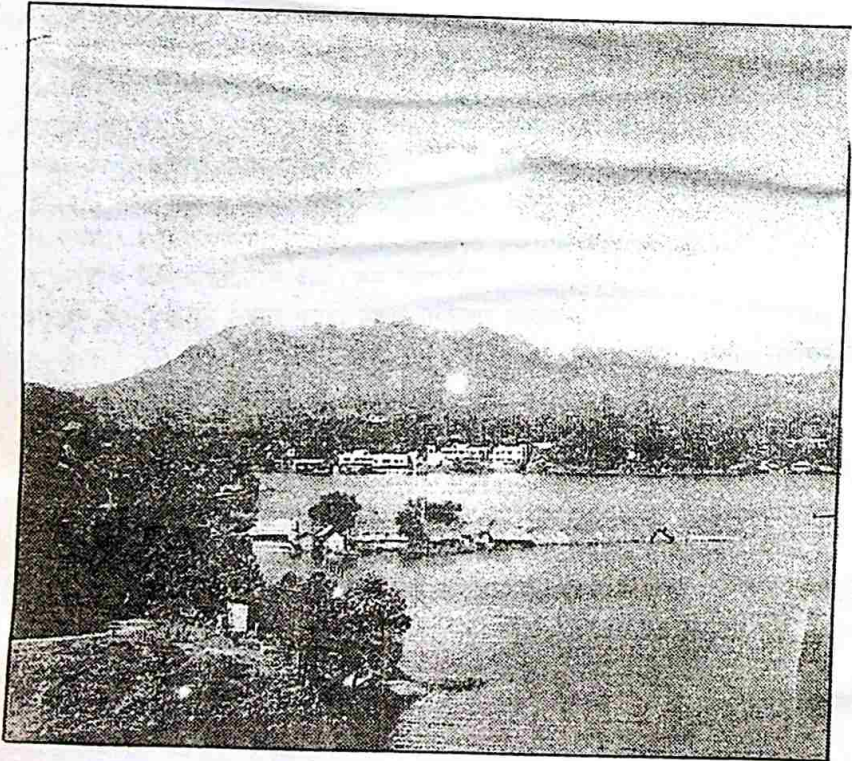
প্রকৃতির কূলে রাঙ্গামাটি

অধ্যায় (ঘ) বিবিধ মূল্যায়ন।

১। স্বতন্ত্র জেলা ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা।

দুর্গম ও উপজাতীয় লোক উপদ্রুত হওয়ায় পার্বত্য পূর্বাঞ্চলে প্রশাসন পরিচালনা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, চট্টগ্রাম প্রশাসনের পক্ষে অত্যন্ত দুরুহ হয়ে দাঁড়ায়। শাসন বহির্ভুত সীমান্তপারের অরাজক উপজাতীয়রা তীব্র উৎপাতের দ্বারা জনজীবনকে অতিষ্ট করে তুলে। এতদাঞ্চলীয় প্রজা সাধারণের জানমাল ও ইজ্জত হয়ে পড়ে নিরাপত্তাহীন। শাসন ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারী অপারগতা প্রকট হয়ে ওঠে। স্থানীয় উচ্চাভিলাষী উপজাতীয় কারো কারো স্বাধীনতা অবলম্বনেরও খায়েশ ছিলো। যা ইতিপুর্বে অতি কষ্টে দমানো হয়েছে। এমনিতে সারা ভারতে স্বাধীনতা পুররুদ্ধারের প্রবণতা ও প্রবল সিপাহী বিদ্রোহের ধকলে ইংরেজ সরকার তখনো কাহিল। সীমান্তপারের আক্রমণকারী উপজাতিদের না দমান গেলে, তা থেকে উৎপাত ও আধিপত্যবাদী চেষ্টা অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াবে। আক্রমণকারীদের পশ্চাদশক্তি পরাজিত বার্মা, উৎপাত ঘটাবার গোপন মদদ দাতার ভূমিকা নিতে পারে। বৃটিশের হাতে তার আরাকান হারাবার প্রতিশোধ স্পৃহা ক্ষুদ্রতম বৈরী সুযোগেও সে মিটাতে সচেষ্টা হবে। সীমান্তের অরাজক উপজাতীয়দের বৃটিশদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হবে তার নিজের নিরাপত্তা বিধান ও প্রতিশোধ মিটানোর কাজ। সুতরাং পূর্ব সীমান্তবর্তী উপজাতীয় উৎপাতটি, বৃটিশ শক্তিকে বেকায়দায় ফেলার একটি গোপন বর্মী ষড়যন্ত্র বলেও অনুভূত হয়। তদুপরি মধ্যবর্তী পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলটি উভয় রাষ্ট্রেরই শাসনমুক্ত মুক্তাঞ্চল। তথাকার পাহাড়ী উপজাতিরা অরাজক স্বাধীন চেতা। তাদের যেমন কোন রাষ্ট্রের পতি আনুগত্য নেই, তেমনি ধর্মে কর্মে ও তারা প্রকৃতিবাদী ও স্বাধীন। ওদের নিয়ন্ত্রণে আনা গেলে, সীমান্ত হবে সুরক্ষিত, রাষ্ট্রের আয়তন হবে সম্প্রসারিত, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের ও একটি উর্বরক্ষেত্র পাওয়া যাবে। লোক গুলোকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবে বশে আনা গেলে, এতদাঞ্চলীয় বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও রক্ষায় প্রভূত সাহায্য পাওয়া সম্ভব। অধিকন্তু এদেশীয় স্বাধীনতাকামীদের দমাতে এই সীমান্তবর্তী উপজাতীয় অঞ্চল হবে শক্তি সঞ্চয়ের ঘাঁটি ও নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র। পার্বত্য চট্টগ্রাম হল তারই পশ্চাদঘাটি। এটিকে স্বপক্ষে গড়ে তুলতে হলে উপজাতীয় অঞ্চলরূপেই নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে, উপস্থিত সীমান্তবর্তী উপজাতীয় উৎপাত দমানোর

নামে জারি করা হয় রেইড ওফ ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবস নামের আড়ালে ১৯৬০ সালের ২২ নং আইন। তাতে পার্বত্য পূর্বাঞ্চলকে পৃথক করে, নতুন জেলা প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা করা হলো। আগের চট্টগ্রামের পর্বতাঞ্চল নতুনভাবে নামধারণ করে হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল ও তার উপজাতীয় অধিবাসীদের দমানোর অভিযান শুরু হলো। পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার পর শুরু হলো দান অনুদান প্রদান ও ধর্ম প্রচার। খ্রীষ্টীয় ধর্মগুরুরা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন পাহাড়ে আর উপত্যকায়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী লোক ও ধর্ম সম্প্রদায়দের সরিয়ে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হলো। স্থানীয়দের বাধ্য অনুগত রাখাকে যুক্তিযুক্ত ভাবা হলো। জারি করা হলো সে উপযোগী আইন রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর আওতায় ছিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল।

এই আইন বলে এই প্রথম, অস্থানীয় পাহাড়ী লোকজন এতদাঞ্চলে আইনতঃ অবাধে অভিবাসনের সুযোগ পেলো। তিন অস্থানীয় উপজাতীয় সর্দার ও তাদের অধীনস্থ মাতবরেরা, হয়ে দাঁড়ালেন সরকারের খয়ের খা এজেন্ট ও সাধারণ লোকদের প্রভু। প্রবর্তিত হলো অবশিষ্ট দেশবাসীদের আগমন-নির্গমন, বসবাস, পেশা, ব্যবসা ও বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে নিধিনিষেধ। আগমন নির্গমন নিয়ন্ত্রণে প্রবর্তিত হলো পারমিট প্রথা। এতদাঞ্চল পরিণত হলো স্বদেশ ভুক্ত বিদেশে। উপজাতীয়রা পরিণত হলো জাতির মাঝে বিজাতিতে। এতদাঞ্চল উন্মুক্ত হয়ে গেলো বিজাতীয় বহিরাগত অভিবাসনের ক্ষেত্র রূপে। প্রতিবেশী ও দেশবাসী স্থানীয় আদি বাসিন্দারা অভিবাসীদের তুলনায় আস্তে আস্তে হয়ে পড়লো সংখ্যালঘু। তারা হলো শাসিত, অবহেলিত প্রজা। বিপরীতে অভিবাসী সর্দার মাতবর ও তাদের স্বগোত্রীয়রা হয়ে দাঁড়ালো প্রভুশ্রেণী। খ্রীষ্ট ধর্মে বহু উপজাতি ধর্মান্তরিত হতে থাকলো। এ দেশীয় ধর্ম সম্প্রদায় গুলো হয়ে পড়লো বারিত ও নিষিদ্ধ। তাই ইসলাম ও হিন্দুধর্ম তো বটেই, মুসলমান আর হিন্দুরা ও উপজাতীয় সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটাতে অক্ষম হলো। ঐতিহ্যগত বৌদ্ধধর্ম তার অধিকাংশ উপজাতীয় অনুসারীদের, বহু কষ্টে ধরে রাখতে সক্ষম হলেও, উপজাতীয় সমাজ হলো বিভক্ত।

২। সাংগঠনিক রাজনীতি।

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের আগে উপজাতীয় সমাজে কোনরূপ রাজনৈতিক তৎপরতা ছিলো বলে জানা যায় না। রাজা ভুবন মোহন রায় তখন ভারতীয় কৌলিন্যে উন্নীত হবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। প্রথমে তিনি নিজ বংশ কৌলিন্য প্রতিষ্ঠায় রচনা করেন চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস নামীয় একটি পুস্তিকা। তৎপর বিপুল অর্থ ব্যয়ে বালুখালিতে নির্মাণ করেন পাকা রাজবাড়ি। জৌলুশ বৃদ্ধির বাড়তি উপকরণ হিসাবে স্থাপিত হয়, দরবার ঘর, বুদ্ধ মন্দির ও মুর্তি এবং সংগৃহীত হয় প্রাচীন কালের পরিত্যক্ত কামান। ছেলেমেয়েদিগকে তিনি উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত করেন, এবং ভারতীয় কুলিন হিন্দু পরিবার থেকে দুই পুত্রবুধকে ঘরে নিয়ে আসেন। ইতোমধ্যে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের বদৌলতে উপজাতি সমাজে কিছু

সাধারণ শিক্ষিতের আবির্ভাব হয়ে গেছে। লাঙ্গল কৃষির প্রবর্তন হেতু জীবিকা নির্বাহ আর আয় রোজগারেও উন্নতি ঘটেছে। তখন কিছু উদীয়মান ও স্বচ্ছল শিক্ষিত যুবক, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে উজ্জীবিত হয়ে উঠেন। তাদেরই উৎসাহে বিশের দশকে গঠিত হয় উপজাতীয় জন সমিতি। কিন্তু এই সংগঠনটি প্রথমে তেমন সক্রিয় ছিলো না। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র ও দেশ বিভাগ আসন্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে চল্লিশের দশকে তা সক্রিয় হয়ে ওঠে, ও ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ছেচল্লিশের দিকে চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় ও মং রাজা তদীয় ভগ্নিপতি মং প্রু সাঁই এর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় দ্বিতীয় সংগঠন ঃ দি হিলম্যান এসোসিয়েশন। লক্ষ্য ছিলো ঃ এতাদাঞ্চলের ভারতভূক্তি ও রাজাদের ক্ষমতা রক্ষা। এই স্বপক্ষীয় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছেচল্লিশের শেষের দিকে বা সাতচল্লিশের শুরুতে একটি কংগ্রেসী দল রাঙ্গামাটি সফরে আসেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ঃ এতদাঞ্চলের জন্য কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা উপযোগী তা খতিয়ে দেখা ও রিপোর্ট করা। ঐ দলে ছিলেন দলনেতা এ ভি ঠক্কর, সদস্য ডাঃ অফুল্ল ঘোষ, জয়পাল সিংহ, রাজকৃষ্ণ বোস, ফুলবান শাহা ও জয় প্রকাশ নারায়ণ। রাঙ্গামাটি খেলার মাঠে বাবু কামিনী কুমার দেওয়ানের সভাপতিত্বে তারা একটি জনসভাও করেন এবং স্থানীয় সার্কিট হাউসে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হোন, যথা ঃ (১) কামিনী মোহন দেওয়ান (২) নীরোদ রঞ্জন দেওয়ান (৩) ভুবন চন্দ্র চাকমা (৪) ঘন শ্যাম দেওয়ান ও (৫) স্নেহ কুমার চাকমা। ঐ বৈঠক ও সংযোগের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, স্নেহ কুমার চাকমা পাড়ায় পাড়ায় সভা অনুষ্ঠান ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির তৎপরতা শুরু করে দেন। উপজাতীয় পুলিশ ও সিপাহীদের বিদ্রোহ করার প্রতি উৎসাহী করে তুলার প্রয়াস পান। শুরু হয়ে যায় শহর বাজার ও পাড়াসমূহে উগ্র শ্লোগান মুখর প্রসেশন। এরই প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গালীরা শংকিত হয়ে পড়ে। মুসলমানরা সংগঠিত হয় মুসলিম লীগের পতাকা তলে। মহড়া শুরু হয়ে যায় আত্মরক্ষার।

স্নেহ কুমারের উগ্র তৎপরতায় সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা দানা বেঁধে ওঠে। মফস্বলের মুসলমানেরা অনেকাংশে নেমে যেতে থাকে সমতলের নিরাপদ পরিবেশে। তাদের অনেকে শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রী লোকদের সরিয়ে দিয়ে বাজার শহরাঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী পাড়াসমূহে সংঘবদ্ধ হোন ও সতর্ক পাহারা বসান। উপজাতীয় উগ্র শ্লোগান ও প্রসেশনের মোকাবেলায় তারা নিজেদের উজ্জীবিত করে তুলেন। একেক বার মনে হতো এই বুঝি দাঙ্গা লেগে যায়। উত্তেজনা আর আশংকায় দিন রাত উদ্বেগ অশান্তি। চলাফেরা রোজি-রোজগার প্রায় বন্ধ। সবাই বাজার ও পাড়ার ভিতর আবদ্ধ। বাঙ্গালী ও উপজাতিরা পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ। সবাই একে অপরকে এড়িয়ে চলে। জন সমিতির সভাপতি কামিনী কুমার দেওয়ান ও সচিব স্নেহ কুমার চাকমার মাঝে মত বিরোধ দেখা দেয়। কামিনী বাবু সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করে, প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। ১৪ই আগস্ট রাত্রে পাকিস্তান ঘোষিত হওয়ার পরবর্তী ভোরে স্নেহ

কুমার নিজের অনুসারীদের নিয়ে জেলা প্রশাসকের বাংলায় ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ইংরেজ জেলা প্রশাসক প্রকাশ্যে বিরোধীতায় অবতীর্ণ না হয়ে ঘটনাটির বিদ্রোহাত্মক ভয়াবহতা গোপন বেতার বার্তার মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারকে অবহিত করেন এবং নিজে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন এই বিশৃঙ্খলার ভিতর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তান বলে ভূষিত হয়। এদিকে স্নেহ কুমার উগ্র আর উৎসাহী অনুসারীদের সহ মিছিল মিটিং ও শ্লোগান মুখর। বাজার ও পাড়াবাসী মুসলমানেরা উপজাতীয় হামলার আশংকায় ভীত। তিন দিন পর্যন্ত এরূপ উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তা অব্যাহত থাকে। ১৭ আগস্ট ভোরে নদী পথে লঞ্চের মাধ্যমে পাকিস্তানী সৈন্যদের আগমন ঘটে। বাঙ্গালীদের সাহস বাড়ে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি, আর লঞ্চ থেকে তার প্রত্যুত্তরে ত্রাস শুরু হয়ে যায় উপজাতিদের মাঝে। তাদের প্রত্যাশিত ভারতীয় হস্তক্ষেপের আশা উবে যেতে শুরু করে। রাঙ্গামাটির এই ঘটনাকে অনুসরণ করে, বান্দরবনেও উগ্র মগ নেতৃবৃন্দের দ্বারা বর্মী পাতাকা উত্তোলিত হয়। তাদের লক্ষ্য ছিলো বার্মার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের সংযুক্তি। পাকিস্তানী সৈন্য একই সাথে সেখানেও উপস্থিত হয়। সেখানেও বর্মী হস্তক্ষেপের আশা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় উভয় অঞ্চলে সামরিক ও পুলিশী অভিযান। অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় কামিনী বাবু ধরা পড়েন। স্নেহ কুমার ও তার সঙ্গীরা পালিয়ে আত্মগোপন করেন এবং পরিশেষে আগরতলায় গিয়ে আশ্রয় নেন। বিদ্রোহী মগ নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ আরাকান ও বার্মায় পালিয়ে যান। এভাবে তাৎক্ষণিক সামরিক হস্তক্ষেপে, এবং বিদেশী মদদের পাল্টা উপস্থিতি না ঘটায়, বিদ্রোহ দমে যায়। বিদ্রোহের সাথে কামিনী বাবুর সংশ্লিষ্টতা গুরুতর ছিলো না বলে, কিছু দিন পর তিনি মুক্তি পান। তৎপর ১৯৫০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারই নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন উপজাতীয় সংগঠন 'দি হিল ট্রাক্টস পিপুল অরগেনাইজেশন।' ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি এই সংগঠনের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে সদস্য নির্বাচিত হোন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে ওটাই হলো প্রথম নির্বাচন। সে থেকেই উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক ও জাতীয় সংসদের সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে আসছেন। এই সংসদীয় বিজয়ের ধারায় একমাত্র এরশাদ আমলই প্রথম ব্যতিক্রম, যখন খাগড়াছড়ি আসন থেকে জনাব আলিম উল্লা প্রথম বাঙালী যিনি সংসদে নির্বাচিত হবার সুযোগ পান। ইতোমধ্যে ষাটের দশকের শেষাংশে বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আবির্ভাবে এতদাঞ্চলে উপজাতীয় রাজনীতির নতুন উচ্চাভিলাষী ধারার সংযোগ ঘটে। ওটা সংঘাত, সংঘর্ষ ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক হিংসা ও প্রতিযোগিতার সূচক হয়। এ যাবৎ কালের দীর্ঘতম ও জটিল সশস্ত্র বিদ্রোহের ও উপজাতীয় সশাসন দর্শনের ওটাই ভিত্তিকাল। কমিউনিষ্ট ধারার রাজনীতি ও আন্দোলনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লারমা তার সহযোগীদের নিয়ে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোন। ১৯৫৭ সালে গঠিত পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও তার পরবর্তী আমলের সদস্যরা একই বামপন্থী ও বিপ্লবী আদর্শের অনুসারী ছিলেন। ঐ কমরেডরাই হলো লারমার মূল অনুসারী। ঐ ছাত্র নেতৃবৃন্দই এখন জনসংহতি

সমিতির মূল নেতৃসমষ্টি। প্রীতি কুমার চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা, উষাতন তালুকদার ও অন্যান্যরা এখনো তাতে সক্রিয় আছেন।

ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক দল গড়ার প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ১৬ই মে তারিখে রাঙ্গামাটির নির্মীয়মান ও পরিত্যক্ত কোর্ট বিল্ডিং এলাকায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সন্তু লারমা, অমীয় সেন চাকমা, কালি মাধব চাকমা ও পংকজ দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেরই ফল ১৯৭২ সালের সংগঠনঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনী।

পাকিস্তান আমলে সমস্যা ছিলো ঃ উপজাতীয় জীবনের পশ্চাপদতা ও আদিমতা। সর্বত্র নিরক্ষরতা ছিলো ব্যাপক। রোজি-রোজগারের প্রধান মাধ্যম ছিলো জুম কৃষি ও বনজদ্রব্য আহরণ। প্রশাসন ছিলো আমলা নির্ভর ও সামন্ততান্ত্রিক। দারিদ্র্য আর অরাজকতা মানুষকে অসহায় করে রেখেছিলো। ষাটের দশকে কর্ণফুলী হ্রদ সৃষ্টির নিমজ্জনজনিত কারণে ঐ নদী উপত্যকার লক্ষাধিক অধিবাসী, নিজেদের বাড়ী-ঘর, জায়গা জমি, ফল ফসল ও বাগানের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রথম এক সাথে মুঠভরা টাকার স্পর্শ পায় এবং তদ্বারা সেই প্রথম স্বচ্ছলতার উল্লাস অনুভব করে। সাথে সাথে নতুন জায়গা জমি, বাড়িঘর গড়ে তোলার অনিশ্চয়তা, বর্ধিত ক্ষতিপূরণ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবিতে তারা ক্ষীণ কণ্ঠেসোচ্চার হয়। সরকার মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষ মিটাতে যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে ব্রতী হন।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষির উন্নয়নে অধিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়। কিছু দিনের ভিতর এতো ব্যাপক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যে, তাতে ছাত্র আর শিক্ষক পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী স্বাস্থ্য, আর কৃষি সম্প্রসারণের সুবিধা পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। নগদ টাকার আধিক্যে ভোগ-বিলাল, আনন্দ উপভোগ ও বিলাসী আয়োজন বেড়ে যায়। বন্য পশ্চাদপদ জীবন মান কাটিয়ে শহুরে সাজ পোষাক ও আধুনিকতার প্রতি লোকজন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। স্বচ্ছলতা বয়ে আনে বিলাস উচ্চ শিক্ষা ও হীনমন্যতাহীন জীবন। আধুনিক জীবনবোধ গড়ে ওঠে। অধিকার চেতনার জন্ম হয়। দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিতে পরিবর্তন আসে। পাকিস্তানের শেষ আমলে স্থানীয় শাসনের আওতায় নীচু স্তরে প্রতিনিধিত্ব মূলক পদ ও দায়িত্বে অনেকের রাজনৈতিক পুনর্বাসন লাভের সুযোগ হয়। বৃহৎ শিল্প ও পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার আওতায় অনেকের কর্মসংস্থানও ঘটে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা এবং কর্মসংস্থানের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই বর্ধিত চাহিদা আর উচ্চাভিলাষই জন্ম দেয় নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের। শ্লোগান উঠে ঃ স্বায়ত্তশাসন চাই। উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য আর ঐতিহ্যের রক্ষাকবচ দিতে হবে। এই বিক্ষুব্ধ নবপ্রজন্মের নেতা হয়ে আবির্ভুত হোন মানবেন্দ্র

নারায়ণ লারমা। আগুনের মতো ত্বরিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এ শ্লোগানটি। এরই অনুকূল প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে লারমা জিতে যান। জয়ের সাফল্যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য প্রীতি ও স্থানীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা, আরো জোরদার হয়ে ওঠে। কিন্তু আকস্মিক সংগঠিত স্বাধীনতা যুদ্ধ, তাদেরকে সাময়িক স্তম্ভিত করে দেয়। তবে উক্ত বিরতিকালেও তাদের মাঝে নতুন উৎসাহের সংযোগ ঘটে। তারা মিজো স্বাধীনতাকামী ও স্থানীয় উপজাতীয় রাজাকারদের সংস্পর্শে আসে। তাতে ভবিষ্যতের সশস্ত্র আন্দোলনের উপায় ও সূত্র সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল হয়। পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত হওয়ায়, অসহায় রাজাকার ও মিজো বাহিনী হয়ে পড়ে বিমূঢ়। লারমা ও তার সহযোগীরা এই সুযোগে তাদেরকে রাইংক্ষ্যং সীমান্তবর্তী বিতর্কিত জুম ক্ষেত্রে আত্মগোপন করার সুযোগ করে দেন, যে ক্ষেত্রটি বার্মা ও মিজোরামের সংযোগ স্থলের কাছে অবস্থিত। তথাকার বেআইনী চাকমা জুমিয়ারা, নিজেদের জুম ও বসতি রক্ষার জন্য সংসদ সদস্য লারমার উপর নির্ভরশীল ছিলো। লারমা-প্রেরিত মিজো ও রাজাকারদের আগমনকে তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি বলেই ধরে নেয়, এবং ঐ বাহিনীদ্বয়ের আশ্রয় ও রসদ যোগাতে নিয়োজিত হয়। ভারতীয় বাহিনীর ভয়ে মিজোরা কিছুদিনের ভিতর চীন পাহাড়ের দিকে সরে যায় ও আত্মগোপন করে। তবে স্থানীয় উপজাতীয় রাজাকারেরা লারমার তত্ত্বাবধানে সেখানেই স্থির থাকে এবং তারা হয়ে পড়ে লারমা বাহিনী। অতঃপর পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ও লুকিয়ে রাখা অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার এবং বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য নতুন নিয়োগ ও ট্রেনিং দান শুরু হয়। এই সশস্ত্র লারমা বাহিনী পরিশেষে শান্তিবাহিনী নাম ধারণ করে এবং তার পরিচালক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়। উভয়ের জন্ম হয় আগে পরে ১৯৭২ সালেই।

পার্বত্য অঞ্চলে ১৮৩০ জন উপজাতীয় সদস্য নিয়ে স্থানীয় রাজাকার ও সিভিল ফোর্স গঠিত হয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধ শেষে তিন শতের মত আত্মসমর্পণ। বাকি ১৫০০ সদস্য নিয়ে শান্তি বাহিনী গঠিত হয়। তাদের দ্বারা বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই গুপ্ত হত্যা ও অগ্নি-সংযোগের ঘটনাবলী শুরু হয়ে যায়, এবং একতরফা বাঙ্গালীরাই তার শিকার হয়। উপজাতীয় ছাত্র ও যুবকের দল সামরিক প্রস্তুতিমূলক শারীরিক কসরত ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান তখনই শুরু করে। সশস্ত্র উপজাতীয় বাহিনীর আনাগোনা দৃষ্টিগোচন হতে থাকে। শুরু হয়ে যায় চাঁদাবাজী ও হুমকি। বিপরীতে সরকার পক্ষে জনগণের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা জোরদার করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। লারমা দ্বৈত ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হোন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা সেজে একদল উপজাতীয় প্রতিনিধিসহ তিনি ঢাকায় পৌছে, সর্বপ্রথম নিম্নোক্ত আনুষ্ঠানিক দাবীগুলো সরকারের নিকট পেশ করেন। এর আগে এতদাঞ্চলীয় দাবী-দাওয়া ছিলো মৌখিক তথা অনানুষ্ঠানিক। দাবীগুলো যথা ঃ

'১। পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং এর একটি নিজস্ব আইন

পরিষদ থাকবে।'
২। উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।
৩। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা থাকবে।
৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।' (সূত্র ঃ স্মারকলিপি ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২)।

তবে এ দাবীগুলো নিয়ে লারমা সংসদে বা বাহিরে কোথাও সক্রিয় বা সোচ্চার হোননি। প্রকাশ্য আন্দোলনমূলক কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীও গ্রহণ করেননি। তার গোবেচারা ধরনের চেহারার আড়ালে ভয়ংকর এক রাজনীতি উজ্জীবিত হতে থাকে। শক্তি বৃদ্ধি ও সশস্ত্র আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি এগিয়ে যায়। সরকার এই লেখকের রিপোর্ট ও স্থানীয় গোয়েন্দা প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ ভয়াবহতা অনুমান করেন ও প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি জোরদার করার উদ্দেশ্যে সেনা ছাউনী প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হোন। প্রতিষ্ঠা করেন দীঘিনালার কবা খালি ও রুমায় দুটি সেনা ছাউনি। বিপরীতে শুরু হয়ে যায়। দুর্গম চলার পথে শান্তিরক্ষী বাহিনী ও বাঙ্গালীদের উপর গেরিলা আক্রমণ। বাজার ও পণ্যবাহী যানবাহনগুলো লুট করার ঘটনা ঘটতে থাকে। যাত্রীরা ব্যাপক সংখ্যায় লুট ও নির্যাতনের শিকার হোন। পাড়াবাসী ও ব্যবসায়ীদের চাঁদা নিতে বাধ্য করা হয়। খুন, জখম, গুম ও মারপিট বেড়ে যায়। অগ্নিসংযোগের পুনরাবৃত্তিতে অনেক বাজার একাধিক বার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে সেনা উপস্থিতি ও পুলিশী নিয়ন্ত্রণ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। এরই এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে নদী বন্দর সুবলং বাজারে পুলিশ ও শান্তিবাহিনী সর্বপ্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শান্তিবাহিনীর পক্ষে কয়েকজন হতাহত ও ধৃত হয়। এরই কিছুদিন পর চন্দ্রঘোনা থানা এলাকায় সেনা টহল দলের উপর আক্রমণ ঘটে। প্রমাণিত হয়ে যায় শান্তিবাহিনীর ভয়ানক হিংস্র অস্তিত্ব। লারমা এতসব ঘটনার দ্বারা উপজাতীয় মহলে এক ত্রাণকর্তা ও বীরে পরিণত হোন। ইতোপুর্বে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তার জনসংহতি সমিতি উত্তর ও দক্ষিণের উভয় আসনেই জয়লাভ করে, এবং তিনি নিজে একজন সহযোগীসহ বর্ধিত শক্তিতে সংসদে পুনরাবির্ভুত হোন। তবে এ যাবৎকাল সংসদে একটি কথাই তিনি জোরের সাথে ব্যক্ত করতে সক্ষম হোন যে, উপজাতীয়রা বাঙ্গালী নয়। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশী জাতীয়তাই প্রযোজ্য। সংবিধান প্রণয়নকালে তার ঐ বক্তব্য ছিলো যথার্থ। তখন তিনি রাষ্ট্রীয় কাঠামো ফেডারেল না এককেন্দ্রিক হবে, এই প্রশ্নটি উত্থাপন এড়িয়ে যান। তার লক্ষ্য ছিলো ঃ আগে শক্তি সঞ্চয় ও তৎপর বাধ্যকরণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঃ আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রিত সরকার ও সংসদে তার স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবী হবে অরণ্যে রোদন। তিনি সতর্কতার সাথে শান্তিবাহিনী সংক্রান্ত উৎসাহ আর সংশ্লিষ্টতা গোপন রাখতে সচেষ্ট হোন। তাই তাকে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী পক্ষ বলে অভিযুক্ত করাও যাচ্ছিলো না। তার লক্ষ্য ছিলো চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা আত্মরক্ষা ও

সময়ক্ষেপন, এবং সংসদীয় ক্ষমতায় টিকে থাকা। এই কৌশলেরই অংশ হিসাবে তার বাকশালে যোগদানকে ও মুল্যায়িত করা যায়। তবু ইতোমধ্যে তিনি সংযোগুপনে বিতর্কিত হয়ে যান।

তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সম্বন্ধে অনেকেই ওয়াকিবহাল হয়ে পড়েন। তিনি নিজেও ব্যাপারটি আঁচ করতে সক্ষম ও নতুন করণীয় উদ্ভাবনে নিমগ্ন হোন। এরই মধ্যে ১৯৭৫ -এর আগষ্টে দেশে বিপ্লব ঘটে যায়। তাতে শেখ মুজিবসহ অনেকেই নিহত হোন। ক্ষমতার পট পরিবর্তন ও নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে লারমা সংকিত হন ও আত্মগোপন করেন। ইতোমধ্যে ভারত সরকারের সাথে তার যোগাযোগ ও সমঝোতা হয়ে গেছে। তিনি কৌশল হিসাবে দক্ষিণ ত্রিপুরাকে ঘাঁটি হিসাবে গ্রহণ করেন। ভারতীয় মদদ, যোগাযোগ ও নিরাপত্তার ছত্রছায়া নিশ্চিত হয়। একদা নির্বাচনী বাজিমাত ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উচ্চারিত হয়েছিলো যে উৎসাহবর্ধক ও উত্তেজক স্বায়ত্ত শাসন শ্লোগান, পরবর্তীতে তা-ই উচ্চাভিলাষী করে তুলে তার প্রবক্তা নেতৃবৃন্দকে। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক জন্মরহস্য তাদেরকে অত্যুৎসাহী করে তুলে। আঞ্চলিকভাবে উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্য, সীমান্তে অবস্থিতি, পার্বত্য দুর্গমতা এবং সর্বোপরি বিদেশী মদদ লাভের নিশ্চয়তা, লারমা ও তার সহযোগীদের উজ্জীবিত করে তুলে। তারা ভাবতে শুরু করেন ঃ শুধু স্বায়ত্তশাসনই নয়, আরো অধিক কিছু পাওয়ার পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল। সংখ্যাগত প্রাধান্যের গুণে হিন্দুদের জন্য ভারত, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান এবং বাঙ্গালীদের পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হওয়ায়, উপজাতীয় প্রাধান্যের বলে স্বাধীন জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠা ও সম্ভব। এই উচ্ছাস ও উচ্চাশায় অস্ত্রবাজি, চাঁদা সংগ্রহ আর দালাল নির্মূল অভিযান জোরদার করা হয়। সমগ্র মফস্বল অঞ্চল সন্ত্রাসী তৎপরতায় ভরে যায়। একটি বিদ্রোহী সরকারই যেন পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি হয়ে পড়ে ঘোলাটে ও নাজুক।

ইতোমধ্যে আগস্ট বিপ্লবজনিত বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা কেটে গেছে। সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতা সামলে নিয়েছেন। তিনি অনতিবিলম্বে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বিদ্রোহ অবসানের লক্ষ্যে আলোচনা ও পরামর্শ লাভের আশায় রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউসে বৈঠকে বসেন। কিন্তু আলোচনায় উগ্রতা ও আঞ্চলিকতার প্রাধান্য ঘটে। তিনি হতাশ হোন। তাঁর ধারণা জন্মে উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্যই উগ্রতা ও বিদ্রোহের ভিত্তি। এতদাঞ্চলীয় উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ উদার অনুগত ও নমনীয় নন। সেই বৈঠকে তারা নিম্নোক্ত লিখিত বক্তব্যগুলো পেশ করেন, যা কার্যতঃই সমঝোতামূলক নমনীয় ছিলো না, যথাঃ

১। 'আমার মাতৃস্তন্য কাহাকেও ধরিতে দিতে আমার ইচ্ছা নাই।'

২। 'বেআইনী বাঙ্গালী অনুপ্রবেশকারীদের স্রোতধারা অবিলম্বে ও নিশ্চিত রূপে বন্ধ করিতে হইবে।'

৩। 'উপযুক্ত তদন্তপূর্বক এ যাবৎকাল পর্যন্ত বেআইনীভাবে বন্দোবস্তিকৃত হস্তান্তরিত

এবং দখলিকৃত জমি হইতে বহিরাগতগণকে উচ্ছেদ করিতে হইবে।'

৪। 'চির প্রচলিত পার্বত্য ভূমি প্রশাসন সম্বন্ধীয় বিধি এবং উপবিধি সমুহ কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। (সূত্র ঃ জিয়াউর রহমানকে প্রদত্ত স্মারক লিপি তাং ১৯.১২. ১৯৭৫)

উপরোক্ত দাবীগুলোর প্রত্যেকটি উগ্র, অসহনীয় ও একপক্ষদর্শী। এতে মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী রাষ্ট্র শক্তিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। এতদাঞ্চল যেন মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা ছিনিয়ে আনা নয়, বরং এই পর্বতাঞ্চলের পক্ষে বাংলাদেশের সাথে সংযুক্তি যেন উপজাতীয় করুণা। বাঙ্গালীরা তাদের কাছে তুচ্ছ করুণার পাত্র। এই পার্বত্য ভুখন্ড যেন উপজাতীয়দের এক পক্ষীয় চিরকালিন লাখেরাজ সম্পত্তি। এই উগ্র এক পক্ষীয় তিক্ত বক্তব্যের দ্বারা বিদ্রোহকেই সমর্থন দেয়া হয়। এখানে নমনীয়তা ও জাতীয় স্বার্থের প্রতিফলন ঘটেনি। তাতে আরো কিছু উচ্চাভিলাষী দাবী সন্নিবেশিত হয়, যথাঃ

'ক) উপজাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশাসন কার্যে জেলা প্রশাসককে সাহায্য ও উপদেশ দানের জন্য উপজাতীয় জনপ্রতিনিধি গণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করা হউক।'

খ) বর্তমানের পুলিশ প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করিয়া বর্তমান পুলিশ বাহিনীর স্থলে, পূর্বতন পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনীর অনুরূপ, প্রধানতঃ এই জেলার উপজাতীয় লোকগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা হউক।' (সূত্র ঃ উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জনাব জিয়াউর রহমানকে প্রদত্ত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মারকলিপি তাং-১৯-১২-৭৫ইং)।

জনাব জিয়াউর রহমান একে উপজাতীয় বাড়াবাড়ি জ্ঞান করে সিদ্ধান্ত নেনঃ আপত্তিকৃত বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারাই উপজাতীয় প্রাধান্যের বিপদের মোকাবেলা করা সঠিক হবে। সংখ্যা প্রাধান্যের বলেই উপজাতীয়রা উগ্র ও দুর্বিনীত। এর স্থায়ী সমাধানই হলোঃ বাঙ্গালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি। সংখ্যালঘু না হওয়া পর্যন্ত তারা দমিত হবে না। এর পাশাপাশি যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন কাজও চালান দরকার। প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতিও থাকতে হবে। সুতরাং শুরু হয়ে যায় বাঙ্গালী বসতি স্থাপন। সেনাছাউনী বৃদ্ধির প্রতি জোর দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নে অধিক মনোযোগ ঘটে।

অতীত অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকেই মনে করেন, বাঙ্গালী আবাসনই হলো উপজাতীয়দের হিংসাত্মক আচরণের মূল কারণ। কিন্তু ঐ প্রতিবাদীরা জানেন না যে, ওদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা দীর্ঘ লালিত। উপরোক্ত স্মারকলিপির প্রথম দফাগুলোই এর প্রমাণ। বাঙ্গালী আবাসন হলো এর বহু পরের ঘটনা। অপ্রিয় হলেও বাঙ্গালী আবাসন কাজটি রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার অপরিহার্য অংশ। স্থানীয় বিদিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু করার মাধ্যমেই এতদাঞ্চলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে

পারে। নতুবা এটা হয়ে থাকবে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা পুরনের ঘাটি। সংখ্যাগত প্রাধান্যের মাধ্যমে উপজাতীয়দের প্রাপ্য আধিপত্য লাগামহীন উচ্চাকাঙ্খা পূরণের কারণ হতে পারে। যদ্বারা আনুগত্যহীনতা ও বিদ্রোহ ঘটা সম্ভব। এই সন্দেহ ভাজনদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার অর্থ তাদের প্রতি অত্যাচার করা নয়। জাতি ও দেশের কল্যাণে এটা হলো রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষা মূলক কাজ। দেশ রক্ষায় প্রাণ দিতে হয়। জাতীয় সম্মান রক্ষায় জানমাল হারাতে হয়। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের জন্য পীড়ন থাকলেও, তৃপ্তিদায়ক অহংকারও নিহিত। উপজাতীয়দের সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়া এমনি এক মাহাত্ম্যমন্ডিত কাজ, যা তাদেরকে সন্দেহ মুক্ত করবে। জাতি ও দেশের পক্ষে এটা প্রয়োজনীয়। এই অপ্রিয় কাজ স্বেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এক শক্তিশালী স্বার্থন্বেষী পক্ষ এর বিরোধিতা করবেই। তাতে সংঘর্ষ সংঘাতে জানমালের ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তবু লক্ষ্য অর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। জনাব জিয়াউর রহমান, এসব সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই, বাঙ্গালী আবাসনে অগ্রসর হোন। তার আকস্মিক শাহাদতের ঘটনায় পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে যায়। নতুবা এতোদিনে উপজাতীয়দের ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়া ছিল অবধারিত, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্বাধিকার অর্জনের অস্ত্রবাজি, দার্শনিক ভিত্তি হারিয়ে নেহাত দুষ্কর্মের চরিত্রই ধারণ করতে বাধ্য হতো। সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ঘাটিগুলো হতো বাঙ্গালীদের দ্বারা দখলিভূত। বন ও পাহাড়ের নির্জন দুর্গমতা, ঢেকে রাখার মত আচ্ছাদনে বিদ্রোহীদের লুকিয়ে রাখতে পারতো না। দমিয়ে যাওয়া ছিলো তাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। তখন গুপ্ত হত্যা আর সন্ত্রাস অব্যাহত থাকা কোন মতেই সম্ভব হতো না। ফলে আস্তে আস্তে বিদ্রোহী পক্ষ হতাশায় আক্রান্ত হতো। পরিস্থিতি তাদেরকে অস্ত্রবাজি থেকে নিষ্ক্রিয় করে দিতো। তারা নিজেরাও নিরাপদ হত।

পরবর্তী এরশাদ সরকার উচ্ছ্বাস ও উচ্চাশার বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে শান্তির নিশ্চয়তা পাওয়া ছাড়াই, বাঙ্গালী আবাসন ও সেনা অভিযান এক তরফাভাবে স্থগিত করে দেন। কোন্দলরত ক্ষুদ্র একদল বিদ্রোহীকে নিরাপত্তা আশ্রয় দিয়ে, অবশিষ্টদের আত্মঘাতী সংঘাত থেকে বাঁচিয়ে দেন, এবং বিদ্রোহীদের দাবীকৃত স্বায়ত্তশাসনের বিপরীতে, স্থানীয় সরকার পরিষদ শাসনের এক অভিনব স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেন। পরিস্থিতি উন্নয়নে সে ব্যবস্থাটা মোটেও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়নি। পরে দাবি অনুযায়ী পরিষদ ব্যবস্থা পুর্নগঠিত হলেও- অবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি।

বাঙ্গালী আবাসন ও সেনা অভিযান স্থগিতকরণ, এবং দল ছুট বিদ্রোহীদের আশ্রয়দানের পর সন্ত্রাস বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এবার বাঙ্গালী পাহাড়ী পরস্পরের পাল্টা হানাহানি স্থানীয় গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। উপদ্রুত পাহাড়ীদের বিরাট একটি দল, ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরামে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি নির্যাতনের বদনাম, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। তখন সরকার বিষয়টি হাল্কা করার জন্য বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন। কিন্তু আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সশস্ত্র বাহিনীর মাঝে। সরকার পক্ষের

নয় দফা, আর বিদ্রোহীপক্ষের পাঁচ দফা দাবীপত্রগুলো মাত্র পরস্পরের কাছে হস্তান্তরিত হয়। আলোচকদের মাঝে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি না থাকায়, ফলপ্রসু আলোচনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং সমঝোতার পর্যায়ে পৌছা দুরূহই থাকে। বৈঠক চালিয়ে যাওয়া নিষ্ফল ভেবে ৬ষ্ঠ বৈঠকের পর বিদ্রোহীপক্ষ তা বর্জন করেন। অপর দিকে বিদ্রোহীদের কোনঠাসা করার লক্ষ্যে স্থানীয় উপজাতীয় রাজনীতিকদের ক্ষমতার টোপ হিসেবে, স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। বিদ্রোহীদের দাবীকৃত পাঁচ দফার অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় ক্ষমতাগুলোর প্রায় সবই, তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধু প্রদেশ নাম ও গভর্ণর পদের ব্যবহারটাই বাদ থাকে। কিন্তু এটা হয় কার্যতঃ বিদ্রোহীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ।

বাস্তবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে এককেন্দ্রিক। ফেডারেল প্রাদেশিক ব্যবস্থা তাতে সমর্থিত নয়। এই সাংবিধানিক অসুবিধাটি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবেচ্য ছিলো। এর পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হতে পারতো এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আপোষ মীমাংসার বিকল্প উত্থাপিত হওয়াও সম্ভব ছিলো। প্রাদেশিক ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহের বিপরীতে রক্ষাকবচ হলো রাজ্যপাল বা গভর্ণরের উপস্থিতি। এবং তার পক্ষে কেন্দ্রীয় শাসন প্রয়োগের ক্ষমতা। সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায়, তিনি কেন্দ্রের পক্ষে প্রধান স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকার তার আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। প্রাদেশিক সরকারের অর্থ স্বাধীন বা সামন্ত শাসন কর্তৃপক্ষ নয় বা তা কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রশাসনিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠাও নয়। এই দাবীর বিপরীতে এরশাদ প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়, চেয়ারম্যান ও তার পরিষদের উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরোপিত, এবং সরকারি কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিও শূণ্য। অন্ততঃ একজন পলিটিকেল এজেন্ট নিয়োগ করে, তাকে আনুষ্ঠানিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দিয়ে পরিষদকে কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা যেতো। জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হলেও, তিনি আমলা। তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রাধান্য আইনতঃ প্রাপ্য নয়। সুতরাং প্রাদেশিক ব্যবস্থার মত ক্ষমতায় ভারসাম্য রক্ষা, বর্ণিত পরিষদীয় ব্যবস্থায় আরোপিত হয়নি। এতে নিয়ন্ত্রণ হলো দুরারোপিত রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। দুরবর্তী কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপই তাকে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়। এই নিয়ন্ত্রণ সার্বক্ষণিক ও স্থানীয় না হওয়া অসুবিধাজনক। চেয়ারম্যান পদটি অগণতান্ত্রিকভাবে শুধু উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। এটা একপক্ষীয় তোষামোদমূলক ব্যবস্থা। এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়। প্রদেশ নাম, রাজ্যপাল বা গভর্ণর পদ, ভারসাম্যময় গণতান্ত্রিক শাসন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা বাদে, সবই পরিষদীয় ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা প্রাদেশিক শাসনের অভিনব পরিপুরক বিকল্প, একপক্ষীয় স্বশাসন ব্যবস্থা, এক নতুন সুবিধাবাদ। বিপরীতে একজন, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, তথা পলিটিকেল এজেন্টের অধীন, স্বশাসিত পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠন করা, যুক্তিযুক্ত হতো। স্থানীয় সরকার গঠনের মাধ্যম হতে পারতো গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা। পাঁচ দফা ভুক্ত মান্য বিষয়গুলো হতে পারতো স্থানীয় সরকারের দায়িত্বাধীন বিষয়। বিদ্রোহীপক্ষের তাতে সম্মত হওয়ার সম্ভাবনা

ছিলো। কিন্তু একরোখা অরাজনৈতিক চিন্তা, সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়। ফলে শান্তি স্থাপন পিছিয়ে যায়। বাস্তবে শান্তি-মুক্ত-ক্ষমতা-লিপ্সু এক খাই-খাই পরিষদই গঠিত হয়। যাদের নিজেরাই নিজেদের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে ছিলো সন্দিহান। তালিকাভুক্ত ক্ষমতার সার্বিক হস্তান্তর ও সাংবিধানিক নিশ্চয়তার দাবীতে তারা তখন সোচ্চার। তাদের ঐ দাবী দাবীদাওয়া ছিলো বিদ্রোহীদের দাবীসমূহের প্রতিধ্বনি। ঐ পরিষদীয় ব্যবস্থা বিদ্রোহীদের দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত ছিলো না। সুতরাং শান্তি স্থাপন ও শান্তকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই চেপে দেওয়া সংশোধিত পরিষদীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা মানে একটি ব্যয় বাহুল্যকে বয়ে চলা, শান্তি স্থাপনে যার ভূমিকা অনিশ্চিত।

পাঁচ দফা দাবী ভুক্ত জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক বক্তব্যটির জরুরী পুনর মূল্যায়নের সময় এখন হয়েছে। সে বক্তব্য হলো ঃ
'জুম্ম জনগণ আজ সুদীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন করে নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে বদ্ধ পরিকর। জুম্ম জনগণের এই আন্দোলন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন। এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতাধীনে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ শান্তিপুর্ণ উপায়ে রাজনৈতিকভাবে বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য। স্বীয় জাতীয় সংহতি, জাতীয় পরিচিতি, জন্মভূমি ও ভিটা মাটির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে, জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মহান কর্মকান্ডে, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে চায়। চায় সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা অতি দ্রুতগতিতে অবসান করে, সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সামিল হতে। কারণ গনতান্ত্রিক শাসন ও অধিকার ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধন সহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংহতি সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস, প্রথা, প্রবাদ, ভাষা, ঐতিহ্য, ভূমি অধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে না।'
(সূত্র জনসংহতি সমিতির জরুরী বিবৃতি তাং-৩১/১০/৯১ইং)
এই বিবৃতিকে বলা যায় সমাধানের সংশোধিত সর্বশেষ মূলনীতি, যা কার্যতঃ উদার ও বিজ্ঞ ধ্যানধারণার সমষ্টি। একে ভিত্তি করে সহজে সম্মানজনকভাবে সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব ছিলো। উপজাতীয় সামষ্টিকে তাত্ত্বিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে বাংলাদেশী জাতিভুক্ত শাখা বলে স্বীকৃতি দেয়া যায়। এমনিতে শব্দটি সাধারণ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হয়। তার পরিবর্তে সংজ্ঞাটির ব্যবহার বাস্তব অর্থ জ্ঞ্যাপক হওয়াই সঙ্গত। জুম্ম জাতি বা জুমিয়া জাতি সংজ্ঞাটির চেয়ে উপজাতীয় সংজ্ঞাটি অধিক সম্ভ্রান্ত। জুম একটি অনুপযোগী পেশা, তাতে আদিমতা সংশ্লিষ্ট। উপ-জাতীয়দের সবাই নয়, অতি স্বল্প সংখ্যক পশ্চাদপদ লোকই উক্ত ঐতিহ্যের ধারক। তাই আধুনিক কালের গর্বিত সুসভ্য শিক্ষিত পাহাড়ী লোকজন, তদ্বারা পরিচিত হতে

পারেন না। সুতরাং জুম্ম জাতি নয়, আভিধানিক উপজাতীয় পরিচিতি হবে সঠিক ও সুখকর। স্থানীয় ভৌগোলিক জাতি নয়, আভিধানিক উপজাতি পরিচিতি হবে সঠিক ও সুখকর। স্থানীয় ভৌগোলিক নামটি জুম্মল্যান্ড নয়, জুম বঙ্গ রাখা যেতে পারে। নামটি বাংলা ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপুর্ণ। অতীতে এ নামটি খানেক প্রচলিত ছিলো। রাণী কালিন্দির একটি পাট্টায় ও মোগলদের জুম নোয়াবাদে এটি উল্লেখিত ও সমর্থিত। সুতরাং এটি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও কুলিন। এ নামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হওয়া যৌক্তিক। উপজাতীয় ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবিটি বিরোধীয় নয়। এই স্বাতন্ত্র্য জাতীয় বৈচিত্র্যের অংশ। তাদের ভাষা, আচার-আচরণ, প্রথা ও জীবন-যাপনের বর্ণাঢ্যতা অবশ্যই সংরক্ষণযোগ্য। এবং তজ্জন্য দরকার পৃথক ঐতিহ্য সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তার একটি শাখা থাকবে। সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত হবে একটি ঐতিহ্য পরিষদ। সরকারী ব্যয়ে তারা নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা ও চর্চায় ব্রতী হবেন। আন্তঃ সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক মিশ্রণ এবং কলুষতাকে পরিহার করাও হবে তার দায়িত্ব। একেকটি বিশেষ এলাকাকে বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা অধ্যুষিত রাখাও যাবে। বিশুদ্ধতাবাদীরা সেখানে নিজেদের সংমিশ্রণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু মিশ্র অঞ্চল
ও থাকবে, যেখানে সবার সম্মিলিত বসবাসের অধিকার রক্ষিত হবে।

জুমিয়া জাতি ও ভূমি সত্ত্বের অস্তিত্ব রক্ষা প্রয়োজনীয়। তবে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে সংরক্ষিত উপজাতীয় অঞ্চল করা বাস্তবসম্মত নয়। দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এখানে বাঙ্গালীদের এবং অবশিষ্ট অঞ্চলে উপজাতীয়দের সমান ভূম্যাধিকার অবশ্যই প্রাপ্য। উপজাতি ও বাঙ্গালী সবাই হলো দেশ ভিত্তিক গঠিত জাতি সত্তার সদস্য। তাদের কেউ কোথাও অবাঞ্ছিত হতে পারে না। গণতান্ত্রিক স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থা পশ্চাদপদদের বিশেষ সুবিধাসহ অবশ্যই মান্য। এটা আবশ্যিক গণতান্ত্রিক অধিকারে পড়ে। এ দাবীকে অন্যায় বলা যায় না। তবে এর ভিতর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বজনীনতা অবশ্যই পালনীয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ, বলিয়ান দুর্বল সবার সমান সংস্থান থাকাই সঙ্গত। কারো আধিপত্য আর কারো অধীনতা কাম্য নয়। একটি ভারসাম্যময় ব্যবস্থাই বাস্তবায়িত হতে হবে। সাংবিধানিক এক কেন্দ্রীকতা ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডকতাকে রক্ষা করে, আঞ্চলিক স্বশাসন ব্যবস্থা, উদ্ভাবিত হতে পারে। তাতে আন্তর্জাতিক উদাহরণের অনুকরণ ও রাজনীতি বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করা যায়। নিজেদের ইচ্ছা খুশী নয়, একটি বিজ্ঞান সম্মত কার্যকর ব্যবস্থাই বাঞ্ছিত। সরকারও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এর পথ নির্দেশ করতে পারেন। এখন দরকার নৈতিক সমঝোতার, যে সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে বিশেষজ্ঞগণ, কাঠামোগত বিন্যাস ও তার পক্ষে সুপারিশ উপস্থাপন করবেন। রাজনীতিকদের বিশেষজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ অনুচিত। তাহলে হুজুগ ও আবেগের প্রভাবে এবং ইচ্ছা খুশির প্রতিক্রিয়ায় পরিকল্পনাটি ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সাংবিধানিক মুলনীতির ভিত্তিতে সার্বজনীন অধিকারকে নিশ্চিত করে আঞ্চলিক স্বশাসন পরিকল্পনা উদ্ভাবন

ও উপস্থাপনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যায়। যে কমিশনে উপজাতীয় পক্ষের পছন্দসই আইনজ্ঞ আর রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ ও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। অন্তরবর্তীকালের জন্য তিন জেলা পরিষদই সাধারণ স্থানীয় শাসনের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালিত হতে পারে। অগণতান্ত্রিক অগ্রাধিকারবাদী পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির প্রয়োগ আপাততঃ স্থগিত হওয়াই সঙ্গত। তার স্থান দখল করবে স্থানীয় শাসনের পক্ষে রচিত সাংবিধান সম্মত আইন। এই নৈতিক সমঝোতার আওতায় সব সন্ত্রাসী তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধের ও অস্ত্রসহ দুস্কৃতিকারীদের আত্মসমর্পণের আদেশ সরকার ও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ জারি করবেন। সরকার তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দিবেন এবং প্রয়োজনে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ নমনীয়তা দেখালেও এখনও স্পষ্ট নয় যে, তারা উপজাতীয় শাসন ও অগ্রাধিকার এবং বাঙালী প্রত্যাহারের দাবীদ্বয় পরিত্যাগে সম্মত কিনা। এ দুটি বাস্তবিকই মৌলিক প্রতিবন্ধক প্রশ্ন। দেশের ৯৯% অধিবাসী বাঙালী। পর্বতাঞ্চলেও তারা প্রায় ৫০%। মীমাংসা অংশতঃ তাদের স্বার্থ ও সম্মতির উপর নির্ভরশীল। কোন সরকারের পক্ষেই এ নাজুক প্রশ্নে একতরফা আপোষ করার অবকাশ নেই। দল-মত নির্বিশেষে গোটা বাঙালী সম্প্রদায়ের এ জটিল ব্যাপারে একক একতরফা ত্যাগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব। সুতরাং এ প্রশ্নে উপজাতীয় পক্ষকে অবশ্যই ছাড় দিতে হবে। গোটা জাতি রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তনের দ্বারা ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত, স্বায়ত্তশাসনের দাবীটি স্থগিত রাখাই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালী সম্প্রদায়কে আস্থায় আনয়নই উপজাতীয় সুবিধা-সুযোগ লাভের উপায়। তাদের বৈরীতা ক্ষতিকর। এই সত্য কথাটির প্রতি প্রতিপক্ষকে গুরুত্ব দিতে হবে। বাঙালীদের সাথে বৈরীতা নয়, শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যই উপজাতীয় স্বার্থের পক্ষে অনুকূল। এই উপলব্ধিতে উজ্জীবিত হতে হবে। বাঙালী পাহাড়ী একমত হলে এখানে অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে। এই সুন্দর, উর্বর প্রাকৃতিক অঞ্চল, তার জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের এক সোনার খনি। একে বৈরীতা আর হিংসায় অকেজো করে রাখা দুভার্গ্যজনক। সমঝোতার সূত্র এটাই। পাশাপাশি এটাও বিবেচনা করা দরকার যে বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বা দখলকৃত উপনিবেশ নয়। পৃথক সাংবিধানিক ব্যবস্থা কার্যকর করার মত বিচ্ছিন্ন পরিবেশ এতদাঞ্চলে নেই। বাঙালী পক্ষকেও এটা বিবেচনা করতে হবে যে, উপজাতীয় দাবী দাওয়ার সংশোধিত রূপ এখন আর উগ্র নেতিবাচক অবস্থানে বহাল নেই। সংবিধান মান্যতা এখন তার ভিত্তি। সুতরাং বিচ্ছিন্নতা আর অসাংবিধানিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে খোদ সংবিধানই রক্ষাকবচ এবং তজ্জন্য জনসংহতি সমিতি অঙ্গিকারাবদ্ধ। এখন দাবীনামার সমুদয় উগ্র ও নেতিবাচক বক্তব্যই অকার্যকর। সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থাই অগ্রগণ্য। দাবীনামার প্রথম দফায় ব্যক্ত সংশোধনীতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পরিহার এবং তদস্থলে সংবিধানে সংস্থানপূর্বক আঞ্চলিক

স্বায়ত্তশাসন দাবী উত্থাপন করায় সব জটিলতা কেটে গেছে। এখন ছাড়কৃত দাবী দাওয়া মেনে নিয়ে শান্তি চুক্তি হয়েছে। বিপরীতে পক্ষ বিপক্ষ স্পষ্টভাবে সংবিধান মান্যতার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। সুতরাং বলা যায় পার্বত্য সমস্যা এখন সরল সহজ সমাধানের রূপ ধরে আছে। শান্তি এখন দোরগোড়ায়।

৩। সংকটের ইতিবাচক ক্রমোন্নতি।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় গঠন কাঠামো সংক্রান্ত বিধান নিম্নরূপ ঃ
'অনুচ্ছেদ ১। প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।'

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দেশটি বিশুদ্ধভাবে এককেন্দ্রিক। যুক্ত রাষ্ট্র বা মিশ্র ধরনের রাষ্ট্র গঠনের সামান্যতম সুযোগ এতে নেই, এবং কেন্দ্রই সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একক অধিকারী। অধঃস্তন কোন সরকারের এতে সংস্থান নেই।
এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিপরীতে জনসংহতি সমিতির মূল দাবি ছিলো ঃ
'১। ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করা।

খ) নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।'
দাবীকৃত এই গঠন ব্যবস্থা সরাসরিভাবে সংবিধানে ব্যক্ত গঠন ব্যবস্থার বিরোধী। সুতরাং তা গ্রহণের বিধিগত বাধা দুর্লঙ্ঘ্য। জনসংহতি সমিতি এই সর্বোচ্চ বিধিগত বাঁধাকে দীর্ঘ বিশ বছরের রক্তক্ষরণের পর আমল দেয় এবং দাবি দাওয়াগুলোকে আইনগত বৈধতা দানের দ্বারা গ্রহণীয় করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের বাঁধা এড়াতে স্বীয় দাবীনামাটি নিম্নাকারে সংশোধন করে।
'১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা। খ) আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।'

দাবীনামার এই সংশোধনী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুকূলে গৃহীত বলে মনে হলেও, এটা চরিত্রগতভাবে পুরাপুরি এককেন্দ্রিক অখন্ড রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমর্থক বক্তব্য সম্বলিত নয়। এতদাঞ্চল বাংলাদেশের কোন উপনিবেশ বা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত অঞ্চল বলে স্বীকৃত হলেই তবে পৃথক অঞ্চলের মর্যাদায় অবশিষ্ট বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রেখে, সংবিধানে এর স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বর্ণিত সংশোধনীর সংযোজন হতে পারে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি বা অন্য কারো দাবী এরূপ নয়। ঐতিহাসিকভাবে এতদাঞ্চল বাংলাদেশের দখলীয় বা সংযোজিত অঞ্চল নয়। সংশোধিত দাবীটিও সংবিধানের অনুকূল নয়। সংবিধান মান্যতা এই সংশোধনীর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকলে তা সরাসরি হতে হবে। তবে সুখের কথাঃ

জনসংহতি সমিতির বর্ণিত সংশোধনী, আর সরকারের স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন নং ১৯, ২০ ও ২১/১৯৮৯ প্রণয়ন ও জারি, এবং তার ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলায় স্বতন্ত্র তিন স্থানীয় বা জেলা পরিষদ গঠন, এই দুই ব্যবস্থাই সমস্যার সমাধানকে সহজ করে তুলেছে। তাতে পার্বত্য সংকটের সমাধান এখন একটি গ্রহনীয় রূপ রেখায় আবদ্ধ হয়ে গেছে। উভয়পক্ষ কিছু নমনীয় অবস্থান নিলেই, সংবিধানের বিধি নং ১ ও ৫৯ এর আওতায়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি বিধানের সুযোগ-সুবিধাসহ, একটি মীমাংসা সমঝোতায় পৌছা সম্ভব। গণভোটে স্বায়ত্ত শাসন মূলক সাংবিধানিক সংশোধনী জনগণের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া অনিশ্চিত। সরকার ও জনসংহতি সমিতি একমত হলেও তা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। এ যুক্তির ভিত্তিতে এখনই মেনে নেওয়া দরকার যে, দেশে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে জন সমর্থন ও স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। অঞ্চল বিশেষের স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুরের পক্ষে এই পরিবেশ অনুকূল নয়। পার্বত্য অঞ্চলের হিংসা ও রক্তপাত, দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে গণভোটে সমর্থন সাপেক্ষ সাংবিধানিক সংশোধনী আনয়ন দেশে মতবিরোধ ও অনৈক্যের সৃষ্টি করবে, যা উপজাতি বা দেশবাসী কারো স্বার্থের অনুকূল হবে না। বিশৃঙ্খলার আশংকা আর সমর্থনের অনিশ্চয়তাকে অবহেলা করা যায় না। একদা হয়তো গোটা জাতি যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে উঠবে। তখনকার জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবীটি মূলতবী রেখে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তবে পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। শান্তিপুর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাতারাতি ও সশস্ত্রভাবে অর্জিত হয় না। সশস্ত্র বিপ্লবের ধারণা গণতন্ত্র সম্মত নয়। আলোচনার মাধ্যমে মতানৈক্য দূর করা, সমঝোতায় পৌছা, ও গ্রহণ বর্জনের নীতি গ্রহণ ছাড়া, শান্তি অর্জিত হবে না। সশস্ত্র বিজয় অর্জনের আশাবাদ বাস্তব নয়। এই দৃষ্টিতে অস্ত্র সম্বরণ আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদন প্রশংসনীয় সঠিক কাজ। পরিস্থিতিকে আরো সহজ করার পথ অবলম্বন দরকার। আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রশ্নে বিরোধীতা ও যথাযথ। বিষয়টি সাংবিধান সম্মত নয়। সাংবিধানিক বিধির আওতায়, স্থানীয় জেলা পরিষদের সংস্থান হয়েছে। নীতিগতভাবে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রতিও উভয় পক্ষ অঙ্গিকারাবদ্ধ। তবে এই ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় মাথাভারি আর অতিরিক্ত আর্থিক দায়সম্পন্ন। তদুপরি শান্তি স্থাপক ও নয়, এটাই প্রধান বিবেচ্য। স্থানীয় সরকার নয়, জেলা পরিষদ আইনে সামান্য সংশোধনীর ব্যবস্থা করে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের সংস্থান করা হয়েছে। সাংবিধানিক আইন ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী নয়, জনসংহতি সমিতিকে এ ধারণা দান, সরকারেরই দায়িত্ব। অন্যান্য প্রশ্নেও নমনীয় ও কৌশলপুর্ণ অবস্থান নেওয়া আবশ্যক। তবু এ বলা যৌক্তিক যে, এখন পার্বত্য সংকট সমাধানের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান রাজনৈতিক সংকট তার কঠিন অবয়বের ভিতর, অজান্তে অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে সরল সহজ সমাধানের দিকে এগিয়েছে এবং এগুবে। এ আশাবাদ পোষনযোগ্য। এটা কোন অতিশয়োক্তিও নয়। উপজাতীয় আন্দোলনের রক্তাক্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ এখন আর অবশিষ্ট নেই। ওটা আগের

সংবিধান অমান্যতার একগুয়েমী ও পরিহার করেছে। গণতন্ত্রকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করায় জনসংহতি সমিতিকে এখন আর মুখ্যতঃ গোয়ার সংগঠন ভাবার অবকাশ ও নেই। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপুর্ণভাবে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌছাতে ও হানাহানির স্থায়ী অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে সমিতি স্বউদ্যোগে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এই সদিচ্ছাটি খোলাখুলি ঘোষণার মাধ্যমে নীতি হিসাবেও গৃহীত যথা ঃ

'(ক) এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়, তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতাধীন জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ শান্তিপুর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য।'

(সূত্র ঃ জনসংহতি সমিতির জরুরী বিজ্ঞপ্তি নং ৩১-১০-৯১)

'(খ) (সমিতি) চায় সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা অতিদ্রুত গতিতে অবসান করে সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গনতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সামিল হতে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসন ও অধিকার ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধনসহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, সংহতি, সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস-প্রথা, প্রবাদ, ভাষা, ঐতিহ্য, ভূমির অধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে না। (সূত্র ঃ ঐ)

এই সর্বশেষ ঘোষিত নীতি ও অঙ্গিকার সুত্রে বিরোধের আকার আয়তন এখন সীমিত। এখন মাত্র বুঝার অভাবেই ব্যাপারটি জটিল। কার্যতঃ মীমাংসার পটভূমি রচিত হয়ে গেছে। এখন মীমাংসা না হওয়া বা তাতে সফল হতে না পারা হবে দুঃখজনক ব্যর্থতা। আপনা আপনি গড়ে ওঠা সাফল্যকে অগ্রগতি হিসেবে টিকিয়ে রাখা এবং তাকে পরিপূর্ণ মীমাংসায় পরিণত করতে পারাকেই কৃতিত্ব জ্ঞান করা যাবে। জনসংহতি সমিতির পক্ষে এখন পিছিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই। সরকার পক্ষ অনুকূল অবস্থান অর্জন করেছেন। এই অবস্থানকে অগ্রগতির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ আছে।

বাংলাদেশের সংবিধান বিশুদ্ধ এককেন্দ্রিক। এর বিপরীতে জনসংহতি সমিতির মুল দাবি বিশুদ্ধ যুক্ত রাষ্ট্রীয়। এই সাংবিধানিক সংঘাত, সংশোধিত দাবীতে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত নেই। এই দাবীতে এককেন্দ্রিকতার সাথে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নীতির সামঞ্জস্য বিধান চাওয়া হয়েছে। এর অর্থ এক কেন্দ্রিকতা পরিহার নয়, এখন এই নীতি অবস্থান ঠিক রেখে, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন বিধিসম্মত কি না, তার পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার বিশ্লেষণ হতে পারে।

ব্যবস্থাটি সাংবিধানিক মূলনীতিকে ক্ষুণ্ন করে কিনা এ প্রশ্নটির উত্তর পেতে হবে। এই আইনগত প্রশ্নটির মীমাসার ক্ষেত্র রাজনৈতিক অঙ্গন নয়, বিশেষজ্ঞ আইনজ্ঞ সভা ও সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রশ্নে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হবে ঃ সংশোধন সাপেক্ষ মূল

এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাই আপাততঃ মান্য। এই পর্যায়ে বিকল্প হলো স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ও জেলা পরিষদগুলোর গ্রহণযোগ্য রূপরেখা পুনরনির্ধারন করা, যাতে বিধি সম্মত ব্যবস্থা হিসাবে, তৎপ্রতি জাতি সম্মতি প্রদান করে। কিন্তু এর অর্থ কোনক্রমেই কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে পরিহার বা খর্ব করা নয়। সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রই সমুদয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। স্থানীয় শাসন ক্ষমতাই অঞ্চল বা অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য। ১২-৫-৯২ তারিখে প্রদত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাগড়াছড়ি ভাষণে সাংবিধানিক মীমাংসার প্রস্তাব ছিলো। তারই অনুকরণে জনসংহতি সমিতি স্বীয় দাবীনামা সংশোধন ও অস্ত্র বিরতির ঘোষণা দেয়। সুতরাং ওটাকে সাংবিধানিক মীমাংসার পক্ষে পদক্ষেপ ভাবাই সঠিক। এ প্রশ্নে এ বলা ঠিক নয় যে আঞ্চলিক পরিষদের প্রয়োজন নেই। জনসংহতি সমিতির পক্ষে প্রদত্ত এর প্রত্যুত্তরটিও অন্ধ ধারণার অভিব্যক্তি, যাতে বলা হয়েছে ঃ তাতে তাদের দাবীটি পূরণ হয় না।

আরেক আশাব্যঞ্জক কথা হলো ঃ গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই বিরোধীয় অঞ্চল নয়। জনসংহতি সমিতির দাবিকৃত আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের এখতিয়ার থেকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল মুক্ত। সমিতি স্বীয় দাবী নং ২ ৫/ক) ও ২(৫/খ) তে এর বর্ণনা প্রদান করেছে যথা ঃ

'দাবী নং ২ (৫/ক)

কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতুবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল, পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।'

'দাবী নং ২ (৫/খ)

'কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা।'

(সূত্র ঃ সংশোধিত দাবীনামা)

চুক্তিতে ও জেলা পরিষদ আইন ৬৪ তে এই বক্তব্য গৃহীত হয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও স্থানীয় প্রশাসনিক অঞ্চলের আয়তন হয় নিম্নরূপ, যথা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় অঞ্চল ঃ

১। কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা +

২। বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এরাকা +

৩। রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা=আনুমানিক

১০.০০ বর্গমাইল

৪। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ঃ ক) রাষ্ট্রীয় বন ঃ ৩১৬৬.০০ বর্গমাইল

খ) কর্ণফুলী হ্রদ (অধিগ্রহণ কৃত) ঃ ২৫৬.০০ বর্গমাইল

গ) সংরক্ষিত বনাঞ্চল (ঐ) ঃ ১২২০.৯৬ বর্গমাইল

মোট কেন্দ্রীয় অঞ্চল ঃ ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল
ঘ) স্থানীয় শাসিত অঞ্চল (গ্রামাঞ্চল) ঃ ৪৪০.০৪ বর্গমাইল
সর্বমোট আয়তন ঃ ৫০৯৩.০০ বর্গমাইল

হিসাবটিকে শুভঙ্করের ফাঁকি মনে হওয়া, এবং তাতে প্রতিকূল ক্ষুব্ধ অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটাও সম্ভব। কিন্তু এটি আসলে এই লেখকের স্বকপোল কল্পিত অপব্যাখ্যা নয়। অধিগ্রহণ বহির্ভূত অঞ্চলই সমিতির দাবীভুক্ত এলাকা হওয়ায়, বসতি সহ তার আয়তন মোট ৪৪০.০৪ বর্গমাইলই হয়। বাকি ৪৬৫২-৯৬ বর্গমাইল প্রকৃতই কেন্দ্রীয় অঞ্চল। চট্টগ্রাম থেকে এতদাঞ্চলের পৃথক জেলা হিসাবে বিভক্ত হওয়ার পর সেই ১৮৬৫ সালের এক্ট নং-৭ ধারা নং ২ যথা ঃ কালকাতা গেলেট ১লা ফেব্রুয়ারী-১৮৭১ খ্রীঃ সমুদয় বন ও পাহাড়, কেন্দ্র শাসিত খাস অথবা সংরক্ষিত। কর্ণফুলী হ্রদভুক্ত এলাকাটিও ১৯৫৬ সালে অধিগ্রহণকৃত। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় প্রয়োজনের সুনির্দিষ্ট কারণে কেন্দ্রীয় বন আইন, আবগারী আইন, মৎস্য আইন, ও শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রন আইনে, বর্ণিত অঞ্চলগুলো স্থানীয় নয়, জাতীয় সম্পদ বা সম্পত্তি। এবং এ হিসাবে দীর্ঘকাল যাবৎ নিয়ন্ত্রিত। এই কেন্দ্রীয় মর্যাদা প্রশ্নাতীত। এটা বিতর্কিত বিষয় নয়। তবে জেলা প্রশাসকেরা একাধারে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসক হওয়ার দ্বৈত ক্ষমতাবলে, তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের আবাদযোগ্য অনেক এলাকাই, অস্থায়ী ভিত্তিতে বন্দোবস্তি প্রদান করেছেন। ওটা বসতিতে পরিণত হয়েছে, তবে আইনতঃ বন থেকে অবমুক্ত হয়নি। বাস্তবে এই সব আবাদী অঞ্চল অবমুক্ত ধরা যায়, যা মূল বসতি অঞ্চলের অংশ। এই যোগ বিয়োগের ভিত্তিতে অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের প্রায় অর্ধেক এলাকাই বসতি অঞ্চলে পড়ে। তাতে স্থানীয় শাসনাধীন এলাকার আয়তন নিম্নাকারে বৃদ্ধি পাবে যথা ঃ

ক) স্বীকৃত বসতি অঞ্চল ৪৪০.০৪ বর্গ মাইল
খ) অশ্রেণী ভুক্ত বনের বসতি অঞ্চল (৩১৬৬/২)=১৫৮৩.০০ বর্গমাইল সুতরাং স্থানীয় শাসনযোগ্য অঞ্চল সর্বমোট ২০২৩.০৪ বর্গমাইল মাত্র।

এই স্থানীয় আয়তন তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় এলাকার অংশের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে। এই আনুমানিক আয়তনের পরিমাণে প্রকৃত বসতির ভিত্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাও সম্ভব।

যেহেতু একটি বিব্রতকর রাজনৈতিক জটিলতার উভয় পাক্ষিক মীমাংসাই কাম্য, সেহেতু দাবীপূরণ ও ছাড় দানের পক্ষে উভয় পক্ষকে নমনীয় হতে হবে। মূল লক্ষ্য হবে ঃ জয়-পরাজয় নয়, শান্তি স্থাপন। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলাভুক্ত উপরোক্ত আয়তন বিশিষ্ট অঞ্চলই মাত্র, তিন জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের বিষয় ভিত্তিক এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমুদয় ও সামগ্রিক পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিষদীয় এখতিয়ারে পড়ে না। আঞ্চলিক পরিষদের কোন স্থিতিভূমিও নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক ইউনিট নয়। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদ প্রশাসনিক

ইউনিট হীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত। এ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বাধা হলো অনুচ্ছেদ নং ৫৯ যথা ঃ

'বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৫৯ (১)।
আইনানুযায়ী নির্ধারিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।'

৪। পার্বত্য চুক্তির হিসাব নিকাশ।

পার্বত্য চুক্তির অতি উৎসাহী নাম শান্তিচুক্তি। এখন দিন যত যাচ্ছে উৎসাহে যেন তত ভাটা পড়ছে। প্রথম পক্ষ আওয়ামী লীগ ও তার সরকার, দ্বিতীয় বছর ১৯৯৮-এর ২ ডিসেম্বরের বছর পূর্তি অনুষ্ঠান থেকেই একলা চলার নীতি অনুসরণ শুরু করেছে। দ্বিতীয় পক্ষ পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ও ক্ষোভের সাথে সে থেকে নিঃসঙ্গ। এ থেকেই অনুমান করা যায়,উভয় পক্ষ চুক্তির মূল্যায়নে এখন পৃথক মত ও পথের অনুসারী। উভয় পক্ষ এখন নিজস্ব কৌশল নিয়ে অগ্রসরমান। কে কাকে গোল দিবেন, সে চিন্তাই প্রকট। এ না হলে শুরু থেকেই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, নীতি কৌশল নির্ধারণ ও বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ইত্যাদি, উভয়ের মিলিত উদ্যোগে এক সাথে অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে উভয়ের প্লেট ফরম পৃথক।
শুরুতে জনসংহতি নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় আতিথ্য আর ভি ভি আই পি মর্যাদায় বরিত ছিলেন। তারা ছিলেন দেশে বিদেশে মুখ্য আলোচ্য ব্যক্তিত্ব। চুক্তি স্বাক্ষরের পর সে মর্যাদা ঘটতে শুরু করে। মুখ্য হয়ে দাঁড়ান আওয়ামী সরকার প্রধান শেখ হাসিনা। এখন জনসংহতি নেতৃবৃন্দ একেবারে উহ্য হওয়ার পর্যাযে উপনীত। প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন স্থানীয় পরিষদীয় একেকটি পদ মাত্র, তাদের সান্ত্বনার আশ্রয়। যে পদগুলোর কোন স্থায়িত্ব পর্যন্ত নেই। সরকারের ইচ্ছা খুশির উপর এগুলো ভাসমান।

জনসংহতি নেতৃবৃন্দ নিজেদের ঠুনকো অবস্থানের কথা বুঝতে পেরেছেন। তারা এও বুঝতে পেরেছেন যে, এখন তারা আওয়ামী ফাঁক ও ফাঁকিতে আবদ্ধ। বাড়াবাড়ি করলে সরকারী গাড়ি-বাড়ি, বেতন-ভাতা আর পদগুলো হারাতে হবে। একেবারে নিশ্চুপও থাকা যায় না। তাই ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদের কাই কুঁই চলছে। সরকার, তাতে খুব মনক্ষুণ্ন নন। ভাবছেন আস্তে আস্তে বিদ্রোহী মিজাজ ঠান্ডা হয়ে যাবে। সরকারের পক্ষে সন্তু বাবুদের মোকাবেলা করছেন স্থানীয় উপজাতীয় মন্ত্রী ও এমপিরা। এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। নিজেদের দাবীতে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য মন্ত্রণালয়ই এখন হয়ে গেছে তাদের পক্ষে কাল।

জনসংহতি সমিতির উপর থেকে আওয়ামী লীগ ও তার সরকারের উৎসাহ হারাবার কারণ এটাই যে, সমিতি তাদের ধারণা মত বশংবদে পরিণত হয়নি। তারা পদ ও

অনুগ্রহ পাওয়া সত্ত্বেও কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে প্রতিবাদী। সরকারের ভিতর তারা যেন আরেক প্রতিপক্ষ ক্ষুদ্র সরকার। তবে সরকার ধৈর্য্যের সাথে সামলে চলছেন। এই মুহূর্তে দমনের পদক্ষেপ নিলে চুক্তির দ্বারা অর্জিত অনুকূল ভাবমুর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটাই ভাবনা। তবে উভয়ের সম্পর্কে যে চীড় ধরেছে তা নিশ্চিত। বিএনপি ও এই ধরায় চলমান।

আসলে চুক্তি হলো প্রতিপক্ষের জন্য একটি মূলো, যাকে দূর থেকে দেখা যায়, শোঁকা যায়, তবে ধরা যায় না। এ থেকে লাভ মাত্র কটি শূণ্য গর্ভ পরিষদ, কতিপয় পদ, ভি, আই, পি, মর্যাদা, গাড়ি-বাড়ি ও বেতন-ভাতা এবং তাও অস্থায়ী ভাসমান। এতে সন্তুষ্ট না হলে তা ছেড়ে ছুড়ে আবার বিদ্রোহে যাওয়া, যা এখন আর সহজ নয়। প্রবীণদের শক্তি সামর্থ শেষ। এ কাজে নতুনদেরই সম্ভাবনা। সুতরাং এখন তাদের নিরুপায় তর্জন গর্জনই সার। নিশ্চিত আয়েশ ও মর্যাদাপুর্ণ জীবনই তাদেরকে টেনে রাখছে। ঝুঁকিপুর্ণ বিদ্রোহী জীবন তাদেরকে আর আকৃষ্ট করতে পারছে না। বিদ্রোহ যদি পুনরায় সংগঠিত হয়ও তখন তাতে তারা হবেন অনুপস্থিত। বন্দী আহত ব্যাঘ্রের মত তারা কেবল অভ্যাসগত হালুম-হুলুম করছেন ও করবেন।

চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সুবিধা-সুযোগের ফিরিস্তি দীর্ঘ। তবে তার অধিকাংশই সারশূণ্য। তদুপরি চুক্তির স্থায়িত্বটাও সন্দেহজনক। ক্ষমতার কাল বদল নিকটবর্তী। আগামীতে আওয়ামী লীগ ক্ষসতাসীন হলেও ইতিমধ্যে তার উপজাতি সংক্রান্ত কিছু মতের বদল ঘটে গেছে। সে তার নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশলেই চলছে। জনসংহতি সমিতিকে সে নিজের বিপক্ষে ক্ষমতায় বসাবে, সে আশা করা যায় না। আর যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিপক্ষের হাতে চলেও যায়, তখন এই চুক্তির ভবিষ্যৎ হবে আরো অনিশ্চিত। বিএনপি সংলাপ ও চুক্তিকে শুরু থেকেই সন্দেহ করেছে। জাতীয় পার্টি কেবল জেলা পরিষদ স্থাপন পর্যন্ত আগ্রহী। জামাত তা সরাসরি নাকচের পক্ষপাতী। অন্যান্য ক্ষুদ্র দলের সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান তেমন ধর্তব্যের বিষয় নয়। চুক্তিপক্ষের একমাত্র আওয়ামী লীগও যদি, জনসংহতি সমিতিকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন চুক্তির উপজাতি ঘেষা রূপ পাল্টে যেতে সময় লাগবে না। আওয়ামী সমর্থক উপজাতিরাই তা পাল্টে দিতে প্রধান ভূমিকা নিবে বলা অত্যুক্তি নয়।

চুক্তি নিয়ে আওয়ামী পক্ষের উল্লাস যথার্থ। এর দ্বারা দেশে–বিদেশে তাদের পক্ষে অনুকূল ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। তাদের নেত্রী ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিদ্রোহী শান্তিবাহিনী অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে। ভারতে আশ্রিত শরণার্থীরা ফিরৎ এসেছে। এখন বিদ্রোহী নেতারা বিভিন্ন পদ ও সুযোগ-সুবিধার আওতায় সরকারের মুঠোয় আবদ্ধ। এগুলো অবশ্যই উল্লাসযোগ্য সাফল্য। এর বিপরীতে চুক্তিতে কিছু বাড়াবাড়ি থাকলেও সম্পুর্ণ চুক্তিটাই ঠুনকো। জাতীয় স্বার্থে তাতে রদবদল ঘটানো তো অতি সহজ কাজ।

প্রধান সমস্যা ছিলো বিদ্রোহ। চুক্তির মাধ্যমে তাতে ধস ধরান গেছে। এটা এক অনন্য সাফল্য। তাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এর বিপরীতে চুক্তিতে নিহিত দোষ-ত্রুটি, স্থায়ী কোন সমস্যা নয়। জাতি তা সংশোধন বা বাতিলের সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে। বর্তমানের নগদ সাফল্যকে অবশ্যই আওয়ামী রাজনৈতিক উপহার বলে ভাবা যায়। এ জন্য তাদের প্রশংসা প্রাপ্য। তবে চুক্তির দোষ-ত্রুটি সংশোধিত না হলে, এই গোটা কার্যক্রমটাই হবে নিন্দাযোগ্য নতজানু রাজনীতি।

চুক্তিতে নিহিত প্রধান ত্রুটি হলো ঃ

ক) চুক্তিটি, উপজাতীয়তাকে পুরস্কৃত, বৈষম্যকে বৈধ আর গণতন্ত্রকে সাম্প্রদায়িক সুবিধাবাদে পরিণত করেছে।

খ) এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের জন্ম দান করেছে, অথচ বাস্তবে এ নামের কোন প্রশাসনিক অঞ্চল বিদ্যমান নেই। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি শূণ্য, যার উপর নির্ভরশীল দ্বিতীয় শূণ্য হলো আঞ্চলিক পরিষদ। এই সংযোগ ও সংস্থান অকার্যকর। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ ও ৫৯ এ রূপ শূণ্য অবস্থানকে ক্ষমতার কেন্দ্ররূপে অনুমোদন করে না।

রাজস্ব বিভাগীয় হিসাব ১৮৭৫ খ্রীঃ

বিঃ দ্রঃ এই হিসাবে চট্টগ্রামের কক্সবাজার ও মিজোরামের দেমাগীরি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

সুত্র ঃ উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা ২য় সংখ্যা, জুন ১৯৮৪ তে লিখিত, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের প্রয়াত ডাইরেক্টর বাবু সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্বের ইতিহাস। (ছকটি লেখক কর্তৃক সজ্জিত)।

৫। সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ।

অধ্যাপক পিয়ের বেসানেত স্বীয় পুস্তক ঃ ট্রাইবস ম্যান অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এর ১ম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন ঃ 'অনুমান করা হয়, অতীতের কুকি নামে পরিচিত লোকজন, ম্রো ও ছোট ছোট কিছু উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী। এখানে চাকমা ও মগদের আগমন তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।

ছোট ছোট দলের মধ্যে বনযুগী, পাংখো ও লুসাইদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে ...মনে হয় এরা সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধর.....। আর একটি ছোট দল খিয়াং.....বার্মার চীন ও এদের উৎপত্তি একই। ....অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চীনেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে হানা দিতে শুরু করে। ম্রোরা.....লুইনের মতে আরাকান থেকে এসেছে।.....টিপরারা উত্তরের ত্রিপুরা পাহাড় থেকে আস্তে আস্তে দক্ষিণের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। মারমা বা মগেরা মূলতঃ আরাকান থেকেই স্থানান্তরিত।

'অনুমান করা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বর্মী আক্রমণের ফলে,

আরাকানের দুই তৃতীয়াংশ লোকই পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে আসে।.....পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ছোট দলগুলোর মধ্যে চাক, সেন্দু বা লাখেরদের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু ওদের সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়।'

'চাকমারা মঙ্গোলীয় জাতির সম্ভবতঃ আরাকানী গোত্র থেকে উদ্ভুত লোক। তারা প্রধানতঃ তিনটি শাখা উপজাতিতে বিভক্ত যথা ঃ (১) চাকমা (২) দৈংনাক ও (৩) টুংটুঙ্গা। প্রায় শতাব্দী কাল আগে দৈংনাকেরা মূল উপজাতি থেকে পৃথক হয়ে আরাকানে পালিয়ে যায়। সম্প্রতি তাদের কেউ কেউ.....ফিরৎ এসেছে। টুংটুঙ্গারা এমন কি ১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত আরাকান থেকে এখানে চলে আসে...... ।'

এটা নিঃসন্দেহ যে, মোগল আমলে চীন পাহাড়ের এলাকাবাসী কিছু চাকমা, তথাকার রাজশক্তি ও মগ বাসিন্দাদের দ্বারা উৎখাত ও বিতাড়িত হয়। তারা শরণার্থী হয়ে মাতামুহুরী নদী উপত্যকার আলী কদম, তৈন ছড়ি, বাঘ খালী ইদ্যাদি ১২টি গ্রামে আশ্রয় লাভ করে। ১৭৮৪ খ্রীঃ সালে ব্রহ্মদেশ ও আরাকানী রাজশক্তির পারস্পরিক যুদ্ধে, উৎপীড়িত ও ভীত, অধিকাংশ আরাকানবাসী, পালিয়ে এসে বাংলাদেশ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মাঝে মগ, চাকমা, মুরুং বনযুগী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক ছিল। ১৮১৮ খ্রীঃ সালে রাজা ধরম বখশ খাঁর সময় চাকমাদের অন্যতম বৃহৎ, গোষ্ঠী টুংটুংগ্যাদের বহুসংখ্যক লোক, জনৈক ফাপ্রু দলপতির অধীনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন করে। তারা চট্টগ্রাম শহরে রাজকুঠি নামে একটি বাড়ি রাজা ধরম বখশ খাঁকে বানিয়ে দেয়, যা বহুদিন ভাড়ায় মাননীয় কমিশনারের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। চাক ও দৈংনাকেরা বিতর্কিত দুটি আরাকানী সম্প্রদায়। বৃটিশ আমলে তারা অনেকে আরাকান থেকে পালিয়ে এসে দক্ষিণ-পূর্ব চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্বে আগত চাকমাদের মাঝে তারা চাকমা নামে বিলীন হয়ে গেছে। চাকমা প্রাচীন ইতিহাস মানে চাক ও দৈংনাকদের ও ইতিহাস। অবশ্য আরাকান ও ব্রহ্মদেশে তথাকার রাজ শক্তি ও মগ সম্প্রদায়ের হাতে চাকমাদের উৎপীড়িত হওয়ার কথা এখনো বহুল প্রচলিত চাকমা পল্লীগানে স্মৃতি হিসাবে গীত হয়।

ঐ বিখ্যাত গানটি, চাকমাদের আদি স্বদেশ চম্পক নগরের আকর্ষণ, মগদের উৎপীড়ণ ও আরাকান ত্যাগ এবং তাদের রাজা মইসাং-এর প্রতি ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করে। এটা তাদের অতীত ইতিহাসের এক জীবন্ত অভিব্যক্তি। তাতেই ব্যক্ত হয়, ব্রহ্মদেশ ও আরাকান থেকে বিতাড়িত চাকমারাই, এখানকার চাকমাদের পুর্ব পুরুষ। অন্যান্য প্রমাণসহ তাদের এই পরিচয়ের সাথে জড়িত শরণার্থীর মর্যাদা ঐতিহাসিক। রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কালের মোট ২৫১১০ জন চাকমা জনসংখ্যার পরবর্তী শতাব্দী কালের ব্যবধানে, অধুনা কয়েক লক্ষে বৃদ্ধি বাড় ঘটা, এবং সীমান্তবর্তী দেশে তাদের প্রায় লোপ পাওয়ার ঘটনা রহস্যজনক। এদেশে তাদের জন্মগত বৃদ্ধির স্বাভাবিক হিসাবেও গরমিল ধরা পড়ে। ১৮৭২ খ্রীঃ সালে গৃহীত

আদম শুমারীতে প্রাপ্ত মোট ২৫১১০ জন চাকমা জনসংখ্যার অর্ধেকাংশই মাত্র স্থানীয় ছিলো। লোক বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি তিরিশ বছরে একবার লোকসংখ্যা দ্বিগুণিত হয়। ১৯০১ খ্রীঃ সালে আদম শুমারীতে তাদের পূর্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৪৪৩২৯ হয়েছে। ১৯৫১তে হয়েছে ১২৪৭৬২ যা অস্বাভাবিক।

অভিযোগ করা হয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালী অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে। প্রত্যুত্তরে বলা যায় উপজাতীয়রাও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। তবে বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হলো, কর্ণফুলী বিদ্যুৎ প্রকল্প, চন্দ্রঘোনা কাগজ কল, বনজ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি বৃহৎ উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগের সাথে জড়িত বাঙ্গালী শ্রমিক ও কর্মচারীদের আগমন ও নিযুক্তি। এদের অনুসরণ করেছে, বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী যাদের সবাই ছিলো অস্থায়ী নাগরিক। এতদ সত্ত্বেও ক্ষমতার মূল কেন্দ্র বিন্দু অবাঙ্গালীদের হাতেই থেকে গেছে এবং বাংগালীরা অকুণ্ঠ চিত্তে প্রতিটি নির্বাচনে অবাংগালী প্রতিনিধিদের সমর্থন ও জানিয়েছে। ১৯৭৩ খ্রীঃ সালের জাতীয় নির্বাচনে রাঙামাটি বান্দরবন আসনে এই লেখক একমাত্র বাঙ্গালী প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও বাঙ্গালী অধ্যুষিত কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনা শিল্পাঞ্চলের ভোটারেরা পর্যন্ত অবাঙ্গালী সমাজভুক্ত প্রার্থীদের পক্ষে অধিক সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। বাঙ্গালীদের অনুরূপ উদার ও অসাম্প্রদায়িক অভিব্যক্তির বিপরীতে, অবাঙ্গালী পক্ষের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯০১ খ্রীঃ সালের ৪৪৩২৯ জনের চাকমা জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে, ১২৪,৭৬২ জনে স্ফীত হয়। এর অর্থ এই যে, যখন বাঙ্গালীদের কোন অনুপ্রবেশই ঘটেনি, তখনও চাকমা সম্প্রদায়ের ব্যাপক সমাবেশ ঘটেছে। ঐ বাড়তি চাকমা জনসংখ্যা এদেশে জন্ম প্রাপ্ত বৈধ নাগরিক, না বহিরাগত? চাকমা রাজাদের জুমিয়া প্রজা রেজিষ্টার ও জেলা প্রশাসক মিঃ পাওয়ারের লিখিত চিঠি নং ৪৭২ তাং ১৭ই জুন ১৮৭৫ খ্রীঃ এর তথ্যানুযায়ী জানা যায়, তখন ফেনী নদী উপত্যকায় চাকমাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। তদোতিরিক্ত এই জেলায় করদাতা ১৭৯৬ পরিবার ও নিস্কর ১৮৯ পরিবার। পরিবার পিছু পাঁচ জনের গড় হিসাবে তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায়=১২৯২৫ জন। ১৮৭২ খ্রীঃ সালের আদম শুমারী মতে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্য মিলে সর্বমোট চাকমা জনসংখ্যা ২৮০৯৭ জন। সুতরাং দেখা যায় ২৮০৯৭-১২৯২৫=১৫১৭২ জন তথা অর্ধেকের বেশী চাকমা বহিরাঞ্চলবাসী। তদুপরি আরাকান ও মিজোরাম অঞ্চল তখনো চাকমামুক্ত ছিলো না। প্রশাসনিক বিবরণে অবগত হওয়া যায়, উনবিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকে বড়কল-সাজেক সীমান্তের দেমাগ্রী অঞ্চলকে লুসাই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা নিকটবর্তী চাকমা অধ্যুষিত কর্ণফুলী নদী উপত্যকার অংশও যথেষ্ট সংখ্যকভাবে চাকমা বসবাস সমৃদ্ধ ছিলো। আরাকান ও চীন পাহাড় অঞ্চলের বাসিন্দা চাক বা থেক, টুং টুঙ্গ্যা ও দৈংনাকেরা, ইতিহাসের বিবরণ অনুযায়ী, গত শতাব্দী ও তার আগে, বহুবার এদেশে পাড়ি জমিয়েছে। সুতরাং সেখানে তাদের আরো লোকের থাকা প্রমাণিত। ১৯০১ খ্রীঃ সালে গৃহীত আদম শুমারীর বিবরণই প্রমাণ যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যথেষ্ঠ পরিমাণ

চাকমার অধিবাস ছিলো। এমতাবস্থায় এতদাঞ্চলে চাকমাদের অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ঐ তাদেরই আগমন, তাতে সন্দেহ করার কিছুই নেই। তবে বহিরাগমন অতীতে কখনোও চিহ্নিত হয়নি। বাংলাদেশ আমলেও তা ঐ উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘটা অসম্ভব নয়। আরাকান লুসাই ও ত্রিপুরা অঞ্চল অতীতে চাকমামুক্ত ছিলো না বলেই এটা অনুমানভিত্তিক সন্দেহ মাত্র নয়। ১৯০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪৪৩২৯ জন চাকমার তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যবাসী ৪৫১০ জনের অনুপাত হলো তার প্রায় ১০%। ১৯৫১ খ্রীঃ সালে চাকমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সংখ্যা ১,২৪,৭৬২ জন হলে তার ১০% অনুপাতে; ত্রিপুরা রাজ্যবাসী চাকমাদের সংখ্যা হয় ১২৪৭৬ জন এবং ২০০১ খ্রীঃ সালে তার প্রায় দ্বিগুণ, অর্থাৎ মোটামুটি পঁচিশ হাজার। সুতরাং এতদাঞ্চলের চাকমাদের স্বাভাবিক জন্মহারের অতিরিক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটার উৎসমূল বাংলাদেশ সীমান্তের বাহিরে থাকা স্বাভাবিক। তদুপরি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লোক তাদের ভিতর লীন হয়ে গেছে।

১৯৫১ খ্রীঃ সালের পর বাঙ্গালীদের অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, সম্মিলিতভাবে চাকুরী, শ্রম, পেশা, ব্যবসা ও আবাসন। তবে ঐ সাল পর্যন্ত মূল স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দাদের সংখ্যা ২৬.১৫০ জন হওয়াটাও তুচ্ছ নয়। বিশেষতঃ এ কারণেই বাঙ্গালীদের ঐ সংখ্যা গুরুত্বপুর্ণ যে, তাদের অধিকাংশ ছিলো পেশাজীবী ব্যবসায়ী ও স্থায়ী কৃষিজীবী অধিবাসী এবং তাদের তুলনায় অবাঙ্গালীরা ২৬১৫৩৫ জন হলেও তাদের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ বাদে, জনসংখ্যার বৃহদাংশই ছিলো ভূমিস্বত্বহীন অস্থিতিশীল জুমিয়া। এ কারণে কার্যতঃ বাঙালীরাই ছিল প্রধান স্থায়ী বাসিন্দা। তারা অতঃপর জুমিয়াদের কৃষি প্রশিক্ষণ বন্দোবস্তি গ্রহণ ও ভূমিস্বত্ব লাভে, সহায়তা করেছে। এরাই জমি আবাদকারী স্থায়ী কৃষি ও পাড়া জীবনের প্রবর্তক মূল শক্তি। তাদের উপস্থিতি ও পরিশ্রম ব্যতীত, জুমিয়াদের এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পরিবেশই সৃষ্টি হতো না। ভূমি মালিকানা ও কৃষি জ্ঞানের অভাবে জুমিয়াদের উর্বর জুম ক্ষেত্রের অনুসরণে, দেশান্তরী হওয়ার ভাগ্য ছিলো অবধারিত। বাঙালীদের উদারতা গুণেই, এক কালের শরণার্থী জুমিয়া সমাজ আজ এদেশের অভিবাসী নাগরিক হলেও এখন এ মাটিতে দৃঢ়মূল।

সুবিধাবাদ, সমান গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে। তাতে এক পক্ষ বঞ্চিত হয়, বিপরীতে অপর পক্ষের প্রাপ্তির বৃদ্ধি ঘটে। যদ্বারা একের অসন্তোষ আরেকে স্থানান্তরিত হয়, মূল সমস্যার সমাধান হয় না। পক্ষপাতিত্ব মূলক সুবিধাবাদে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। বঞ্চনাপুর্ণ সুবিধাবাদে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, যা জাতীয় ঐক্যকে বিঘ্নিত, করে। স্থানীয় বাঙ্গালীরা এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার।

৬। উপজাতীয়দের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা বনাম প্রকৃত তথ্য

(ক) উপজাতিদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ দীর্ঘ পোষিত একটি বিষয়। সরকার প্রদত্ত শতাব্দী প্রাচীন সুযোগ-সুবিধা ভোগের ঐতিহ্যই তাদের উচ্চাভিলাষ পোষণের জন্য দায়ী। যদিও তখন সাধারণ লোক শ্রম দান ও দাসত্বে বাধ্য ছিলো, এবং কতিপয় সর্দার ও মাতবরই মাত্র শাসন ক্ষমতা ও আভিজাত্য ভোগ করেছেন। তবু ওটা উপজাতীয় আধিপত্য বলেই তাদের কাছে প্রতিভাত। জুতা পায়ে দেয়া, অলংকার পরা, পাকা বাড়ী-ঘর তৈরি, উচ্চ শিক্ষা লাভ, উন্নত আসবাবপত্র ব্যবহার, শিকারে প্রাপ্ত প্রাণীর নিরঙ্কুশ ভোগ ইত্যাদি অবাধ ছিলো না, তজ্জন্য নজরানা দিতে হতো। অভিজাতদের বিবাহে উৎসবে মদ, খাদ্য-শস্য, ও চাঁদা দান ইত্যাদি, সামাজিক বাধ্যবাধকতা, সাধারণেন জন্য পালনীয়, আর বিচার কাজে আরোপিত ফিস ও জরিমানা সর্দার মাতবরদের প্রাপ্য ছিলো। সামাজিক প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানে কর্তৃত্বের অধিকারে, অভিজাতেরা সাধারণের উপর দাসত্ব চাপিয়ে দিতেন। তাদের উক্ত আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাদিতে সরকার হতেন নিরপেক্ষ। অথচ এ সব আচরণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পরিপন্থী বিধায়, নিষিদ্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উপজাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের ৫ দফা দাবী নামায় এসব দাসত্বমূলক প্রথা ও অভ্যাসকে চর্চার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আধুনিক যুক্তিবাদীদের পক্ষে এসব সমর্থনযোগ্য নয়। সামন্তবাদী ও দাসত্ব মূলক প্রথা ঐতিহ্য, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পোষণযোগ্য নয়। তাতে উচ্চ নীচ মর্যাদার চর্চা হয়। ঐতিহ্য হিসাবে অতীত কর্মকান্ড আকর্ষণীয় হলেও তখনকার সব আচরণ এখনকার যুগোপযোগী নয়। সম্প্রতি সমিতির অস্ত্র বিরতি ঘোষণায় একটি ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে তা সংশোধিত হওয়া উচিত। বক্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

'সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার, কার্পাস চুক্তি ভঙ্গ করে, ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয় এবং স্বাধীন রাজার শাসন খর্ব করে দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে দেয়'
(সূত্র ঃ অস্ত্র বিরতি ঘোষণা পৃঃ ১ তাং ১-৮-৯২)
এই বক্তব্যটির সাথে নিম্নোক্ত ধারণাগুলো জড়িত যথা ঃ
১। বৃটিশ পূর্বকালে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার বলে উপজাতীয় পক্ষ মোগলদের সাথে একটি কার্পাস চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।
২। ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তি, সেই স্বাধীন সার্বভৌম উপজাতীয় রাজ্য দখল করে, তা ১৮৬০ সালে বৃটিশ ভারতের অঙ্গিভূত করে।
৩। ১৮৬০ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো উপজাতীয় রাজাদের অধীন স্বাধীন উপজাতীয় রাজ্য।
৪। উপজাতিরা জুমিয়া জাতিত্বের পৃথক পরিচিতির অধিকারী।

এখন দেখতে হবে এ ধারণাগুলো কি সঠিক? নেহাত অপ্রিয় হলেও বিতর্কটি অপরিহার্য। সত্য তথ্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অনিচ্ছা সত্বেও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দান আবশ্যক। উপজাতীয় আন্দোলনের যৌক্তিক শক্তি ও দুর্বলতা বুঝার পক্ষেও এটা যাচাই করা জরুরী।

প্রথম ধারণাটি একটি অতি উৎসাহী কিংবদন্তিমূলক বক্তব্যের অংশ। রাজা ভুবন বাবু সহ বিভিন্ন উপজাতীয় পন্ডিত এ ধারণাটির উপস্থাপক, এবং এটাই জনসংহতি সমিতির এতদ সংক্রান্ত দাবির ভিত্তি। উপজাতীয় পন্ডিতদের একদল মনে করেন, জনৈক চাকমা রাজা ফতেহ খাঁ, মোগল সম্রাট ফররুখশিয়ার ও মোহাম্মদ শাহের সাথে একটি তুলা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। আরেক দলের দাবী হলো ঃ চাকমা রাজা জুবাল খাঁ ওরফে জালাল খাঁ, চট্টগ্রামের মোগল শাসক মীর হাদির সাথে ঐ চুক্তিতে উপনীত হোন। তুলা চুক্তির দাবীদার ঐ দুই পক্ষের কেউই সুত্র হিসাবে কোন সনদ বা চুক্তিপত্রের কোন নকল উপস্থাপন করেন নি। অথচ মোগল কর্তৃপক্ষ সকল বন্দোবস্তি ও ফরমান, লিখিত দলিল বা সনদ আকারে সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষদের তা সরবরাহের নীতিতে যত্নশীল হতেন। এখনো সে আমলের খান্দানী পরিবারদের হাতে অনুরূপ প্রত্ন নিদর্শন গৌরবের স্মারক হিসেবে রক্ষিত আছে। তুলা চুক্তির ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম হওয়া সন্দেহজনক। তদুপরি প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী পণ্যের পরিমান তুচ্ছ ১১ মনে সীমাবদ্ধ, যা ভারত সম্রাট মোগলদের পক্ষে চুক্তিযোগ্য বলে স্বীকার্য্য নয়।

চাকমা রাজবাড়ীতে রক্ষিত সীলমোহরের তালিকায় রাজা ফতেহ খাঁর সীল মোহরটিও আছে। আরবী বর্ণে খোদাইকৃত ঐ সীলমোহরের ভাষ্য অনুযায়ী তার কার্যকাল ১৭৭১ খ্রীঃ সালে শুরু। মোগল আমলের ইতিহাস বলে, মোগল রাজ পুত্র ফররুখশিয়ার ১৭১৩ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত সুবে বাংলার রাজমহলে রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। তার দাদা ভারত সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে, সিংহাসন দখলের পারিবারিক কলহের এক পর্যায়ে যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি রাজধানী দিল্লী দখল করেন, এবং সম্রাট ঘোষিত হোন। ১৭১৯ খ্রীঃ সালে বিষ প্রয়োগে তিনি নিহত হলে, তদীয় পিতৃব্য পুত্র মোহাম্মদ শাহ রাজপদ লাভ করেন। সুতরাং বৃটিশ আমলের লোক ফতেহ খাঁর পক্ষে, ঐ মোগল সম্রাটদের সাক্ষাৎ লাভ সম্পুর্ণ অসম্ভব।

বর্ণিত ফহেত খাঁ সম্বন্ধে আরেকটি বিভ্রান্তি হলো ঃ চাকমা-রাজ-কিংবদন্তিতে তাকে ঐ বংশেরই শের মস্ত খাঁ, রহমত খাঁ ও শের জান খাঁর পিতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে তিনি রাজা জুবাল খাঁ ওরফে জালাল খাঁর স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী চাকমা রাজা। অথচ প্রখ্যাত পন্ডিত ও ঐতিহাসিক ডঃ এ, এম, সিরাজুদ্দিন স্বীয় গবেষণা প্রবন্ধ 'অরিজিন অফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস' এ অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন, দক্ষিণ চট্টগ্রাম সীমান্তের পৃথক সামন্ত পরিবার চন্দন খাঁ বংশের শেষ ব্যক্তি ছিলেন ঐ জালাল খাঁ। তার কার্যকাল গুলো ১৭১৫-২৪ খ্রীঃ এই দশ বছর। অবাধ্যতার কারণে তিনি দোহাজারীতে নিযুক্ত মোগল সেনা নায়ক

কৃষণ চাঁদ কর্তৃক বিতাড়িত হোন, এবং আরাকানে মৃত্যুবরণ করেন। এর ১৩ বছর পর ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে আরেক স্বদেশ ত্যাগী আরাকানী অভিজাত, যাকে শের মস্ত খাঁ ও আদি চাকমা রাজা বলে অভিহিত করা হয়, কিছু সঙ্গী সাথীসহ আরাকান ছেড়ে চট্টগ্রামে আসেন ও তথাকার মোগল শাসক জুলকদর খানের আনুকূল্যে কোদালা উপত্যকায় কিছু পতিত খাস পাহাড়ী জমি বন্দোবস্ত ও পূর্বাঞ্চলবাসী পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুম খাজনা আদায়ের তহসিলদারী লাভ করেন। সুতরাং ৩৪ বছরের পরবর্তী অর্বাচীন ফতেহ খাঁর পক্ষে, ঐ শের মস্ত খাঁর পিতা, আর তিনি চন্দন খাঁ বংশের সাথে ঐ শের মস্ত খাঁর বংশের সম্পর্ক রচনার যোগসুত্র হওয়ার দাবী করা, সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। সীল মোহর অনুযায়ী ফহেতা খাঁ হলেন শের মস্ত খাঁর স্ববংশীয় ৪র্থ অধঃস্তন পুরুষ। রাজ কিংবদন্তি অনুযায়ী সাথুয়া রাজার পুত্র চানান খাঁ ও রতন খাঁ, এবং রাজা মোগল্যার পুত্র জুবাল খাঁ ও ফতেহ খাঁ, অথচ অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন প্রদত্ত তথ্য মতে চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ পরস্পর সম্পর্কে পিতা পুত্র। রতন খাঁর পুত্র কাট্যুয়াই জালাল খাঁর পিতা। প্রামাণ্য সুত্রে ফতেহ খাঁ হলেন শের জব্বার খাঁর পুত্র, এবং শের জব্বার খাঁ শের মস্ত খাঁর জ্ঞাতি ভাই। এই সুত্রে কথিত সহোদর ভাই হিসেবে ফতেহ খাঁর পক্ষে ৪৭ বছর পরে জালাল খাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া সমর্থিত হয় না। এই অসঙ্গতিগুলো আলোচ্য ধারণাটির বিভ্রান্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তদুপরি অতিরিক্ত একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়ঃ মুসলিম নাম ও খেতাবে পরিচিত ঐ অভিজাতদের অমুসলিম চাকমা হওয়া কি নিশ্চিত? এর অনুকূলে কোন প্রমাণ উথাপন যোগ্য নয়। শুধু রূপ কথা আর ভাবাবেগই ইতিহাস নয়। যদি বলা হয়, তারা প্রকৃতই মুসলমান ছিলেন এবং চাকমারা ছিলেন তাদের প্রজা, তাহলেও কোন যৌক্তিক জবাব পাওয়া কঠিন হবে। এই প্রশ্নে কোন কোন উপজাতীয় মহলের চিরাচরিত জবাব হলো ঃ ঐ মুসলিম নামকরণ প্রাচীন আমলের মুসলিম সমাজ ও শাহী প্রভাবেরই ফল। কিন্তু এরও জবাব হলো ঃ মুসলিম প্রভাবিত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আমল দীর্ঘ হলেও তাতে এর ব্যতিক্রমই হচ্ছে। অধিকন্তু চন্দন খাঁ বংশের সময়কাল ১৭১১-২৪ এই তের বছর অবশ্যই মুসলিম প্রভাবিত আমল, কিন্তু তাদের চাকমা রাজবংশভুক্ত হওয়া প্রমাণিত নয়। আদি চাকমা রাজা শের মস্ত খাঁ সোনা বি ও শের জব্বার খাঁ সহ তিন পুরুষই মাত্র মোগল আমলের লোক, যাদের সময়কাল ১৭৩৭-৬৫ এই ২৮ বছর কাল দীর্ঘ। কিন্তু তাদের জন্মস্থান ও আদি বাসস্থান হলো আরাকানের রোসাং। এটা চাকমা লোকগীতি ও শের জব্বার খাঁর সীল মোহরের দ্বারা প্রমাণিত। এমতাবস্থায় তাদের শৈশবের নাম করণের স্থান আরাকান মুসলিম রাজকীয় প্রভাবমুক্ত ছিলো বলেই ভাবা যায়। পরবর্তী সাতজন রাজার মুসলিম নামকরণে সে প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য নয়। তারা বৃটিশ আমলের লোক। হতে পারে তারা আরাকানী অভিজাত ঐতিহ্য মতে, অথবা মুসলিম হওয়ার কারণে, মুসলিম নাম ও খেতাবে অভিহিত হয়েছিলেন।

বাদশাহী আমলের প্রতিষ্ঠিত রীতি মোতাবেক মুসলিম সম্ভ্রান্ত লোকদেরই খান, খান

সাহেব, খান বাহাদুর ও নবাব খেতাব প্রাপ্য ছিলো। কদাচিত অমুসলিম শাহী আত্মীয়দের ঐ খেতাবে ভূষিত করা হতো। তৎসঙ্গে অমুসলিম সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্য নির্ধারিত ছিলো রায়, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, রাজা, রাজা সাহেব, রাজা বাহাদুর ও মহারাজ খেতাবগুলো। কদাচিৎ কোন মুসলিম অভিজাত স্বীয় অমুসলিম পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যের অনুসরণে রাজা ইত্যাদি সম্বোধিত হতেন। এই খেতাবের বিচারেও চাকমা রাজ পুরুষেরা অমুসলিম বিবেচিত হন না। এর অনুকূলে আরো বিবেচ্য হলো এখনো রাজ মহিষীদের বিবি, আর রাজাদের হুজুর সম্বোধন করা এবং তাদের খাটি মোগলাই সাজ পোষাক ও আড়ম্বর অনুসরণ যা বাংলা অঞ্চলে আচরিত অমুসলিম রীতি নয়। সর্বোপরি বিস্ময়করভাবে চাকমা ভাষা ও আচার আচরণের বৃহদাংশ খাঁটি মুসলিম চরিত্র সম্পন্নও বটে। এটা এই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দেয় যে, একদা একদল চাকমা, ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এবং চাকমা রাজারাও ছিলেন মুসলমান। তুলাচুক্তি রাজা ভুবন বাবু কল্পিত গল্প এবং রাজ বংশ তালিকাটিও অধিকাংশে আজগোবী।

দ্বিতীয় ধারণাটি মনগড়া ইতিহাস প্রসূত। এর অনুকূলে উপজাতীয় পক্ষ কোন গ্রহণযোগ্য তথ্য উপস্থাপনে কখনো সক্ষম হবেন তা বলা যায় না। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস হলো ঃ নবাব মীর কাসিম আলী খাঁন ১৭৬০ খ্রীঃ সালে এক ফরমান বলে, এ দেশীয় প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনের ব্যয় নির্বাহের জন্য চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের দায়িত্ব বৃটিশদের নিকট অর্পণ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের শেষ মোগল শাসক রেজা খান, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি মিঃ হেরি ভেরেলস্টের নিকট ১৭৬১ সালের ৫ই জানুয়ারী এই এলাকার দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। ভেরেলস্টের ফরমান অনুসারে, তখন চট্টগ্রামের সীমানা ছিলো ঃ উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাফনদী ও পুর্বে ঠেকা নদী হয়ে চীন পাহাড় শ্রেণী। পার্বত্য চট্টগ্রাম নামীয় কোন পৃথক ভূভাগ তখন ছিলো না। কুকি ও পুর্বের মুক্তাঞ্চলবাসী অরাজক উপজাতিদের উৎপাত ও আক্রমণ ঠেকাবার প্রয়োজনেই রেইড অফ ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবস নামীয় ২২ নং প্রশাসনিক আদেশের আওতায়, ১৮৬০ খ্রীঃ সালে এতদাঞ্চলকে চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করা হয়। সূতরাং এটা সঠিক তথ্য নয় যে, ১৮৬০ খ্রীঃ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্ব ছিলো, এবং তা ছিলো, বৃটিশ প্রশাসনের বহির্ভুত মুক্তাঞ্চল, বা স্বাধীন চাকমা রাজ্য।

তৃতীয় ধারণাটি তথ্যের বিচারে সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন। এতদাঞ্চলে কোন উপজাতীয় স্বাধীন রাজা ও রাজত্বের অস্তিত্ব থাকা, সমসাময়িক ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত নয়। ঐ রাজ্যের নিজস্ব ইতিহাসটিও প্রদর্শনযোগ্য নয়। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা আরাকান, মোগল ও পাঠান শক্তির সাথে, তাদের কোন সংঘাত সংঘর্ষ বা সম্পর্কের কথাও কোন বিবরণে প্রাপ্তব্য নয়। নিজস্ব মুদ্রা, ধ্বংসাবশেষ, কীর্তি, সনদ, রাজকীয় প্রত্ন-বস্তু বা দলিল জাতীয় কিছুও প্রদর্শন যোগ্য নয়। সুতরাং স্বাধীন রাজা, রাজ্য ও রাজত্ব থাকার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়? রূপকথার কল্পকাহিনীভুক্ত রাজা রাজ্য

রাজত্বকে বাস্তবে প্রমাণ করা কঠিন। উপজাতীয় পন্ডিত মহল বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় কিছু বক্তব্যকে খন্ডিতভাবে অবলম্বন করে আছেন। আসলে ঐ বক্তব্যগুলোর সুবিধাজনক অংশগুলো আংশিক উদ্ধৃতির মাধ্যমে তারা নিজেদের দাবীকৃত কল্পরাজ্যকে, সপ্রমাণে সচেষ্ট। কিন্তু ঐ বক্তব্যগুলো সামগ্রিকভাবে আত্ম বিশ্লেষিত যা নেতিবাচক তথ্যই দান করে। ভুল ভাঙ্গার জন্য ঐ বক্তব্যগুলো পরপর ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত হলো, যথা ঃ

1. The Rajas of the Chittagong Hll Tracts were originally appointed by the suffrage of the Jhoomias, Kukees and other inhabitants and not by the sovereign of the country as usual. They were all independently paid no tribute or revenue to the Moghal Government until the Moghee year 1077 ms 1715 AD.
(Ref : Revenue letter no 1499, Dated 10th September 1866 Addressed to the Commissioner Chittagong Division)

বাংলা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা স্বাভাবিকভাবে দেশীয় কোন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা নয়, মূলতঃ জুমিয়া কুকি ও অন্যান্য অধিবাসীদের দ্বারাই নিযুক্ত। তাদের কেউই ১০৭৭ মঘী সন মোতাবেক ১৭১৫ খ্রীঃ সালের আগে স্বেচ্ছায় মোগল সরকারকে কোন রকম উপঢৌকন বা কর দিতেন না। (সূত্র চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারকে লিখিত রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খ্রীঃ)

এ বক্তব্যের তাৎপর্য এটাই হওয়া সম্ভব যে, তাদের স্থানীয় স্থায়ী নাগরিকত্ব, ক্ষমতা ও ভূমাধিকারের প্রতি মোগল সরকারের অনুমোদন বা স্বীকৃতি ছিলো না। বাস্তবে তারা ছিলেন ভূমিহীন যাযাবর জুমিয়া। চন্দন খাঁ বংশীয় শেষ সামন্ত জালাল খাঁই ১৭১৫ খ্রীঃ সালে মোগল সরকারকে কর দানের দ্বারা আনুগত্য স্বীকার করেন। এলাকাটিও ছিলো মাতামুহুরী নদী উৎসের বার্মা সীমান্তে, অবস্থিত ছোট্ট এক ভূভাগ, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। যে ক্ষুদ্র এলাকাটি চন্দন খাঁ বংশের দখলাধীন ছিলো তা বার্মা ও মোগল শাসিত অঞ্চলের মধ্যাঞ্চল। চন্দন খাঁ বংশের অমুসলিম উপজাতীয় হওয়াটাও সন্দেহজনক। তাদের কার্যকাল ছিলো মাত্র ১৩ বছর দীর্ঘ।

2. In 1763 Ac Verelst the English Chief of Chittagong and his Council by proclamation declared the local jurisdicton of the Raja to be all the hills from phani river to sungu and from Nijampur Road to hills of kukee Raja, (Ref : Chittagong Hill Tracts Gazetteer by KHS Hutchinson page, 24)

বাংলা ঃ ১৭৬৩ সালে চট্টগ্রামের ইংলিশ প্রধান ভেরেলস্ট ও তার পরিষদ, ফরমান

জারি করে ঘোষণা করেন যে, রাজার (শের মস্ত খাঁর) স্থানীয় এখতিয়ার হবে, ফেনী নদী থেকে শঙ্খ এবং নিজামপুর সড়ক থেকে কুকি রাজার পাহাড় পর্যন্ত সমুদয় পর্বতাঞ্চল।
(সূত্র ঃ মিঃ কে এইচ এস হাচিনসনকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের গেজেটিয়ার পৃষ্ঠা ঃ ২৪)
এটা জুল কদর খাঁন প্রদত্ত তুলাকর বা জুম কর আদায় বা জুম নোয়াবাদ সংক্রান্ত ফরমান সুত্রে প্রাপ্ত তহসিলদারী, ভূমিস্বত্ব নয়।

৩। Mr. Hary Verelst Chief of the Chittagog Council of the period declared that it had been proved to his satisfection that, all the hills from phanny to the sungoo and from the Nijampur Road to the hills of the Kukee Rajah pertained to the Zamindery of Raja Sher Most Khan, in the Kapas Mohal Depertment, and directed that he should continue in possassion there of paying the revenues of the Government and prohibited sub-ordinate officers from interfering with him, his heirs and successors in this holding,

(Ref : Letter to Kalindi Rani by Mr. A smith the Collector of Chittagong, dated the 2nd January 1866)

বাংলা ঃ মিঃ হেরি ভেরেলষ্ট তখনকার চট্টগ্রাম পরিষদের প্রধান ঘোষণা করেন, এটা তার কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত যে, ফেনী থেকে শঙ্খ এবং নিজামপুর সড়ক থেকে কুকি রাজার পাহাড় পর্যন্ত সমুদয় পর্বতাঞ্চল, যা কার্পাস মহাল নামীয় বিভাগের অধীন, তা রাজা শের মস্ত খাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি আদেশ করেন যে, সরকারের প্রাপ্য খাজনা পরিশোধ করার দ্বারা তাতে তিনি অব্যাহতভাবে অধিকারী থাকবেন এবং সব অধঃস্তন কর্মকর্তাদের, তার উপর তার ওয়ারিশান ও উত্তরাধিকারীদের উপর উক্ত স্বত্বের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকেও তিনি বারণ করেণ (সুত্র ঃ চট্টগ্রামের কালেক্টর মিঃ এ স্মিত কর্তৃক কালিন্দি রাণীর নিকট লিখিত চিঠি তাং-২রা জানুয়ারী ১৮৬৬)।

এই চিঠিতে বর্ণিত জমিদারীর অর্থ জুম নোয়াবাদ বা জুম তহসিলদারী, যা চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুল কদর খান কর্তৃক রাজা শের মস্ত খানকে প্রদত্ত হয়েছিলো। বাস্তবে মিঃ ভেরেলস্টের সময় শের মস্ত খান জীবিত ছিলেন না। এবং তার বন্দোবস্তি তরফে শুকদেব ছিলো কোদালায় সীমাবদ্ধ।

৪। In 1829 Mr. Halhead the Comissioner stated that, the hill tribes were not british subjects, but merely, tributories, and that we recognised, no right, on our part to interfere with

their internal arrangement. (Ref : Statistical Account of Bangal Vol vi, page 22 by w. w. Hunter,

বাংলা ঃ ১৮২৯ সালে কমিশনার মিঃ হলহেড বলেন, পাহাড়ী উপজাতিরা বৃটিশ প্রজা নয়, বড়জোর নজরানা বা কর দাতা। এ কারণে আমাদের পক্ষে তাদের আভ্যন্তরিন ব্যবস্থাদিতে হস্তক্ষেপ করা অনুমোদনীয় নয়।

(সুত্র ঃ ষ্টেটিষ্টিকেল একাউন্ট অফ বেঙ্গল, খন্ড ৬ পৃষ্ঠ ২২ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার)।

এই বক্তব্যটির সাথে ভিন্ন তথ্য জ্ঞাতব্য। উপজাতিরা ছিলো বহিরাগত, ভ্রাম্যমান জুম চাষী। পার্বত্য চট্টগ্রাম তখন আরাকানী উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ। বর্তমানের অধিকাংশ উপজাতি সেই তাদেরই বংশধর। তখনো ১/১৯০০ সালের আইনের আওতাধীন রচিত পার্বত্য শাসন বিধির ৫২ ধারায় মঞ্জুরযোগ্য ইমিগ্রেশন বা অভিবাসনের আইনগত সুবিধা প্রচলিত ছিলো না। তাই এতদাঞ্চলীয় অধিকাংশ উপজাতি বিদেশী ও বিজাতি হিসাবে গণ্য ছিলো। স্থানীয় নাগরিক না হওয়ার দরুণ, তাদের বৃটিশ প্রজা না হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। তবে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হয়ে এই পার্বত্য অঞ্চলে অভ্যস্ত পেশা জুম চাষে তারা লিপ্ত হতো। যদ্দরুণ রাজস্ব নিয়মে তাদের পক্ষে কর দেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। ১৮২৪ খ্রীঃ সালের প্রথম বৃটিশ বার্মা যুদ্ধ, বৃটিশদের আরাকান দখল ইত্যাদি কার্যকারণ ও প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস পাঠে, এতদসংক্রান্ত বিষদ তথ্য অবগত হওয়া সম্ভব। সুতরাং উপজাতীয় রাজা রাজ্য বা রাজত্বের কথা বাস্তবে একটি আত্ম ভুলানো রূপকথা।

ভারতে বৃটিশ দখল সম্প্রসারণ ও তাদের দীর্ঘ শাসনের ইতিহাস সবিস্তারে লিখিত আছে। তাদের হাতে অতীতে কখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র উপজাতীয় রাজ্যের পতনের কথা কোন বিবরণেই প্রাপ্তব্য নয়। বৃটিশ ভারতের ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্যের তালিকায় এরূপ কোন রাজ্যের নাম অন্তর্ভুক্ত নেই। গোটা পূর্বাঞ্চল জুড়ে কুচবিহার, মনিপুর আর ত্রিপুরাই ছিলো, স্বীকৃত দেশীয় রাজ্য। অবশ্য ১৭৭৬-৮৬ এই দশ বছর স্থায়ী একটি চাকমা বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়া সরকারী রেকর্ডপত্রে স্বীকৃত। তখন বিদ্রোহী পক্ষ নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম প্রতিপক্ষ রূপে ঘোষণা করেননি। বিদ্রোহী চাকমা রাজা জান বখশ খাঁ, স্বীয় সীল মোহরে নিজেকে মহারাজ তথা সামন্ত অধিপতি দাবী করেছেন। শুক দেবও লোকগীতি মতে জমিদার ছিলেন। রাণী কালিন্দিও নিজের জমিদার দাবীতে সোচ্চার ছিলেন, যা কার্যতঃ বৃটিশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। খোদ কালিন্দি রাণী রাজা নগরের পরিত্যক্ত রাজবাড়ীর বৌদ্ধ মন্দির গাত্রে লিখিত ভাবে স্বীকার করেছেন ঃ চাকমাদের আদি রাজা ছিলেন জনৈক শের মস্ত খাঁ। চাকমা লোকগীতি অনুযায়ী যার আদি বাসস্থান আরাকানের রোয়াং বা রোসাং। নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে তার আগমন কাল হলো ১৭৩৭ সাল। রাজা শের জব্বার খাঁর সীল মোহরের ভাষ্য অনুযায়ী তিনিও স্বীয় সর্দারী কালে (১৭৪৯-৬৫) আরাকানের রোসাংবাসী ছিলেন। সুতরাং বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত

চাকমাদের মূল অংশের জাতিগতভাবে আরাকানে থাকাই সমর্থিত হয়। শের মস্ত খাঁর মাধ্যমে তাদের কিছু লোকের এতদাঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণ ছাড়া, রাজ্য শক্তির অধিকারী হওয়া, আজগুবী তথ্য। এদের সবাই রাজা অভিহিত সর্দার। তবু উপরোক্ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় উক্তিগুলো স্বাধীনতার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, যা বাস্তবে ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক। বৃটিশ শাসন আরম্ভকালের সেই ১৭৭৬-৮৬ সালের বিদ্রোহটি ছিলো আসলে ভারতব্যাপী বৃটিশ বিরোধিতার অংশ। বাংলায় তখন ফকির ও সন্যাসীদের বিদ্রোহ চলমান। ঘটনার সুত্রে জানা যায়, চাকমা বিদ্রোহের সাথে একদল কুকি এবং জনৈক মুন গাজির নেতৃত্বে একদল বাঙ্গালীও যুক্ত ছিলেন। সুতরাং তা চাকমা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হওয়া সন্দেহজনক। তবে বাস্তবে পাওয়া না গেলেও, কল্প কাহিনীতে চাকমা রাজ্য ও রাজত্ব বিদ্যমান। রাধা মোহন ধনপতি গীতিমালাটি সে কাহিনীর যোগানদার। কার্যতঃ এটিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়। দান্যাওয়াদি আরেদ ফুং নামের হুবহু আরেকটি কাহিনী মঘী ভাষায় আরাকানেও প্রচলিত আছে। ভাষাতত্বের বিচারে দান্যাওয়াদি আরেদ ফুং হলো ধনপতি বা ধনবতী রাধা মোহনের আরাকানী ভাষ্য। পার্থক্য শুধু নামশব্দ প্রয়োগের মাঝেই সীমাবদ্ধ। চাকমা কাহিনীতে রাধা মোহন শব্দ আগে স্থান পেয়েছে, আর আরাকানী কাহিনীতে পরে। মৌলিকত্বের বিচারে কোনটি আসল আর কোনটি নকল, নির্ধারণ করাও মুশকিল। মনে হয় কাহিনীটি অতিরঞ্জণ ও বাস্তবতা মিশ্রিত। তাতে অনুমান করা যায়, সুদূর অতীতে একদা কোথাও চাকমা সম্প্রদায়ের কিছু সামন্তীয় আধিপত্য ছিলো। কাহিনীটি তারই স্মৃতি কথা। এসি বেরেলস্টের বক্তব্যই প্রমাণঃ তিনি ছিলেন জমিদার, স্বাধীন রাজা নন। ঐ কথিত জমিদারীটাও ছিলো সরকারী তুলা মহালের অধীন জমি। তার মানে জুমিয়ারা তুলা সরবরাহের অঙ্গীকারে এক সনা বন্দোবস্ত নোওয়াবাদের আওতায় খাস তুলা মহালে জুম চাষ করতো। তুলা চাষাধীন ঐ জুম ক্ষেত্র কাপাস মহাল নামেও অভিহিত ছিলো। ঐ জুমিয়াদের কাছ থেকে নগদে বা তুলার আকারে জুম কর আদায় পরিশোধে শের মস্ত খান সরবরাহকার রূপে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন।

মোগল আমল ও বৃটিশ আমলের প্রামাণ্য ঐতিহাসিক উপাদান এবং কর্তৃপক্ষীয় বক্তব্যের বিশদ ও সামগ্রিক বিবরণের দ্বারা, অকাট্যভাবে এটা প্রমাণিত যে, অতীতে চাকমা বা অন্য কোন উপজাতির পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও, কোন স্বাধীন রাজ্য বা রাজত্ব ছিলো না। এতদাঞ্চলে চাকমা অভিবাসনের প্রথম অনুমোদনদাতা ব্যক্তি হলেন চট্টগ্রামের মোগল নায়েব জুলকদর খান, যিনি শের মস্ত খাঁকে জমি বন্দোবস্তি ও জুম খাজনার তহসিলদারী মঞ্জুর করেছিলেন। তবে সার্বভৌম রাজ্য ও রাজত্বের অধিকারী না হলেও, তিন উপজাতীয় রাজ পরিবার ঈর্ষণীয় প্রাচীন কৌলিন্যের অধিকারী, এবং তাদের সম্প্রদায়গুলো গৌরবজনক অতীত ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। শুধু বাংলাদেশেই তাদের কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন কৌলিন্য বিদ্যমান। এটা অত্যন্ত গৌরবজনক উত্তরাধিকার।

উপজাতি পক্ষের চতুর্থ বা শেষ ধারণাটি ও সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসুত। উপজাতীয় বা জুমিয়া জাতিত্বের অস্তিত্ব এতদাঞ্চলে কখনো ছিলো না। তাদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যা, জনসংহতি সমিতির হিসাব অনুযায়ী দশ ভাষাভাষী তেরো একথা ঠিক নয়। স্থানীয় সরকার পরিষদের স্বীকৃতি মূলে তা পনের, বিদেশী নৃতাত্ত্বিক পন্ডিতদের হিসাব মতে দশের অধিক এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমষ্টিগতভাবে সাত ও সম্প্রদায়গতভাবে তেইশ। এই বিভিন্নতা সহ নিজস্ব আশা-আকাঙ্খা, ভাষা আচার-আচরণেও সবাই ভিন্ন। বাঙলা ভাষাই তাদের পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম। অবশ্য একমাত্র জুম পেশাই তাদের ঐক্য ও অভিন্নতার সুত্র, যে পেশাটি আজকাল বিলীয়মান। এটা আদিমতার শেষ অবলম্বন। উপজাতিদের সবাই এই পেশায় জড়িত নেই। জুমিয়া পরিচয়টিও আধুনিক ভদ্র ও শিক্ষিত লোকদের রুচি ও মানের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। বাঙালীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হুজুগে পৃথক জাতি সত্তা জ্ঞাপনে এই অনুপযোগী সংজ্ঞাটির চর্চা হচ্ছে। উপরোক্ত আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, উপজাতীয় রাজনীতি দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা বাঙালীদের সাথে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত।

দেশে বাঙালীদের বাৎসরিক নব প্রজন্মের সংখ্যা কম হলেও পঁচিশ লক্ষ। উপজাতীয় অস্ত্রবাজি, রক্তপাত ও প্রাণহানিতেও তাদের এ সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।উপদ্রবের মাঝেও এতদাঞ্চলে তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে না। সুতরাং বাঙালী নিয়ন্ত্রণে আরোপিত অস্ত্রবাজি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখন সাফল্যের যে একমাত্র উপায়টি অবশিষ্ট আছে তা হলো : জাতীয় সদিচ্ছা ও সহানুভূতি লাভ ও উপজাতীয় বৈচিত্র্যকে বাঁচাবার আবেদন সৃষ্টি। সন্দেহ নেই, শেষমেশ শান্তির প্রতি জনসংহতি সমিতির আগ্রহ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সর্বোচ্চ আশার কথা যে, তারা দাবী-দাওয়ার পরিধি সংকুচিত করে এখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও স্বায়ত্তশাসন অধিকার লাভের মাঝেই তা সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন। উগ্রতা আর বাড়াবাড়ি আংশিক স্থগিত হয়েছে। এটা সদিচ্ছার প্রকাশ। এমতাবস্থায় ন্যায্য দাবী-দাওয়া এখন আর অপূরণীয় নয়।

খ) কী কারণে উপজাতিরা বিক্ষুব্ধ, আর কেনই বা তারা সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত, শান্তির স্বার্থে এখন তা খুঁজে দেখা দরকার। এই লক্ষ্যে প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, সূচিত আন্দোলনের ভিতরকার দর্শনটি কী? উপজাতিদের রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের ৫ দফা দাবী নামায় তা নিম্নাকারে উপস্থাপন করেছেন, যথা ঃ

১। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বোম, লুসাই, মুরুং পাংখো, রিয়াং ও চাক এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। (সংক্ষিপ্ত)

২। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালে রচিত প্রথম শাসনতন্ত্রে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথক শাসিত

অঞ্চলরূপে স্বীকৃত। পাকিস্তানের ১৯৬২ সালে রচিত দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে একদাঞ্চল উপজাতীয় অঞ্চলরূপে ঘোষিত। ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ সংবিধানে ঐ দুই প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়েছে, যা জুমিয়া জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব আর ভূমিস্বত্ব সংরক্ষণের পরিপন্থী। (সংক্ষিপ্ত)

৩। জুমিয়া জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের উপায় হলো ঃ গণতন্ত্র সম্মত স্বায়ত্তশাসন। দেশ রক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক মুদ্রা ও ভারি শিল্প ইত্যাদি বাদে অন্যান্য বিষয়াবলী হবে তার এখতিয়ারাধীন। এসব বিষয়ে তার আইন প্রণয়নেরও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে। বহিরাঞ্চলবাসীদের ভূমি ক্রয় বসতি স্থাপন ও বন্দোবস্তি গ্রহণ নিয়ন্ত্রিত হবে। ১৭ আগস্ট ১৭৪৭ এর পর থেকে এ যাবৎ আগত বহিরাগতদের প্রত্যাহার ও স্বদেশত্যাগী উপজাতীয়দের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগ ও বদলিতে স্থানীয় এখতিয়ার হবে নিরঙ্কুশ। বহিরাঞ্চলবাসীদের প্রবেশ ও বসবাস হবে অনুমতি সাপেক্ষ। পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম হবে জুম্মল্যান্ড।

এই ক্ষমতা ও ধারণাগুলো স্থানীয় শায়ত্তশাসন দাবীর ভিত্তি, আর এটা হলো উপজাতি পক্ষের মোটামুটি রাজনৈতিক দর্শন। এখন এর তথ্যভিত্তিক যথার্থতা ও বাস্তব পরিস্থিতি জাত পরিবেশ, যাচাই করা হলে, উভয় পক্ষের যুক্তিবাদীদের বিষয়টি বুঝতে ও তার ভুল ত্রুটি নিরূপণে সহায়তা হবে। বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মীমাংসায় পৌছতে অনুরূপ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থাপন দরকার।

এটা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, উপরোল্লেখিত উপজাতিরা বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। কিন্তু এটা তাদের আদি জাতীয় আবাসভূমি নয়। জনসংহতি সমিতি এতদাঞ্চলকে উপজাতিদের আদি জাতীয় আবাসভূমি জ্ঞানে এখানে তাদের ভূমিস্বত্ব আর একাধিপত্য সংরক্ষণের দাবীদার। আসলে এটা তাদের ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। ইতিহাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের আগমন, নির্গমন চিহ্নিত আছে। এদের অধিকাংশই বহিরাগত জুমিয়া উদ্বাস্তুদের বংশধর। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৫২ ধারার সুবিধা বলে এরা তখন থেকে এতদাঞ্চলের অভিবাসী নাগরিক, মূল অধিবাসী নয়। সংখ্যায় ও তারা দশ নয় বেশী। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য এখন আর বাধ্যতামূলক পালনীয় নয়। সে অপ্রয়োজনীয় আর অবাঞ্ছিত বিধি-বিধানগুলো নতুন আইনের দ্বারা বর্জিত হয়েছে। অর্জিত স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আর গণতন্ত্রের মানে তো যুগোপযোগী নিজস্ব ইচ্ছা আকাঙ্খা ও ক্ষমতার প্রয়োগ, পশ্চাদপদতাকে আঁকড়ে ধরা নয়। ১/১৯০০ সালের শাসন বিধি তথা পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইনে উপজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ, স্বশাসন ইত্যাদি কোন সুযোগ-সুবিধাই প্রদান করেনি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিলো ঔপনিবেশিক বিধি ব্যবস্থা। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রগুলো পূর্বাঞ্চলের আশা-আকাঙ্খা পূরণের উপযোগী ছিলো না। বাংলাদেশ সংবিধান রচনায় জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা খোদ

শরীক ছিলেন। তিনি তখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তথা ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেননি। তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তার দাবী উঠালেও জাতীয় পরিষদে এতদাঞ্চলের পৃথক শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা ও উপজাতীয় স্বীকৃতি আদায়ের দাবীতে সোচ্চার ছিলেন না। এখন এ বিষয়গুলো সাংবিধানিক জটিলতায় আবদ্ধ। তার সহজ সমাধান নেই বা তা সময় সাপেক্ষ। যুক্তি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও আধুনিকতার বিচারে আসলে ১/১৯০০ সালের আইনের অধীন রচিত পার্বত্য শাসন বিধি একটি জংলী আইন। তিন উপজাতি প্রধান, তিনশত তেহাত্তর জন মৌজা প্রধান, ও শতাধিক বাজার চৌধুরীকে তা কুলিন, প্রশাসনের খয়ের খাঁ, ও একাধারে সাধারণ লোকের প্রভুতে পরিণত করেছে। সাধারণ লোক ঐ অভিজাত আর সরকারী কর্মকর্তাদের বেগার শ্রম দানেও বাধ্য। ঐ আইনের ৫১ ও ৫২ ধারা কার্যতঃ স্বদেশবাসী কারো আগমন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে না। অভিবাসন তথা বিদেশী নিয়ন্ত্রণ ও বিতাড়নই তার লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক স্বার্থে বহিরাগত উপজাতিরা আনুকূল্য পেয়েছে। তাদের অভিবাসী হওয়ার পরিচয় তবু তাতেও ঘোচেনি বরং শীলমোহর পড়ে আরো শক্ত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ঐ বৃটিশ প্রবর্তিত ঐতিহ্যকে মেনে নিতে বাধ্য নন। তবুও কিছু ঐতিহ্য না ভাঙ্গার উদারতা প্রদর্শিত হয়েছে। ভূমিস্বত্ব না পাওয়ার জন্য উপজাতিদের জুম চাষ ও বন্দোবস্তি গ্রহণের অনীহাই দায়ী। এতদাঞ্চল কোন আইনেই উপজাতিদের লাখেরাজ সম্পত্তি নয়। কোন কর্তৃপক্ষই পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতিদের লাখেরাজ সম্পত্তি রূপে ফরমান জারি বা ঘোষণা দেননি। বিনা বন্দোবস্তিতে ভূমির মালিকানা লাভ বিধিবদ্ধ না থাকায়, সরকারী সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশের ভূমিস্বত্ব অর্জিত হয়নি। এর জন্য দায়ী তারা নিজেরাই। এখন ভূমিস্বত্ব সংরক্ষণের দাবী অবান্তর। স্বাভাবিক নিয়মে বন্দোবস্তি গ্রহণ অবাধ। দখলীয় বা আবাদী জায়গা জমি খাস রেখে, মালিকানা প্রতিষ্ঠা বিধিসম্মত নয়। আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীন শিক্ষিত ভদ্র লোকদের জুমিয়া পরিচয় মর্যাদা সম্পন্ন নয়। গণতন্ত্র কখনো পশ্চাদপদতা, আদিমতা, সংরক্ষণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠী প্রীতি ও কুপমন্ডুকতাকে সমর্থন করে না। গণতন্ত্র স্বাধীন উদার ও সার্বজনীন কল্যানের ধারণা। সংকীর্ণতা ও সুবিধাবাদ তাতে সমর্থিত নয়। সর্বোপরি গণতন্ত্র এখন সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গোটা জাতীয় জনমত পুনরায় ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ধরনের স্বায়ত্তশাসন লাভের আকাংখা স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নেই। তবে স্থানীয় বা আঞ্চলিক শাসনের প্রশ্নটি মীমাংসাযোগ্য। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় শাসন আইনের আওতায় রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিকল্প উদ্ভাবন করা সম্ভব।

বাঙালীদের বেআইনী বহিরাগত বলা, তাদের বৈধ সহায় সম্পত্তিকে আইনানুগ স্বীকার না করা, নির্বিচারে তাদের সবার প্রত্যাহার দাবী, পাকিস্তান আমলের স্বদেশত্যাগী উপজাতিদের প্রত্যাবাসন কামনা, ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তি ও আগমন নির্গমনে বাঙালীদের অধিকারের অস্বীকৃতি ইত্যাদি নিতান্তই উস্কানীমূলক বাড়াবাড়ি। তাতে যুক্তির চেয়ে হিংসাই মুখ্য। এর বিপরীতে বাঙালী প্রভাবিত গোটা

জাতি, উপজাতিদের বৈরী ভাবতে পারে। প্রায় ভুলে যাওয়া বেআইনী উপজাতীয় বহিরাগমনের অনাকাংখিত অসন্তোষ পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠা সম্ভব। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ উপজাতীয় অভিবাসন স্বীয় স্বার্থে মেনে নিলেও তা এই স্বাধীন জাতির জন্য অপরিহার্য নয়। বাঙালী বিরোধী দাবীর পাল্টা শ্লোগান উঠাও সম্ভব। তারাও বলতে পারে ঃ বাঙালীর আদি স্বদেশ বাংলার এই পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিরা মূল অধিবাসী নয়। একদা বিদেশী শক্তির মদদে অভিবাসিত। এই অভিবাসীদের দ্বারাই বাঙালীরা অন্যায়ভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এই দাবীর পিছনে অকাট্যভাবে ইতিহাস সাক্ষী। আজ বিদেশী মদদের বলে, শক্তিশালী উপজাতীয় গলাবাজি আর অস্ত্রের চাপে, বাঙালীসহ ক্ষুদ্র ও দুর্বল সম্প্রদায়গুলো স্তব্ধ আর জিম্মি। বিদ্রোহী বড় সম্প্রদায়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে বিপক্ষ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়দের অসহায় অবস্থায় পতিত হবার আশংকা করা যায়। সে পরিস্থিতিতে এখানে বাঙালী উপস্থিতি, ঐ দুর্বল ও ক্ষুদ্রদের রক্ষা কবচ রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

বাঙালীদের বিপরীতে উপজাতিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা। তাদের সম্মিলিত সংখ্যা প্রাধান্য একটি কাগুজী যোগফল মাত্র। বাস্তবে যোগসূত্রহীন কতিপয় স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যৌগিকভাবে বাঙালীদের বিপক্ষে সংখ্যাগুরু, পৃথক হিসাবে নয়। বাঙালীদের শক্তির ভিত্তি স্বদেশ স্বজাতি আর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতা। এর বিপরীতে উপজাতিরা বহু ক্ষুদ্র বিভক্তপক্ষ ও পরনির্ভর। উপজাতীয় বিদ্রোহ আর হিংসা, বাঙালীদের শক্তি বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে। এখন তারা এতদাঞ্চলের একক প্রধান সম্প্রদায়ে পরিণত। এই বাস্তবতাকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

দেশ ব্যাপ্ত ভূমিহীনতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, প্রতিটি অঞ্চলের প্রতি অপ্রতিরোধ্য। বাড়তি জনসংখ্যার স্রোত কোন নিষেধাজ্ঞার প্রতিরোধেই সামালযোগ্য নয়। স্বদেশের ভিতর আন্তঃআঞ্চলিক পাসপোর্ট ও ভিসা প্রবর্তনের দাবী একটি অবাস্তব প্রস্তাব। এটা রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার পরিপন্থী। এটা রাষ্ট্রের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অসদেচ্ছার প্রকাশ। জুম্ম ল্যান্ড নামের প্রস্তাব হুজুগী ও সাতন্ত্রবাদী। এই নতুন পরিচয় লাভের চেষ্টা দুর্ভাগ্য জনক। এর বিপরীতে জুম বঙ্গ নাম অনেকটাই ঐতিহ্যানুগ। মুসলিম বাদশাহী আমলে সীমিত আকারে হলেও এ নামটির প্রচলন ছিলো। প্রাচীন বঙ্গ নাম ও জুম ঐতিহ্যের স্বীকৃতি তাতে আছে।

এখানে রাজা ফতেহ খাঁ সংক্রান্ত আরেকটি আজগুবী গল্প কথার প্রত্যুত্তর দেয়া দরকার। রাজা ভুবন মোহন রায়সহ অনেক চাকমা পন্ডিত দাবী করেন ঃ মোগলদের যুদ্ধে পরাজিত করে, কথিত ফতেহ খাঁ ও কালু খাঁ নামীয় কামানদ্বয় দখল করা হয়েছিলো। ফতেহ খাঁ নামীয় কামানটি এখনো রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। অথচ সঠিক তথ্য হলোঃ ফতেহ খাঁ বৃটিশ আমলেরই লোক। কামানগুলো সম্ভবতঃ প্রাচীনকালের পরিত্যক্ত অবস্থা থেকে সংগৃহীত। পরে তা গৌরব গাথার উপকরণে

পরিণত হয়েছে। পূর্বের চাকমা সদর দপ্তর রাজভিলা শুক বিলাস ও রাজা নগরে এগুলো ছিলো না। কোন প্রাচীন বিবরণে এগুলোর কথা নেই। এই কাহিনীর রচয়িতা রাজা ভুবন মোহন রায়। তিনি রাঙ্গামাটির রাজবাড়ীকে পাকা দালানে পরিণত করেন এবং ফতেহ খাঁ নামীয় কামানটিও স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ এটি তার নিজের দ্বারা সংগৃহীত। এটি তার পারিবারিক কৌলিন্য ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধির পক্ষে সংযোজিত আরেক উপকরণ। ইংলিশে লেখা এর পরিচয়, প্রাচীনত্বের স্মারক নয়।

৭। উপজাতীয় মৌলিকত্ব।

অতীতে ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রামের পূর্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে, বিভিন্ন সময় মগ, কুকি ও ত্রিপুরাদের আগমন নির্গমন ঘটলেও তাদের খুব কম সংখ্যক লোকই এতদাঞ্চলে স্থায়ী পুনর্বাসন গ্রহণ করেছে এখানে কৃষি কাজে ভূমি ব্যবহারকারী স্থায়ী প্রধান অধিবাসী হওয়ার গৌরব একমাত্র বাঙালীদের প্রাপ্য। যদিও তখন লোকবসতি ছিলো বিরল, এবং অধিকাংশ পাহাড়াঞ্চল ছিলো অনাবাদী। কুকি, মগ ও ত্রিপুরা বাদে, অন্যান্য উপজাতিদের নাম পরিচয় আর অস্তিত্বের কথা সর্বাধিক বৃটিশ আমলেই গোচরীভূত হয়। ঐ আমলের শুরুতে দুরবর্তী মুক্তাঞ্চলবাসী বিভিন্ন উপজাতীয় লোকের, এতদাঞ্চলে আগমন ও তজ্জন্য অরাজকতা ঘটেছে। বার্মা ও আরাকানের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণেও বটে, বহিরাগমন ব্যাপক ও তরান্বিত হয়। এসব ঘটনার বিবরণ সেকালের সরকারি রেকর্ডপত্রে বিষদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এবং তা নিয়ে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক বই পুস্তক ও রচিত হয়েছে। পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়া ও ডে বারোজের ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় অংকিত প্রাচীন বাংলার একটি মানচিত্র হলো সর্বাধিক প্রাচীন দলিল, যা চাকমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম তথ্য প্রদান করে। অন্যান্য প্রাচীন তথ্যগুলো উপজাতীয় কিংবদন্তি থেকে গৃহীত। সুতরাং তা নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য নয়। তৎপর আমরা অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের গবেষণা নিবন্ধ 'অরিজিন অফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস থেকে অবগত হই, জনৈক শের মস্ত খাঁ-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তদীয় অনুসারী স্বল্প সংখ্যক চাকমাসহ আরাকান ত্যাগ করে ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে, মোগলদের অধীন চট্টগ্রামের কোদালা অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে, পুনর্বাসন গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে দক্ষিণ চট্টগ্রাম সীমান্ত অঞ্চলে উপজাতীয় রাজা হিসাবে জনৈক চন্দন খাঁ ওরফে তৈন খাঁ ১৭১১ খ্রীঃ সালে আবির্ভূত হোন, যার বংশধরনের শেষ ব্যক্তি জালাল খাঁ, ১৭২৪ খ্রীঃ সালে, অবাধ্যতার কারণে, মোগল শক্তি কর্তৃক আরাকানে বিতাড়িত হোন। তাদের কার্যকাল মাত্র ১৩ বছর দীর্ঘ। বর্ণিত এই চন্দন খাঁ বংশ ও তাদের উপজাতীয় অনুসারীদের পরিচয় পরিষ্কার নয়। তাদের সাথে চাকমা ও শের মস্ত খাঁ বংশের সম্পর্ক থাকা অনিশ্চিত। উভয়ের আগমন ও নির্গমনকালের মাঝখানে তের বছরের এক ফাঁক বিদ্যমান। মার্মা বা মগেরা নামেই বর্মী পরিচিত। ত্রিপুরা ও লুসাই জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা রাজ্য ও মিজোরাম থেকে আগত। চাকমাদের রাজা শের জব্বার খাঁনের সীলমোহরই প্রমাণ, তারা বৃটিশ পূর্ব পর্যন্ত

আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। চাকমা রাণী কালিন্দির মন্দির লিপিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, তাদের আদি রাজা ছিলেন জনৈক শের মস্ত খাঁ। একটি চাকমা ছড়া গানেও এভাবে তাদের আদিবাস বিবৃত হয়েছে।
যথা ঃ

'আদি রাজা শের মস্ত খাঁ
রোয়াং ছিল বাড়ী
তারপর শুকদের রায়
বান্ধে জমিদারী।'

সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে চাকমাসহ উপজাতিদের আদি বসবাস ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। তারা এতদাঞ্চলের প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর। তাদের নাগরিকত্ব বা জাতীয়তা আনুষ্ঠানিকভাবে আদি বাংলাদেশী হওয়া প্রশ্ন সাপেক্ষ। বাঙ্গালী নয়, আদি বাংলাদেশীও নয়, মূলতঃ তারা অস্থানীয় বংশোদ্ভূত। এই হলো তাদের মূল পরিচয়।

আরাকানবাসী মগ ও চাকমাদের বিপুল সংখ্যায় স্বদেশ ত্যাগ ও চট্টগ্রাম সীমান্তের পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় ও প্রধান ঘটনার কাল হলো, প্রাথমিক বৃটিশ আমল, যার বিশদ ও নিরপেক্ষ বিবরণ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইনের লেখনীতে পঠনীয়, যিনি এতদাঞ্চল সম্পর্কীয় একজন নির্ভরযোগ্য প্রধান পন্ডিত। তার বিবরণ, যথা ঃ

A *greater* portion of the hill tribes at present living in the Chittagong hill's undoubtedly came about two generations ago from Aracan, This is asserted both by their traditions and by records in the Chittagong collectorate. It was in some measure due to the erodus of our hill tribes from Aracan that the Burmese War of 1824 took place which ended in the annexation to British territory of the fertile Province of Aracan. As this is a point interesting not only from its local bearing on the hill tribes but also in a larger and more important historical sense, I shall trace here the way in which the dissensions between the English authorities and the Burmese, which eventually culminated in war, hinged in a great measue upon refugees from the hill tribes who fleeing from Aracan into our territory, were pursued and demanded at our hands by the Burmese.

Among the earliest records that we have of our dealings with

the Burmese, are two letters, written, one by the king of Burmah, the other by the Rajah of Aracan to the chief of Chittagong and received on the 24th June 1787.
(Ref : The Hill Tracts of Chittagong and The Dwellers Therein. page 28/29)

বাংলা ঃ 'উপজাতীয়দের যারা বর্তমানে চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলে বসবাস করছে তাদের অধিকাংশ প্রায় দু'পুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। এটা দ্বৈতভাবে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর ঐ সব দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণিত, যা চট্টগ্রামের রাজস্ব দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। আরাকান থেকে উপজাতীয় লোকজনের পলায়ন হলো অন্যতম কারণ যদ্দরুণ ১৮২৪ খ্রীঃ সালের বর্মীযুদ্ধ সংঘটিতহয়। ওটা বৃটিশ ভারতের সাথে উর্বর আরাকান প্রদেশের সংযুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। ঘটনাটি শুধু স্থানীয় পাহাড়ী উপজাতিগুলোর কারণেই নয়, বরং আরো গুরুতর ও ঐতিহাসিক কার্যকারণে ও বটে হৃদয়গ্রাহী। আমি এখানে সে ব্যাপারগুলো চিহ্নিত করতে চাই, যদ্দরুণ বৃটিশ ও বর্মী কর্তৃপক্ষের মাঝে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, ও যুদ্ধের পরিণতি লাভ করে, আর তা হলো, পাহাড়ী উপজাতিদের বিপুল সংখ্যায় আরাকান ত্যাগ ও আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ, যাদেরকে ফেরৎ চেয়ে বর্মী কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে যোগাযোগ ও দাবী উত্থাপন করেছেন।

বর্মীদের সাথে আমাদের যোগাযোগের সর্বাধিক প্রাচীন দলিল হলো দু'টি চিঠি যার একটি বার্মার সম্রাট কর্তৃক এবং অপরটি আরাকানের রাজা কর্তৃক, আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধানের কাছে লিখিত হয়, তা ২৪ জুন ১৮৮৭ খ্রীঃ তারিখে পাওয়া যায়। (সূত্র ঃ দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন পৃঃ ২৮/২৯)।
মিঃ লুইন অতঃপর আরাকানের রাজার চিঠি খানার পরিপুর্ণ ইংলিশ ভাষ্যের উদ্ধৃতি তুলে ধরে পুনরায় বলেন ঃ

This letter is explicit enough. The fugitives referred to are evidently men of the chakma and mrung hill tribes, who to this day preserve the recollection of their ancestor's flight from Aracan, The persons in question were probably the chiefs of the clans, and the driving of them from British territory would have been equivalant to the expulsiong of the whole clan,

বাংলা ঃ এই চিঠিখানা যথেষ্ট বিশদ। বর্ণিত পলাতকেরা প্রমাণিতভাবে পাহাড়ী উপজাতীয় চাকমা ও মুরুং সম্প্রদায়ের লোক, যারা এখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের আরাকান ত্যাগের স্মৃতিকথা ধারণ করে আছে। বিতর্কিত ব্যক্তিরা সম্ভবতঃ তাদের

সমাজপতি, যাদেরকে বৃটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে বিতাড়ণের অর্থ গোটা সংম্প্রদায়কেই বিতাড়ণ।

এবার [illegible]কানের রাজার প্রদত্ত চিঠিখানা প্রণিধান যোগ্য, যথা ঃ

"From the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong. Our territories are composed of five hundred and sixty countries and we have ever been on terms of friendship and the inhabitants of other countries willingly and freely trade with the countries belonging to each of us, A person named keoty having absconded from our country, took refuge in yours, I did not however pursue him with a force but sent a letter of friendship on the subject desiring that Keoty might be given up to me. You considering your own power and the extent of your possession refused to sent him to me. I also am possessed of extensive country and keoty in consequence of his disobedient conduct and the strength and influence of my king's good fortune was destroyed,

''Domcan chakma, and Kiecopa lies Marring and other inhabitants of Arracan have now absconded and taken refuge *near* the mountains within your border and exercise depredations on the people belonging to both countries and they moreover murdered an Englishman at the mouth of the Naf, and stole away everything he had with him, Hearing of this I am come to your boundaries with an army in order to sieze them, because they have deserted their own country and disobedient to my King, exercise the profession of robbers. It is not proper that you should give asylum to them or the other Moghs who have absconded from Arracan, and you will do right to drive them from your country that our friendship may remain perfect and the road of travellers and merchants may be secured. If you do not drive them from your country and give them up, I shall be under the necessity of seeking them out with an army, in whatever part of your rerritories they may be, I send this letter by Mohammed Wassen. Upon the receipt of it, either drive the Moghs from your country, or if you mean to give them an asylum, return me an answer

immediately (Page : 29)

বাংলা ঃ আরাকানের রাজা থেকে চট্টগ্রামের প্রধানের প্রতি। আমাদের রাষ্ট্রীয় এলাকা পাঁচশত ষাটটি দেশ নিয়ে গঠিত, এবং আমরা চিরকালই পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় আর অবাধে আমাদের দেশসমূহের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। কেউটি নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনাদের আশ্রয় লাভ করেছে। আমি তাকে সসৈন্যে খুঁজে পেতে নিযুক্ত নই, তবে বিষয়টি নিয়ে একখানা বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছি, এই আশায় যে, কেউটিকে ধরে অবশ্যই আমার হাতে তুলে দিবেন। আপনারা নিজেদের শক্তি আর অধিকারের বিবেচনায় তাকে আমার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছেন। আমিও একটি বিশাল রাজ্যের অধিকারী। কেওটি তার অবাধ্য আচরণ আর আমাদের রাজার সৌভাগ্যের শক্তি ও প্রভাব গুণে ধ্বংস হয়ে যাবেই।

ডোমকান (খান) চাকমা, কায়কোপা, লাইজ, মেরিং ও অন্যান্য কিছু আরাকানী অধিবাসী পালিয়ে গিয়ে আপনাদের সীমান্তভুক্ত পাহাড়াঞ্চলের আশে-পাশে আশ্রয় নিয়েছে এবং উভয় দেশের লোকজনের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। অধিকন্তু তারা নাফ নদীর মোহনায় একজন ইংরেজকে হত্যা করে তার যথা সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। এটা শুনে আমি একদল সৈন্যসহ তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে আপনাদের সীমান্ত এলাকায় এসেছি। যেহেতু, তারা নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করেছে, আমার রাজার প্রতি আবাধ্য, এবং দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত, সুতরাং তাদেরকে এবং ঐসব মগদেরকেও যারা আরাকান থেকে পালিয়েছে, আশ্রয় দান করা আপনাদের পক্ষে সমীচিন নয়। আপনারা তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সঠিক কাজই হবে। তাতে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে এবং পথিক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত পথ নিরাপদ হবে। যদি তাদেরকে আপনাদের দেশ থেকে না তাড়ান ও ধরে হস্তান্তর না করেন, তাহলে আমি প্রয়োজনে আপনাদের দেশের যেখানে তারা থাকুক না কেন, একদল সেনা নিয়ে ধরে আনতে বাধ্য হবো। আমি এই চিঠিখানা মোহাম্মদ ওয়াসেনকে দিয়ে পাঠিয়েছি। এটা বুঝে পেয়ে হয় মগ লোকজনকে আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন, আর তাদেরকে আশ্রয় দিবার মতলব থাকলেও আমাকে যথাশীঘ্র প্রত্যুত্তরের জানাবেন।
(সুত্র ঃ ঐ পৃঃ ২৯)
মিঃ লুইন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এভাবে বর্ণনা করেন, যথা ঃ

These letters were received during the administration of Lord Cornwallis. They were followed up almost immediately by the entrance into our territory of a force of armed Burmese under the sirder of Arracan. The Chief of

Chittagong in the same month of june writes to the Governor General in council reporting this incursion and stating that he has declined to respond to the overtures of alliance untill this armed force was withdrawn. At the same time he states that in his opinion the refugees should be driven out of British trrritory. He adds also that these fugitives ware persons of some consequence in Arracan, and reports further ahat a Chakma Sirder, who had flied from Arracan, had been arrested and confined by him. He concludes by atating his opinion that this sirdar and his tribe have no intention of cultivating the low lands in a peaceable manner but have taken up their abode in the hills and jugles for the convenience of plundering. Ten Years before this in the year 1777, it appears from a letter dated 31 st May, from the Chief of Chittagong to the Honourable Warren Hastings Governor General that some thousands of hillmen had come from Arracan into the Chittagong limits, having been offered encouragement to settle by one Mr. Bateman, who was the chief governing officer there at that time. These migrations were evidently for a long time a rankling sore to the Burmese authorities and (Macfarlane's History of British India Page 355) records that in 1795 a Burmese army of 5,000 men again pursued some rebellious Chiefs or as they called them robbers right into the English District of Chittagong. These Chiefs who had taken refuge in our territories were eventually given up to the Burmese and two out of the three were put to death with atrocius torturs.'

In 1809 Macfarlane records that disputes continued to occur in the frontiers of Chittagong and Tipperah, but organized forays into that territory hardly assumed any definite form until 1823 (Wilson's Narrative of the Burmese war page 25), when a rupture ensued, which led to the war of 1824, the primary cause, therefore, of all these disturbance, rendering the Burmese apt to provoke and take offence, was undoubtedly the immigration to our hills of tribes hitherto subject to their

authority.
The origin of the tribes is a doubtful point, Pemberton ascribes to them a maloy descendant. Colonel sir A, phayre considers two of the principal tribes of Arracan, who are also found in these hills to be of mayamma or Burmese extraction. Among the tribes themselves no record exists, seve that of oral tradition, As to their origin, the Khyoungtha alone are possessed of a written language. They have among them several copies of the Raja Wong, or Histrory of the Kings of Arracan, but I have been able to discover no records whatever as to their sojourn and doings in the hills. The tongtha on the other hand posses no written character, and the languages spoken by them are simply to a degree expressing merely the wants and sensations of uncivilized life. The information obtainable as to their origin and past history is therfore naturally meager and unreliable (page : 32/33).

বাংলা ঃ 'এই চিঠিগুলো লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় পাওয়া গেছে। এগুলো পাওয়ার পর প্রায় সাথে সাথেই আরাকানের সর্দারের পরিচালনাধীন একদল সশস্ত্র বর্মী সৈন্য আমাদের শাসনাধীন এলাকায় ঢুকে পড়ে। আমাদের চট্টগ্রামের প্রধান ঐ একই জুন মাসে বাধ্য হয়ে বড় লাটের উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদন লিখে পাঠান যে, তাকে মৈত্রী রক্ষায় অবজ্ঞা করা হয়েছে। যদ্দরুণ আগে সশস্ত্র সৈনিকদের প্রত্যাহার দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, শরণার্থীদের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে অবশ্যই তাড়িয়ে দিতে হবে। তাতে এটাও যোগ করেন যে, উক্ত পলাতক লোকজন আরাকানে বহুবিধ দুষ্কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জনৈক চাকমা সর্দার যিনি আরাকান থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাকে তিনি নিজেই গ্রেফতার করে ধরে রেখেছেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করে স্বীয় বক্তব্য শেষ করেন যে, উক্ত সর্দার ও তার পরিচালনাধীন উপজাতীয় লোকদের নীচু সমতল ভূমিতে শান্তিপূর্ণ চাষাবাদেও আগ্রহ নেই। তারা ইতোমধ্যে পাহাড়ে ও বনে আস্তানা গড়ে নিয়েছে, যাতে লুটপাটের সুবিধা হয়। এর দশ বছর আগে ১৭৭৭ খ্রীঃ সালের ৩১মে তারিখের আরেকটি চিঠি, যেটি চট্টগ্রামের তদানিন্তন প্রধান কর্তৃক সম্মানিত বড় লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তাতে আছে, কয়েক হাজার পাহাড়ী লোক আরাকান থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে। তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্ববর্তী প্রধান প্রশাসক মিঃ বেটম্যান কর্তৃক পুনর্বাসন দানের আশ্বাসে উদ্বীপ্ত ছিলো। দেশ ত্যাগের এ জাতীয় প্রামাণ্য ঘটনাবলী বর্মী কর্তৃপক্ষের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়েছে। মেকফার্লেন লিখিত ইতিহাস পুস্তক

বৃটিশ ইন্ডিয়া'র ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে, ১৭৯৫ খ্রীঃ সালে আরেকবার ৫০০০ বর্মী সৈন্যের একটি বাহিনী কিছু বিদ্রোহী উপজাতীয় সর্দারদের, যাদেরকে তারা ডাকাত বলে, ধাওয়া করে বৃটিশ অধিকারভুক্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে হানা দেয়। আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহনকারী ঐসব সর্দারদের কয়েকজনকে ধরে তখন বর্মীদের কাছে হস্তান্তর করাও হয়, যাদের মোট তিনজনের দু'জনকে ভীষণ উৎপীড়নের দ্বারা মেরে ফেলা হয়।

মেকফার্লেন আরো উল্লেখ করেন, ১৮০৯ খ্রীঃ সালেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার সীমান্তে বিরোধ অব্যাহত ছিলো। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ সালের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত ঐসব সংঘাত কমই সফল হতে পেরেছে বা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। (উইলসন্স লিখিত 'নেরেটিভ অফ বার্মিজ ওয়ার' পৃষ্ঠ : ২৫)।

সে সময়ের সংঘটিত ঘটনাবলী ১৮২৪ সালের যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলে। দেখা যায় এসব অশান্তির সূচক হলো এমন একটি কারণ, যা বর্মীদের ধৈর্য্যচ্যুত আর দোষ গ্রহণে বাধ্য করে। নিঃসন্দেহে সে কারণটি হলো ঃ উপজাতীয় লোকদের স্বদেশ ত্যাগ ও আমাদের পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ, যা তাদের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত।

উপজাতীয় মৌলিকত্বের ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ। পেম্বারটন তাদেরকে মালয়ী বংশোদ্ভুত বলে নির্ণয় করেন। কর্নেল স্যার ফেইর অনুমান করেন, আরাকানের প্রধান যে দুটি উপজাতি, যাদের অনেককে এই পাহাড়াঞ্চলেও পাওয়া যায়, তারা মূলতঃ মায়াম্মা বা বর্মী লোকোদ্ভুত। উপজাতীয়দের নিজেদের মৌখিক পুরাকাহিনী ব্যতীত, মূল বৃত্তান্তের কিছুই লিপিবদ্ধ আকারে প্রাপ্তব্য নয়। খিয়াংথা পরিচিত লোকদেরই কেবল লিখিত ভাষা আছে। তাদের কাছে বহুসংখ্যক রাজাওং বা আরাকানের রাজাদের ইতিহাস নামক পুস্তিকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমি তাদের পর্বতবাসের জীবন বৃত্তান্তের কোন তথ্যই অবগত হতে পারিনি। অপর পক্ষে 'টংথা' নামীয়রা কোনরূপ লেখ শৈলীর অধিকারী নয়। তাদের কথাবার্তা হলো কোন মতে চাহিদা আর অনুভূতিকে ব্যক্ত করা, যা অসভ্য জীবনের অভিব্যক্তি। তাদের মৌলিকত্ব আর অতীত ইতিহাসের তথ্য স্বভাবতই অপ্রতুল আর অবিশ্বাস্য । (সূত্র : ঐ ৩২/৩৩)।

মিঃ লুইন ও কর্ণেল ফেইর আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতাত্ত্বিক। তারা নিজেদের কর্মজীবনের দীর্ঘকাল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানে সরকারী দায়িত্ব পালনে ও তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যয় করেছেন। তাদের বর্ণনাগুলোকে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ভাবা হয়ে থাকে। গত শতাধিক বছরেও তাদের বর্ণনা গুলো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বা অসত্য প্রমাণিত হয়নি। খোদ উপজাতীয় পন্ডিতদের অনেককে তাদের বর্ণনার সুত্র ধরেই নিজেদের অতীত অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতিদের অধিকাংশ আরাকানী শরণার্থীদেরই বংশধর, এদেশের আদি অধিবাসী নয়, এবং তাই তাদের আদি

জাতীয়তা বাংলাদেশী হওয়া বিতর্কিত। উপজাতি সমূহের আগমন নির্গমন ও বসবাসের মৌলিক তথ্য তাদের সংরক্ষিত কিছু দলিল প্রমাণ নিদর্শন ও চর্চিত গানের দ্বারাও প্রমাণিত হয়। তাতেও সমর্থন মিলে যে: তাদের অধিকাংশ বার্মা ও আরাকান থেকে আগত. আর অবশিষ্টরা আসাম ও ত্রিপুরার অধিবাসী। তারা শরণার্থী ও প্রবাসী থাকা অবস্থায়. বংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে. বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী. যারা কয়েক পুরুষ আগেও আইনতঃ বিদেশী আর অস্থানীয় ছিলো। তবে নতুন প্রজন্মের উপজাতি আর বাঙ্গালীরা তাদের মৌলিকত্বকে ভুলে আছে। উপজাতি সংক্রান্ত এতদাঞ্চলের প্রামাণ্য অতীত ঘটনাবলী গ্রন্থনা ও চর্চার অভাবে মারাত্মক তথ্য শূণ্যতায় সৃষ্টি হয়েছে। তাতে জ্ঞানী গুণী, সাধারণ আর সরকারী কর্মচারীরাও বটে, এতদাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিদের স্থানীয় আদিবাসী নাগরিক হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকেন। এই ভুল মূল্যায়নের ভিত্তিতেই উপজাতিরা বৈষম্য আর উৎপীড়নের অভিযোগ উত্থাপন সহ স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে সোচ্চার। অথচ অবিতর্কিত স্থায়ী নাগরিকদের পক্ষেই কেবল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার দাবী উত্থাপন করা সম্ভব। প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিদের জাতীয়তা আদি বাংলাদেশী নয়। আনুগত্যহীনতার কারণে বিহারী মুসলমানেরা যেমন বিদেশী ঘোষিত, ঠিক অনুরূপভাবে প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিরাও রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহী বলে নাগরিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য। তাতে আপত্তি করার কিছুই নেই।

এবার আমি সুধী পাঠক মহলকে ইংরেজ পন্ডিত বি আর পার্নের একটি গবেষণা তথ্য উপহার দিয়ে অবগত করতে চাই যে, চামকাদের কল্পিত মইসা গিরি বা মনিজা গিরি কাহিনীটিও একটি অতিরঞ্জিত উপাখ্যান। বর্ণিত তথ্যটি নিরপেক্ষ ও সরকারী গোয়েন্দা রিপোর্টের দ্বারা সমর্থিত। মইসাগিরি ঘটনার কার্যকাল, বাংলায় বৃটিশ শাসন শুরুর অর্ধ শতাব্দীর ভিতরই নির্ণীত হয়। বি আর পার্নের বর্ণনাতে খাটি ও নিভুর্লযোগ্য হওয়ার সমুদয় গুণই সন্নিবেশিত আছে। তাতে প্রমাণিত হয় চাকমাদের দাবীকৃত প্রাচীন জাতীয় রাজ্য মইসাগিরি আদতে আরাকান ভাগের নাফ নদী তীরে অবস্থিত একটি ছোট্ট ভূভাগ মাত্র, যা সেখানে মুরুসুগিরি নামে অভিহিত ছিলো। তা ঐ নামের জনৈক স্থানীয় সর্দারের নিজ নামে অভিহিত ভূসম্পত্তি। রাজ্য হওয়ার যোগ্য বিরাট কোন ভূভাগ নয়। তাদের দাবীকৃত অপর জাতীয় রাজ্য ও রাজধানী আলী কদমের বেলায় ও অনুরূপ বিভ্রান্তি বিদ্যমান। বাংলার ইতিহাসের দ্বারা এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়া ও ডে বারোজের বর্ণিত কোদা-ভোস-কাম আসলে একতাঞ্চলীয় হোসেন শাহী শাসন কর্তা খোদা বখশ খান, এবং লোভাস ডোকাম কার্যতঃ তারই শাসিত অঞ্চল ও সদর দফতর আলী কদম। চাকমারা বড়জোর ঐ মুসলিম শাসক ও রাজ্যের আশ্রিত ভক্ত প্রজা হয়ে থাকবে। কথিত চাকমা অঞ্চলটি বার্মা বা আরাকান অভ্যন্তরের দখলকৃত মুসলিম উপনিবেশ হওয়াও সম্ভব। চাকমা লোকহাহিনীতেও স্বীকৃতি আছে যে, মগদের উৎপীড়ণে বিতাড়িত হয়ে তারা চট্টগ্রামের মুসলিম শাসিত অঞ্চলে আশ্রয় ও সাহায্য লাভ করে।

এই সুবাদে মুসলিমরা তাদের স্বপক্ষ এবং মুসলিম শাসিত অঞ্চলই তাদের স্বরাজ্য বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ তাদের মাঝে তখন মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্কের শিথিল বন্ধন কার্যকরও ছিল। যার প্রতিফলন হিসাবে মুসলিম নাম খেতাব, ভাষা ও আচার আচরণের অভ্যাস গড়ে ওঠে, যা থেকে তারা বর্তমান বিরূপ পরিস্থিতিতে ও মুক্ত নয়।

মিঃ বি আর পার্নের উদঘাটিত তথ্যটি এবার পতিধান যোগ্য যথা ঃ

Thirteen years before at the time of the mogh immigrations of 1798, an Arakanese chief who was known to the English as 'moorusugeeree' had flied into Chittagong' followed by many adherents' for he had been popular with his people. It was he who had invited king bodawpaya to seize the crown of Arakan; but he had quarrelled with the Burmese and had settled with the permission of the Company's officers at hurbung. The English knew him as 'Moorusugeeree which they thought: was his name, whereas it is evidently the title 'Myothugyi'. His real name was Nga Than De. He had a son named chin Pyan, who was called by the English 'King bering'. or King-buring'. Chin Pyan's own account of his father and of himself is as follows :

In 1146 Mogh the country of Aracan was overrun with plunderers. In consequence my father addressed a letter to the King of Ava who sent an army and took possesion of Arracan. The king looking on my father as a person of royal blood, put him in possession of the Government of Arracan, retaining only the name of sovereign to himself. In 1160 (Mogh) the said king demanded from my father a quota of 20,000 muskets and 40,000 men to make war on Siam. My father consented to furnish the half of this demand. The King was angry at not getting the whole, and seized my brother and killed him. On this account my father with his relatives and friends, and all his adherents, consisting of most of the inhabitants of that country, emigrated. My father died. We sought refuge in the English territory, and I concealed mayself at Hurbung. Mr. Cox at this time came to Ramoo by order of the Government and distributed food and imple-

ments for cutting the jungles, to all the Moghs. They cultivated the ground and thus earned a subsistence. Mr. Cox made every search for me, but through the operation of my civil destiny he did not find me. After the death of my father, my mother took everything he possessed. I got nothing.

Chin pyan's father had apperently before he fled to Hurbung owned an area of land near the banks of the Naaf river, which formed the boundary between Indian and Burmese territory. This land derived from its owner the name of 'Moorusugeeree'. When he fled from Arakan. Nga Then De had abandoned his property, but early in the year 1811 Chin pyan left Hurbung and took possession of it. professing to act as agent for a mohammedan, Saddodeen Chaudry', who had induced the Collector of Chittagong to give him documentary recognition of his ownership. Although, it whould appear, the Collector did not know exactly where the land was.
(Ref : Journal of Burma Research Society : the king Bering Page 44/48) dated 13.11.1933.

'মগদের ১৮৯৮ খ্রীঃ সালে অনুষ্ঠিত স্বদেশ (আরাকান) ত্যাগের তের বছর আগে, একজন আরাকানী সর্দার, যিনি 'মুরুসুগিরি নামে ইংরেজদের কাছে পরিচিত ছিলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। বহুসংখ্যক অনুসারীও তার সঙ্গী হয়। তিনি নিজের ঐ জনগণের মাঝে জনপ্রিয় ছিলেন। বার্মার রাজা বোদাপায়াকে আরাকানের সিংহাসন দখলের জন্য তিনি আহ্বান করে আনেন। তবে তিনি বর্মীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন, ফলে (ইষ্ট ইন্ডিয়া) কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অনুমতিক্রমে হারবাং অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। ইংরেজরা তাকে মুরুসুগিরি হিসাবে জানতো, যা তার নাম বলেই তাদের ধারণা ছিল। অথচ এ প্রমাণ আছে যে, তার উপাধি ছিলো মাইয়োথুগ্যি (সম্ভবতঃ মৈসাগিরি) আসল নাম গো থান দে। চীন পিঁয়া নামীয় তার এক ছেলে ছিলো যাকে ইংরেজরা রাজা বেরিং বা বারিং নামে ডাকতো। চীন পিঁয়ার নিজের বর্ণনায় তার বাবা ও নিজের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

১১৪৬ মঘী সনে (১৭৮৪ খ্রীঃ) আরাকান দেশটি অরাজক লোকদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। সে পরিস্থিতিতে, আমার বাবা আভার রাজাকে একখানা চিঠিতে আহ্বান করেন, যিনি একদল সৈন্য পাঠিয়ে আরাকান দখল করে নেন। রাজা আমার বাবাকে রাজরক্তের অধিকারী দেখে আরাকান সরকারের প্রাধান্য প্রদান করেন, এবং নিজের অধিকারে শুধু সার্বভৌম ক্ষমতাই রাখেন। ১১৬০ মঘী সনে (১৭৯৮ খ্রীঃ) শ্যাম

দেশের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজা আমার বাবার কাছে ২০,০০০ আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী চেয়ে পাঠান। তাতে তিনি অর্ধেক পর্যন্ত দাবী পূরণের সম্মতি জানান। পরিপুর্ণ দাবী পূরণ না হওয়াতে রাজা রুষ্ট হোন ও আমার ভাইকে আটক এবং পরিশেষে হত্যা করেন। এহেতু বাবা নিজের সমূদয় স্বজন পরিজন ও অনুসারীদের সহ স্বদেশ ত্যাগ করেন, যারা সংখ্যায় ছিলেন, সে দেশের গরিষ্ঠ অধিবাসী। বাবা মারা যান। আমরা ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে আশ্রয় নেই ও আমি নিজেকে হারাবাং অঞ্চলে গোপন করি। মিঃ কক্স এ সময় সরকারের আদেশে রামুতে আসেন এবং খাদ্যবস্তুসহ মগ বসতির ভিতর জঙ্গল পরিষ্কারের যন্ত্রাদি বিতরণ করেন। তারা জমিগুলোতে চাষাবাদ শুরু ও তাতে জীবিকার সংস্থান করে নেয়। মিঃ কক্স গভীরভাবে আমার অনুসন্ধানে লিপ্ত হোন। কিন্তু আমার প্রকাশ্য আস্তানার সন্ধান ও আমার সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হোন। আমার বাবার মৃত্যুর পর, তাঁর পরিত্যক্ত সবকিছুই আমার মা নিজে হস্তগত কনে নেন। আমি তার কিছুই পাইনি। অতঃপর মিঃ বি আর পার্ন মুরুসুগিরি অঞ্চল সম্বন্ধে নিম্নরূপ অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেন, যথাঃ হারবাং অঞ্চলে পলায়নের আগে নাফ নদীর তীরে চীন পিঁয়ার বাবার প্রকাশ্য বিশুদ্ধ মালিকানাধীন একখন্ড ভূ-সম্পত্তি ছিলো, যা ভারত ও বার্মার মধ্যবর্তী সীমান্ত চিহ্নিত করে। এই জায়গাটি তার মালিকের পরিচয় বহন করে একই মুরুসুগিরি নামে অভিহিত ছিল। ১৮১১ খ্রীঃ সালের শুরুতে চীন পিঁয়া হারবাং ত্যাগ করে এই বলে ঐ জায়গাটির দখল নেন যে, তিনি জনৈক মুসলিশ সাদুদ্দীন চৌধুরীর প্রতিনিধি, যিনি চট্টগ্রামের রাজস্ব কর্মকর্তাকে এ জমির মালিকানা দলিল অণুমোদনে বশিভূত করেন। যদিও মনে হয়, ঐ রাজস্ব কর্মকর্তা, জায়গাটির অবস্থান কোথায় তা সঠিকভাবে অবগত ছিলেন না। স্ক (সুত্র ঃ জার্নাল অফ বার্মা রিসার্চ সোসাইটি পৃঃ ৪৪-৪৮ তাং-২৩/১১/১৯৩৩ খ্রীঃ)।
তৎপর মিঃ বি আর পার্ন, বর্ণিত চীন পিঁয়া ও তার অসংখ্য অনুসারীদের বাংলার সীমান্ত অভ্যন্তরে ও আরাকানের গভীরে উপর্যুপরি অরাজকতা ও অভিযান পরিচালনা, ও তদ্বারা বার্মা সরকারের সাথে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি ও বিরোধের বর্ণনা প্রদান করেছেন।

তাতে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুরুসুগিরি তথা মইসাগিরি ও তার সাথে সম্পর্কিত চাকমা ও অন্যান্য জনসাধারণের মৌলিক আবাসক্ষেত্র বাংলাদেশ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তিকালের কাছাকাছি সময় কাল যখন বৃটিশ শাসনের প্রায় চার দশক অতিবাহিত, তখনো বাংলাদেশ অঞ্চলে চাকমাদের আগমন নির্গমন অব্যাহত ছিলো। অতএব এটা সন্দেহাতীত যে, চাকমা ও তাদের সঙ্গীসাথী উপজাতিরা আসলে বিদেশী আরাকানী বংশোদ্ভূত। এবং তাদের বহুল কথিত রাজা মৈসাং আসলে উপরে বর্ণিত মৈথুগ্যি বা মৈসাগিরি যিনি ব্রিটিশ আমলের লোক।
চাকমাদের সম্পর্কে অপ্রিয় হলেও আরো দায়িত্বশীল বক্তব্য আছে, যথা ঃ

1. The Most reasonable account of their origin is that they

are the products of unions between the Nowab Saista Khan's solders and mogh women and that the caste or clan was formed within the last 200 years or so,
(Ref : Selection from the correpondence on the revenue administratin of Chittagong Hill Tracts, Page : 276

বাংলা ঃ তাদের মৌলিকত্বের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা হলো, তারা নবাব শায়েস্তা খাঁর সৈন্যবাহিনী ও মগ স্ত্রীলোকদের পারস্পরিক মিলনজাত প্রজন্ম। গত দুশত বছর বা অনুরূপ সময়ের ভিতর তাদের বর্ন ও শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হয়েছে।
(সুত্র ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত চিঠিপত্র সংগ্রহ, পৃঃ ২৭৬).

2. The Chakma's are mongolied race, probably of Arakanies origin, though they have inter merried largely with Bengalies. They are divided in three subtribes : Chakma, Duingnak and Tanchangya. The Duingnak broken away from the main tribe a century ago, and flied to Arakan. Of later years some have returned to cox's bazar sub-division of Chittagong districts.

(Ref : Provincial Garatteer of India Page : 410/1941)

বাংলা ঃ চাকমারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক, সম্ভবতঃ আরাকানী মূল থেকে উদ্ভূত। যদিও তারা বাঙ্গালীদের সাথে ব্যাপকভাবে আন্তঃ বিবাহে আবদ্ধ। তারা নিজেদের মাঝে তিন শাখা উপজাতিতে বিভক্ত যথা ঃ চাকমা, ডুইংনাক ও তঞ্চঙ্গ্যা। শতাব্দীকাল আগে ডুইংনাকেরা মূল সমাজ থেকে পৃথক হয়ে আরাকানে চলে গিয়েছিলো। কয়েক বছর আগে তাদের কিছু লোক পুনরায় চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার মহকুমায় ফিরৎ এসেছে। (সুত্র ঃ প্রভিন্সিয়েল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪১০/১৯৪১)

3. The tribes consider themselve descendants of emigrants from Bihar who came over and settled in this parts in the days of the Arakanies kings.
(Ref : An account of Chittagong Hill Tracts. by S. H. Hutchinson, Page 89)

বাংলা ঃ এই উপজাতীয় লোকজন নিজেদেরকে দেশত্যাগী ঐ সব বিহার বাসীদের বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভূখন্ডে আরাকানী রাজাদের শাসন কালে এসে আবাস গড়ে নিয়েছে। (সূত্র ঃ এন একাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ঃ এস. এইচ. হ্যাচিনসন, পৃঃ ৮৯)

৪। তখন এতদাঞ্চলে (আরাকানে) কিছু পশ্চিমা লোক বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাদের অনেকের উপাধি ছিল শেখ, যা থেকে থেক বা স্যাক নামের উৎপত্তি হয়েছে।

(সূত্র ঃ জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল সংখ্যা ১৪৫/১৮৪৪, পৃঃ ২০১-২ কর্নেল ফেইর লিখিত প্রবন্ধ)

৫। চাকমারা মগ নারী ও মোগল সৈনিকদের মিলনজাত বংশধর। সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমাদের অনেকে মোগল ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের অনুগত হয়, এবং খোদ চাকমা প্রধানরাও মুসলমানী নাম ও খেতাব ধারণা করেন। পরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, ফলে তারা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং শেষাবধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে, এবং হিন্দু প্রভাব অন্তর্হিত হয়। (সূত্র ঃ সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৩১ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ)

৬। চাকমারা আধাবাঙ্গালী তাদের পোষাক পরিচ্ছদ আর ভাষাটিও এক জাতের বিকৃত বাংলা। এতদভিন্ন তাদের উপাধিসহ নামগুলো পর্যন্ত এমন বাঙ্গালী ভাবাপন্ন যে, তজ্জন্য তাদেরকে বাঙ্গালী থেকে ভিন্ন করা প্রায় অসম্ভব।

(সূত্র ঃ (১) মিঃ জীম বীম সেন কমিশনার চট্টগ্রাম এর চিঠি নং-২২৭ এইচ/তাং ৫/৯/১৮৭৯)

(২) চাকমা জাতির ইতিবৃত্তঃ বিরাজ মোহন দেওয়ান পৃঃ ১১

৭। প্রচলিত মগ জনশ্রুতি ঃ কোন এক সময় চট্টগ্রামের জনৈক উজির আরাকান রাজার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। পথিমধ্যে এক শুদ্ধাচারী ফুঙ্গী, উজির সাহেবকে আহারের নিমন্ত্রণ দেন। খাবার দিতে দেরী হওয়ায় উজির সাহেব জনৈক সৈনিককে তার কারণ অনুসন্ধানে পাঠান। সৈনিকটি ফিরে এসে তাকে জানায় যে, ফুঙ্গী নিজের পা চুলাতে স্থাপন করেছেন ও তা থেকে আগুন জ্বলছে। এই সংবাদে উজির সাহেব রাগান্বিত হয়ে চলে যান। ইতোমধ্যে ফুঙ্গী খাদ্যাদিসহ এসে দেখেন উজির সাহেব ও তার সঙ্গীরা নেই। তাতে তিনি মনোক্ষুণ্ন হয়ে অভিশাপ দেন। পরিশেষে উজির সাহেব সসৈন্যে পরাজিত ও বন্দী হোন এবং মগ রাজার অনুমতিক্রমে সসৈন্যে মগ মহিলাদের বিবাহ করে, সে দেশে অন্তরীণ হয়ে থাকেন। চাকমারা ঐ তাদেরই বংশধর। (সুত্র ঃ চাকমা জাতি, সতীশচন্দ্র ঘোষ পৃঃ ৫)

৮। প্রবল জনরব বিদ্যমান যে, চাকমা রাজা ধরম্যা বা ধারা মিয়ার সাথে কোন এক বিশিষ্ট মোগল সেনাপতির কন্যার বিবাহের সম্পর্ক ঘটে। এর ফলে চাকমা সমাজে মুসলমানী আচার ব্যবহার ইত্যাদি প্রবিষ্ট হয়। মুসলমান রাণীর গর্ভজাত বলে, তৎপুত্র মোগল্যা নামে পরিচিত হোন। ঐ সময় থেকেই চাকমা রাজবংশে খাঁ ও বিবি উপাধির প্রচলন শুরু হয়েছে। (সূত্র ঃ চাকমা জাতির ইতিবৃত্তঃ বিরাজ মোহন দেওয়ান পৃঃ ৬৪)

৯। বার্মা সাম্রাজ্য তখন তিন দেশে বিভক্ত ছিলো, যার একটি ছিলো চাকমা রাজার অধীন। (সূত্র ঃ চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস ঃ রাজা ভুবন মোহন রায়)।

৮। বাঙালী বনাম অবাঙালী নিয়তি।

প্রকৃতি ও সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার প্রাচুর্য্যে বাস করে ও স্থানীয় অবাঙালীদের অভাবী অশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যহীন থাকা দুর্ভাগ্যজনক। অবশিষ্ট বাংলাদেশীদের পক্ষে, এখানে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো দুষ্পাপ্য আর ঈর্ষনীয়। এখানে কি কি সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় তা নয়, বরং কি কি দেয়া হয় না, তাই বিবেচ্য। তবু এখানে দুর্গম পাহাড়াভ্যন্তরে অভাবী, অশিক্ষিত, রোগ জ্বর-জ্বর, অপগন্ড লোকের সংখ্যা প্রচুর, যাদের দুরবস্থা দেখে করুণার উদ্রেক হয়। বনের শিকড় আর লতা পাতা না থাকলে, দুর্ভিক্ষ অনটনে, একেক সময়, এদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটতো।

গভীর ও উঁচু পাহাড় বনের বাসিন্দাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন, এখনো জুম চাষ। সেই প্রাচীনকালের মত, এখন আর জুমে, প্রচুর ফল ফসল ফলে না। বন বাদাড় কমে গেছে। পাতলা বনের পোড়া স্বল্প ছাই ও আবর্জনা, জমির উর্বরতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে পারে না। তাই জুমে ফল ফসলের উৎপাদন কম হয়। পেশাগত অনগ্রসরতা আর অলসতা ও দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ। যে অগাধ বনজ সম্পদ আর্থিক স্বচ্ছলতা দিতে পারতো, জুম চাষের স্বল্প লাভের বিনিময়ে তাই তারা হামেশা অবাধে ধ্বংস করছে। প্রকৃতিতে নিহিত জীবিকা নির্বাহের উপায় ও উপকরণ আর সহজলভ্য সুযোগ সমুহ, মাত্র ক্ষুৎপিপাসা নিবারণেই ব্যবহৃত হচ্ছে। সঞ্চয় ও সম্পদ সৃষ্টির কাজে তা তারা নিয়োজিত করছে না। পেশা ও কারিগরি দক্ষতা অর্জনে এখনো তারা সচেষ্ট নয়। ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা এখনো পিছিয়ে আছে। সঞ্চয় আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে শূণ্য থেকে পুর্ণ হওয়ার বাস্তব জ্ঞান তাদের নেই। কঠোর শ্রমের লাগাতার অনুশীলন, সঞ্চয় আর মিতব্যয়িতা নয়, স্বল্প আর খন্ডকালিন শ্রম, এবং অযাচিতে তাৎক্ষণিক বড় অংকের লাভই তাদের অধিকাংশের লক্ষ্য। এ কারণেই স্থানীয় পেশা, ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, তারা অধিক হারে অনুপস্থিত। উন্নয়নমূলক বিশাল বিপুল কর্মকান্ডে তাদের ভূমিকা নগণ্য আর চাকুরীতে সীমাবদ্ধ। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিপুল অংকের উন্নয়ন ব্যয়ের ব্যবহারিক অংশ তাদের ভাগে অতি সামান্যই জুটে। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, আর চরিত্রগত পশ্চাদমুখীতা, স্থানীয় অবাঙালীদের ভাগ্য পরিবর্তনের পক্ষে প্রধান বাধা। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্ম উন্নয়নের অভাবকে, অন্য কোন বিকল্পের দ্বারা পুরণ করাও সম্ভব নয়। তাদের ভাগ্যোন্নয়নে প্রকৃতি চতুর্দিক থেকে নিজ সম্পদ উজাড় করে দিলেও, এবং মাত্র একটি দা আর একটি কুড়ালের অবলম্বনে বনাঞ্চলের বিপুল গাছ, বাঁশ, লতা পাতা ইত্যাদি করায়ত্ত থাকলেও, এবং সরকারী দান অনুদান, ঋণ, আর কল্যাণ প্রচেষ্টায় প্রদত্ত বিপুল সুযোগ-সুবিধা, সহজপ্রাপ্য হলেও তা সুফল দানে ব্যর্থ হচ্ছে।

বস্তুত ঃ স্থানীয় সংখ্যালঘুদের ভাগ্য, তাদের অগণিত সীমাবদ্ধতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

গুণগত উৎকর্ষতা ছাড়া এই পশ্চাদপদতা কাটান সম্ভব নয়। পেশা ও লেখাপড়ায় দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে লাগাতার কঠিন পরিশ্রম ব্যবসা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া তাদের ভাগ্যোন্নয়নের বিকল্প কোন পথ নেই। এখানে সরকার বা অন্য কোন পক্ষ অন্তরায় নয়।
চারিত্রিক গুণ ও অর্জিত যোগ্যতা, মানুষকে সব রকমের প্রতিকূলতার মাঝেও প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে। আত্ম উন্নয়নের এটাই প্রধান পুঁজি। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের বন্যা প্রবাহিত হওয়া সত্বেও, তার আর্থিক সুফল লাভ থেকে উপজাতীয়রা অনেকাংশে বঞ্চিত। কারণ এটা দানযোগ্য নয়, অর্জনযোগ্য বিষয়।

লেখাপড়া ও চাকুরীতে বেশ অগ্রসর হলেও বিভিন্নমুখী পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে এই অবাঙালীরা সঙ্কুচিত। সরকারিভাবে তাদের অনেককে, পেশাদারী কাজের প্রশিক্ষণ, ঋণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। তবু ছোটখাটো পেশায় স্বউদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিতে হয়, নিজস্ব বিনিয়োগও লাগে। এভাবে অর্জিত দক্ষতা আর রোজগারকে সংগঠিত আর বহুমুখী করাই ভাগ্যোন্নয়নের উপায়। ভাগ্যোন্নয়নের এই ধারাগুলোর অনুশীলনে স্থানীয় অবাঙালীরা উদাসীন।
এই অঞ্চল বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কাঠ, বাঁশ, লতা-পাতা ইত্যাদি হলো বিভিন্ন শিল্পপণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল। বর্ণীত বনজ সম্পদ ভিত্তিক বিভিন্ন পেশা ও কুটির শিল্প, রোজি রোজগারের বহুমুখী উপায় হওয়ার যোগ্য। কিন্তু স্থানীয় অবাঙালীরা তার স্থুল ব্যবহারেই অভ্যস্ত। দা, কুড়ালে কেটে এনে বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া কিছুই তাদের জানা নেই। অথচ সারা বাংলাদেশ জুড়ে এরই বিভিন্নমুখী ব্যবহারের সাথে জড়িত বহু লক্ষ শিল্পী কারিগর আর নির্মাণ কর্মী মোটা অংকের রোজি রোজগারে জীবিকা নির্বাহ করছে।

এতদাঞ্চলের নদী-নালা আর কর্ণফুলী হ্রদ, সমৃদ্ধ মৎস্য ভান্ডার। এগুলো নৌপথ হিসেবে ও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে মৎস্য ধরা ও নৌ-পরিবহন, রোজি রোজগারের অন্যতম উপায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্থানীয় অবাঙালিরা অনুৎসাহী। বহিরাগত বাঙালী মৎস্যজীবীরা মাছধরা ও তা বাজারজাত করার কাজে প্রায় একচেটিয়া ভাবে নিয়োজিত। নৌকা, সাম্পান ও লঞ্চে যাত্রী ও মাল পরিবহন একটি সমৃদ্ধ পেশা হলেও তৎপতি ও অবাঙালীরা অনাগ্রহী। মাঝি মাল্লা, মিস্ত্রি, খালাসী, সারেং সুকানী ইত্যাদি জাতের লোকও তাদের মাঝে বিরল। এক্ষেত্রটিও বাঙালীদের প্রায় একচেটিয়া দখলাধীন। এ দুটি ক্ষেত্রে তাদের স্থলে হাজার হাজার বাঙালীর কর্মসংস্থান এতদাঞ্চলেই বিদ্যমান।

স্থানীয় বাজার-হাট, শহর-বন্দরগুলো পণ্য খরিদ বিক্রির সমৃদ্ধ ঘাটি। তাতে বনজ, কৃষি ও শিল্পপণ্য ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামালের খরিদ বিক্রি একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। এই বিপনী কেন্দ্রগুলোতে বসার জায়গার সুযোগ লাভে, স্থানীয় অবাঙালীদের অগ্রাধিকার আছে। ঋন গ্রহণ ও স্বউদ্যোগে কিছু পুঁজির

যোগাড় করাও তাদের অনেকের পক্ষে অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ তারা প্রাপ্ত দোকান ভিটা লাইসেন্স পারমিট ও সরঞ্জামাদি কিছু নগদ প্রাপ্তির বিনিময়ে বাঙালীদের কাছে বিক্রয় করে দেয়। ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়ের অভাবে দোকানে বা ব্যবসাস্থলে বসে, ধীরে ধীরে খরিদ-বিক্রি করা, তাদের ধাতস্ত নয়। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকেও তারা নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে।

সরকারের উন্নয়নমূলক ব্যয় বহুল নির্মাণ উদ্যোগগুলোতে, সাধারণ শ্রমিক থেকে, দক্ষ প্রকৌশলী পর্যন্ত বিপুল জনশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু স্থানীয় অবাঙালীরা সে জনশক্তি যোগাতে অক্ষম। কোন নির্মাণ কাজেই শ্রমজীবী ও প্রকৌশলী হিসেবে তাদের পাওয়া যায় না। ফলে রাজমিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, আরাকশি, ইটের কারিগর, মাটিয়াল, প্রকৌশলী ইত্যাদি নির্মাণ কর্মী ও শ্রমিক মাত্রই বাঙালী না হলেও তাতে অবাঙ্গালীদের সংখ্যা নগণ্য।

প্রাপ্ত জায়গা জমিগুলোতে কোন মতে কিছু ফল ফসল উৎপাদন ও খাওয়া পরা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অতিরিক্ত শ্রম দিতে তারা অনভ্যস্ত। বছরের মাস তিনেক পরিশ্রম, উৎপাদন, ও তৎপর বাকি প্রায় নয় মাস অলস ভোগে কাটিয়ে দেয়াই হলো জুমিয়া জীবনের চিরাচরির অভ্যাস। এটাই তাদেরকে গরীব ও শ্রম বিমুখ করে রেখেছে।

পেশাতেও তারা বিস্তর বাছবিচার করে। কৃষি, চাকুরী ও বনজ দ্রব্য আহরণ, এই তিন পেশাতেই তাদের রোজি রোজগার গন্ডিভূত। রাজা উজির না হলেও তারা মুচি, মেথর, জেলে, মাঝি, কুলি, মজুর, কুমার, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি ইতর পেশাজীবী হতে নারাজ। অথচ তাদের চোখের সামনেই একজন বাঙালী সামান্য কুলি থেকে অধ্যবসায়, সঞ্চয় ও পেশাগত সততার গুণে, ধনাঢ্য সওদাগরে পরিণত হচ্ছে। একজন নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী হচ্ছে শিল্পপতি, আর ভবঘুরে চালচুলাহীন ব্যক্তি সমাজ পতির মর্যাদায় উন্নীত হচ্ছে। বাঙালীদের উক্ত ভাগ্যোন্নয়ন অলৌকিক ঘটনা নয়। তারা কারো কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিয়ে ভাগ্যবান ও নয়।
বস্তুতঃ স্থানীয় মঙ্গোলীয় সমাজের চাহিদার ক্ষেত্রে এমন অনেক শূণ্যতা বিদ্যমান, যা তাদের কারো দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। ঐ চাহিদার শূণ্যতাকে অনুসরণ করেই বাঙালীরা এখানে উপস্থিত এবং খোদ অবাঙালীদের সহযোগিতায়ই বাঞ্ছিত শূণ্য স্থান পুরণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। এভাবে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, বিপনন ও শিল্প ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় সমাসীন। বাঙালীদের বর্তমান অগ্রণী ভূমিকা ও সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের শক্তি বৃদ্ধির সহযোগী উপসর্গ মাত্র, প্রধান অবলম্বন নয়।
যতই উচ্চবাচ্য করা হোক না কেন, এতদাঞ্চলে বাঙালী উপস্থিতি শূণ্যতা পূরনের প্রয়োজনে অবাঙালীদের দ্বারাই রচিত। অতীতের কিছু হিন্দু কুসিদজীবীর শোষণ ও অত্যাচার বাদে, চিরকাল অধিকাংশ বাঙালী স্থানীয় অবাঙালীদের সুহৃদই ছিলো এবং

এখনো তারা তাই আছে।

৯। উপজাতীয় দাবী দাওয়া ও স্বাতন্ত্র্যের রহস্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরকারী উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ণয় অত্যাবশ্যক। সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে, অতীতে তারা অবহেলিত ছিলো। কিন্তু আজকাল তারা আর নগণ্য করুণার পাত্র নয়। নিজেদের শক্তিমত্তাই তাদেরকে গুরুত্ব দান করেছে। তাদের দাবী হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের নিজস্ব অঞ্চল। এখানে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও সংখ্যা প্রাধান্য আছে, তাই তারা ন্যায়তঃ স্বশাসন বা সায়ত্তসামন ক্ষমতা লাভের অধিকারী। এই অঞ্চলে অস্বাভাবিক ভাবে বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ ঘটেছে ও ঘটছে যদ্বারা উপজাতীয়দের অস্তিত্ব আর অধিকার বিপন্ন। এরই রক্ষাকবচ আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এটাই উপজাতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের মূল কথা।
এই আন্দোলনটির মূল প্রবক্তা বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। এটাকে বিজয়ী চরিত্র দানের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ আমলের শুরুতে ১৯৭২ খ্রীঃ সালে, তৎকর্তৃক জন সংহতি সমিতি ও তার অঙ্গসংগঠন সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রে উপজাতীয় বিদ্রোহী চরিত্র পুর্বাপর সম্পর্কহীন বা আকস্মিত কিছু নয়। এই বিদ্রোহ প্রবণতা, অন্যতম স্থানীয় ঐতিহ্য। এই বক্তব্যটি বুঝার পক্ষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ইতিহাস উপস্থাপন দরকার। নয়তো এটা সস্তা বুলি মনে হবে। বাস্তব ভিত্তিক একটি মীমাংসা নিরূপণে এবং সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য লাভের প্রয়োজনেও বটে, বিষয়টির পর্যালোচনা আবশ্যক। খন্ডিত আর পক্ষপাতপুর্ণ চিত্র ইতিমধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে রেখেছে, যা খন্ডন করা জরুরী। সুতরাং এখানে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও পরিপুর্ণ ইতিহাস উপস্থাপন অপরিহার্য্য। এখানে সংখ্যাগত প্রাধান্য ও ক্ষমতার প্রভাব গুণে, চাকমা ও মার্মারাই সর্বাধিক রাজনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী। শান্তি আর অশান্তির পরিবেশটিও তাদের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই আলোচনায় চাকমা ও মার্মারাই মুখ্য।

উপজাতীয় পন্ডিতদের দ্বারা লিখিত নিজেদের ইতিহাস, ভুল তথ্য আর অতিরঞ্জন মন্ডিত। হাল আমলে উদঘাটিত দলিল প্রমাণগুলো, নির্ভরযোগ্য ভিন্ন তথ্যই প্রদান করে। এখানে তাই প্রামাণ্য আঞ্চলিক ও উপজাতীয় ইতিহাস আলোচিত হলো।

অতীতে কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম নামের কোন স্বতন্ত্র অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিলো না। ১৮৬০ খ্রীঃ সালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে, চট্টগ্রামকে সমতলে ও পাহাড়ে বিভক্ত করে, সীমান্তবর্তী পূর্বাঞ্চলকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাম দেয়া হয়। তখন এতদাঞ্চলের পরিচয় জ্ঞাপক কোন পৃথক নাম না থাকায়, চট্টগ্রাম নামকেই পর্বতের দ্বারা বিশেষিত করে, এতদাঞ্চলের পৃথক পরিচয় চিহ্নিত হয়। অঞ্চলটি দুর্গম পর্বত সংকুল। এটা এ কারণে সীমান্তবর্তী অধিক দুর্গমও পর্বত সংকুল ত্রিপুরা লুসাই ও

আরাকান থেকে ও বিচ্ছিন্ন। এর অধিবাসীরা পর্বত ঢালে অবস্থিত সুগম নিম্নাঞ্চলের বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয়ভাবে এতদাঞ্চলের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রি ও রপ্তানী এবং প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানীর মাধ্যম হলো সংলগ্ন নিম্নাঞ্চল ভূক্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল ও তথাকার অধিবাসী জনগোষ্ঠী। এ চাহিদা পূরণের আর কোন সহজ বিকল্প নেই। সুতরাং এ পর্বতবাসীদের ভাগ্য প্রকৃতিগতভাবেই বাংলাদেশও বাঙ্গালীদের সাথে গ্রথিত। ইচ্ছা অনিচ্ছা এখানে পরাভূত। যেহেতু নিম্নাঞ্চলের প্রধান অধিবাসী বাঙ্গালী আর এই অঞ্চলের লোক স্থানীয় ভাবে অভিবাসী এবং এতদাঞ্চল সেই চট্টগ্রামেরই বিচ্ছিন্ন অংশ, সেহেতু এটা মূলত বাঙ্গালীরই স্বাদেশ ভূমি। আগেকার জন-বিরলতা, শুধু বাঙ্গালীর ক্ষেত্রেই নয়, উপজাতীয়দের বেলায়ও প্রযোজ্য ছিলো। বৃটিশ আমলের প্রথম অর্ধেককাল পর্যন্ত, এতদাঞ্চলের প্রধান ও প্রভাবশালী সম্প্রদায় ছিলো কুকি জনগোষ্ঠী, যারা এখনো- সর্বাধিক ক্ষুদ্র স্থানীয় সম্প্রদায় হয়ে টিকে আছে। বৃটিশ শক্তির দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বহিরাগত উপজাতীয়দের বিপুল সংখ্যায় অভিবাসন দান, এতদাঞ্চলে উপজাতীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। প্রাকৃতিক দুর্গমতা, আইনী বাধা বিপত্তি, জন্তু আনোয়ারের ভয়, সংক্রামক রোগ, সমাজহীনতা, আর সমতলে জমি-জমার সহজ প্রাপ্যতাকেই, অতীতে এতদাঞ্চলের বাঙ্গালী বিরল অনাবাদী থাকার কারণ বলে ভাবা যায়। তাদের বিপরীতে উপজাতীয় জনসংখ্যা ও যথেস্ট ছিলো না। এখানে উপজাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির আকস্মিক প্রধান কারণ হলো ঃ ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ সালে অনুষ্ঠিত বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক আরাকান দখল ও তথাকার উদ্বাস্তুদের নিয়ে বার্মা ব্রিটিশে পারস্পরিক যুদ্ধ, এবং বৃটিশদের ধর্মীয় ঔপনিবেশিক স্বার্থ, যদ্দরুণ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আরাকানী বাস্তুত্যাগ করে সীমান্তবর্তী এই বাংলাদেশ অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে, যাদের অধিকাংশ কখনো স্বদেশে ফিরৎ যায়নি। উপনিবেশবাদী এদেশীয় ইংরেজ শাসকদের উৎসাহে, ঐ শরণার্থীদের অধিকাংশ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পটুয়াখালী অঞ্চলে, পুনর্বাসিত হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী কুকি ও বাঙ্গালীরা অকস্মাৎ কৃত্রিমভাবে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যায়। এটাই এতদাঞ্চলের উপজাতীয়দের সংখ্যা প্রাধান্যের রহস্য।

বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চলে বেআইনী বহিরাগত বা অনুপ্রবেশকারী, উপজাতীয়দের এ দাবীর বিপরীতে ইতিহাসই সাক্ষী যে, তারা নিজেরাই বহিরাগত। উপজাতিদের বিতর্কিত নাগরিকত্ব, সরকারি আনুকূল্যে এখানে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। বাঙ্গালী অধিকার ও আবাসনের প্রতি তাদের আপত্তি হলো অনধিকার চর্চা। অধিকন্তু তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি তারা অসহিষ্ণু এবং বাঙ্গালীরা তাদের হাতে নৃশংসভাবে নিগৃহীত।

বগিরাগত উপজাতীয় জনস্রোত কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে গ্রাস করেছে তার প্রামাণ্য নিরপেক্ষ বিরবণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

'অনুমান করা হয়, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে, বর্মী আক্রমণের ফলে,

আরাকানের দুই তৃতীয়াংশ লোক, পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে আসে।..... চামকারা ঐ আরাকানী উদ্বাস্তুদের একটি অংশ.....।'
(সূত্র ঃ ট্রাইবস্‌ম্যান অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস; প্রঃ পিয়ের বেসানেত, পৃঃ/৯ (অনুবাদঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি)

যেহেতু উপজাতীয় জনগণের অধিকাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত, তাদের এদেশীয় নাগরিকত্ব মৌলিক নয়, তাই অতীতে তাদেরকে বসবাস করতে দেয়া হলেও, তারা ছিলো ভূমিস্বত্বহীন জুমিয়া। তখন অনাবাদী পাহাড়াঞ্চল আবাদের প্রয়োজন ছিলো। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের দীর্ঘকাল খয়রাতী সাহায্যে লালন-পালন করাও সহজ ছিলো না। তাই তাদের স্বেচ্ছাকৃত জুম চাষে, নীরব অনুমোদন ছিলো। তবে জুম চাষ ও জুম ভূমির স্বত্ব অনুমোদিত হয়নি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে, জন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হওয়ায়, স্বঘোষিত বা ঐতিহ্যানুগভাবে নিযুক্ত উপজাতীয় সর্দারদের প্রবর্তিত প্রতিটি জুমিয়া পরিবার থেকে আদায়কৃত নির্দিষ্ট পরিমান কর ও তার একটি অংশ আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে সরকারকে প্রদানের ধারা প্রচলিত হয়। প্রথমে এই আর্থিক লেনদেন অনানুষ্ঠানিক উপঢৌকন ছিলো। পরে তা জুমকর নামে নিয়মিত সরকারী প্রাপ্যে পরিণত এবং সর্দারদের মর্যাদা ও নিয়মিত হয়। এই বাৎসরিক পারিবারিক জুম করে সরকারের অংশ নগণ্য ৳ংশ মাত্র। এর পাঁচগুন ভোগ করে সর্দার ও হেড ম্যানেরা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেতৃস্থানীয় সর্দারেরা সমভূমির লোকদের সাথে, পাহাড়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা লাভের জন্য, চট্টগ্রামের রাজস্ব কর্মকর্তাকে, কিছু কিছু বার্ষিক উপঢৌকন দিতেন। পরে সেটা রাজস্বে পরিণত হয়' (সুত্র ঃ দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডোয়েলার্স দেয়ার ইন, টি এইচ লুইন, পৃঃ ২২)

'পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা নিয়মিতভাবে দেশের সার্বভৌম কোন রাজশক্তির দ্বারা নয়, স্থানীয় সাধারণ জুমিয়া, কুকি ও অন্যান্য বাসিন্দাদের দ্বারাই রাজা নিযুক্ত। তারা মোগল সরকারকে ১০৭৭ মঘী বা ১৭১৫ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত, কোন কর বা খাজনাই দিতেন না। স্ক্র (সূত্র ঃ রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ খ্রীঃ)। এর অর্থ তারা স্থানীয় নাগরিক ছিল না।
উপজাতীয় রাজা প্রজাদের মর্যাদা ও জুম রাজস্ব নিজস্ব ব্যবস্থা, সরকার প্রবর্তিত কিছু নয়। অভিবাসন লাভের পরে স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্দারী ও জুমকর ব্যবস্থা, প্রশাসন ও রাজস্বের পক্ষে সহায়ক বলে, সরকার তা অনুমোদন করে নেন। সরকার ও উপজাতীয়দের মধ্যকার এই অনিয়মিত ব্যবস্থাকে, ১৯০০ খ্রীঃ সালে প্রবর্তিত স্থানীয় শাসন বিধি রেগুলেশন নং ১ এর আওতায় বিধিবদ্ধ করা হয়। এই নতুন আইনেও উপজাতীয়দের অবাধ ভূমিস্বত্ব স্বীকৃত হয়নি। গোটা জেলাকে রাখা হয় শাসন বর্হির্ভূত ও স্থানীয় জেলা প্রশাসকের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন। ভূমি খরিদ বিক্রি ভোগ ও হস্তান্তর রাখা হয় অনুমতি সাপেক্ষ। এটা উপজাতিদের বাধ্য অনুগত

আমলা শাসিত অস্থায়ী প্রজা হওয়ার দলিল। নাগরিক অধিকার সম্পন্ন স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার মর্যাদা এতে স্বীকৃতি নয়।

নতুন প্রজন্মের উপজাতীয়রা, অতীত ইতিহাস না জানায় ও জন্মগতভাবে এদেশে বর্ধিত হওয়ায়, এবং এখানকার প্রশাসনিক ও জনসংখ্যাগত পরিবেশ তাদের অনুকূলে থাকায়, স্বাভাবিকভাবে এ ধারণার অধিকারী হয়েছে যে, এটা উপজাতীয়দের নিজস্ব অঞ্চল। এখানে তাদের উন্নতি আর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা এবং সংখ্যা প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা হলো ন্যায্য। এতদ্বাঞ্চলে বাঙ্গালীদের অবাধ অনুপ্রবেশ তাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। এর বিপরীতে এই অঞ্চলের প্রকৃত ইতিহাস প্রচারিত হলে, তা হিংসা আর উগ্রতা পরিহারে সহায়ক হতো। তারা ভাববার সুযোগ পেতো যে, এদেশ ও তার অধিবাসীদের আস্থা অর্জনের মাঝেই, তাদের ভাগ্যের নিরাপত্তা নিহিত। বিদ্রোহ সঠিক পথ নয়।

এই পর্বতাঞ্চলে উপজাতীয়দের দ্বারা এ যাবৎ মোট চারবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। ১৭২৪ খ্রীঃ সালে মাতামুহুরী সীমান্তে সর্ব প্রথম জালাল খাঁ নামীয় জনৈক উপজাতীয় প্রধান, মোগলদের অবাধ্য হোন। ফলে তিনি সদলবলে আক্রান্ত ও আরাকানে বিতাড়িত হোন। দ্বিতীয় বার ১৭৭৬ খ্রীঃ সালে কথিত চাকমা রাজা শের দৌলৎ খাঁ, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটান। আক্রমন ও অবরোধে বাধ্য হয়ে, ১৭৮৭ সালে তাঁর ছেলে রাজা জান বখশ খাঁর আত্মসর্পনের মাধ্যমে সে বিদ্রোহের অবসান হয়। তৃতীয় ঘটনা ১৯৪৭ খ্রীঃ সালের দেশ বিভাগকালে অনুষ্ঠিত। উত্তরাঞ্চলীয় কতিপয় চাকমা, নেতা ভারতে যোগদানের পক্ষে, এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় কিছু মগনেতা, সে অঞ্চলের বার্মার সাথে সংযুক্তি কামনায়, পাকিস্তান ভুক্তির বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করেন। আবার সামরিক শক্তি বলে সে বিদ্রোহ দমান হয়। শেষ ঘটনার শুরু ১৯৭২ খ্রীঃ সালে, যা ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত এক চুক্তির ফলে প্রায় দমিত হয়েছে, তবে কিছু বিশৃঙ্খলা অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। এই চতুর্থ বিদ্রোহটি দীর্ঘস্থায়ী, সর্বাধিক জটিল ও অধিক রক্তক্ষয়ী। পূর্বের তিনটি বিদ্রোহে সামরিক হস্তক্ষেপই ছিলো মুখ্য দমননীতি। এই চতুর্থটির বেলায় সামরিক হস্তক্ষেপের পাশাপাশি সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও আরোপিত হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ সফল নয়। শান্তি স্থাপনের পক্ষে সামরিক বা রাজনৈতিক যে কোন কার্যক্রম গ্রহণের আগে ভেবে দেখা দরকার ঃ স্থানীয় উপজাতিরা দীর্ঘ অতীতকাল থেকেই বিদ্রোহ প্রবণ। এটি তাদের আদি স্বদেশ ভূমিও নয়। এই বিদ্রোহ প্রবণতা আকস্মিক বা সাময়িক নয়। এর লক্ষ্য স্বায়ত্তশাসন বা স্বশাসন ক্ষমতা লাভের চেয়ে বেশী কিছু।

সীমান্ত পারের বহিরাঞ্চলসহ এতদাঞ্চল দুর্গম ও উপজাতি অধ্যুষিত। পরিবেশগতভাবে এর অবস্থান উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য আন্দোলনের পক্ষে অনুকূল। উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্য, প্রান্তিক অবস্থান, আর বিদেশী সংযোগ, তাদের অধিকার

আন্দোলনের শক্তির ভিত্তি। এর বিপরীতে শুধু সময়ক্ষেপন আর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সমাধানের উপায় নয়। সীমান্তকে বহির যোগাযোগ থেকে মুক্ত এবং জনসংখ্যাকে বাঙ্গালী ও পাহাড়ীতে ভারসাম্যময় অথবা উপজাতিদের সংখ্যা লঘু করার মাঝেই শান্তি নিহিত বলে মনে করা যায়।

উপজাতিরা আদতে বহিরাগত জনগোষ্ঠী। এ দেশে তাদের আগমন ও বসবাস ক্রমান্বয়ে ঘটেছে। চাকমাদের ভাষা এক ধরনের আঞ্চলিক বাংলা, যার মাঝে ভাওয়াইয়া, উর্দু, হিন্দি, আরবী, ফারসী ও স্থানীয় চট্টগ্রামী শব্দ ও কথ্যরীতি বিপুলভাবে মিশ্রিত। চাকমা কিংবদন্তিকে ইতিহাস বলে দাবী করা হলেও, দলিল প্রমাণের দ্বারা ভিন্ন আরেক ইতিহাস উদঘাটিত হয়। নতুন উদঘাটিত প্রামাণ্য তথ্যাদির মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, এদেশে চাকমা ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাকাল হলো ১৭৩৭ খ্রীঃ সাল। আরাকানের রোসাং থেকে আগত চাকমা সর্দার শের মস্ত খান, ঐ সালে চট্টগ্রামের মোগল নায়েব জুল কদর খান কর্তৃক এতদাঞ্চলীয় জুম বঙ্গের জুমিয়াদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের তহসিলদারী এবং কোদালা উপত্যকায় কিছু অনাবাদী খাস পাহাড়ী জমির বন্দোবস্তি লাভ করেন। ঐ বন্দোবস্তি ও তহসিলদারীকে অবলম্বন করে, সে সময় আগত প্রথম একদল চাকমা প্রজা শের মস্ত খাঁর জমি আবাদে নিযুক্তহয়। ডঃ এ এম সিরাজুদ্দিন স্বীয় ঐতিহাসিক গবেষণায় এর বিশদ বর্ণনা দান করায়, এবং চাকমা রাণী কালিন্দি, রাজানগরের বুদ্ধ মন্দিরের গায় লিখিত লিপিতে শের মস্ত খাঁকে আদি চাকমা রাজা বলে বর্ণনা দেয়ায় এবং সর্বোপরি একটি প্রাচীন চাকমা গানে আদি রাজা শের মস্ত খাঁকে রোসাং থেকে আগত বলে স্বীকার করায়, এটা সন্দেহাতীত যে, ১৭৩৭ খ্রীঃ সালই এতদাঞ্চলে চাকমাদের প্রথম ও আংশিক প্রতিষ্ঠাকাল। পরে বৃটিশ আমলে তাদের সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে।

ডঃ এ এম সিরাজুদ্দিনের ঐতিহাসিক গবেষণায় উদঘাটিত হয়েছে যে, চন্দন খাঁ ও তাঁর বংশধরেরা ১৭১১ থেকে ১৭২৪ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ চট্টগ্রামের সীমান্তে, উপজাতীয় রাজা ছিলেন। ঐ বংশের শেষ ব্যক্তি জালাল খাঁ অবাধ্য হওয়ায়, মোগল ফৌজদার কর্তৃক ১৭২৪ খ্রীঃ সালে আক্রান্ত ও আরাকানে বিতাড়িত হোন। ঐ ঘটনার ১৩ বছর পর শেষ মস্ত খাঁ আরাকান থেকে এসে এতদাঞ্চলে আবির্ভূত হোন, এবং ঐ সুত্রেই কিছু চাকমার আগমন ঘটে। চন্দন খাঁ বংশের সাথে চাকমাদের সম্পর্ক থাকা প্রমাণিত নয়। যদিও চাকমা কিংবদন্তিতে চানান খাঁ নামের উল্লেখ আছে, চন্দন খাঁ নয়। যা বিভ্রান্তিকর। তবে এটা নিশ্চিত যে, ঐ প্রাথমিক অভিবাসনকালে চাকমাদের জনসংখ্যা অতি নগণ্যই ছিল। তখনো তারা আনুষ্ঠানিক সর্দারের অধীন জাতিগতভাবে আরাকানের বাসিন্দা। (সূত্র ঃ শের জব্বার খাঁর সীলমোহর)।

ডঃ আঃ করিম সাহেবের ঐতিহাসিক উদঘাটন, পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও ডে বারোজের অংকিত বাংলার প্রাচীন মানচিত্রের মাধ্যমে, আরো সঠিক ঐতিহাসিক

চিত্র উদঘাটিত হয় । তাতে বলা যায়, গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অধিকৃত দক্ষিণ চট্টগ্রামের স্থানীয় শাসক খোদা বখশ খানের নিয়ন্ত্রিত, আলীকদমের সীমান্তে, একটি চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চল ছিলো, যা চাকমাদের বহুল কথিত উত্তর আরাকনবর্তী মইসা গিরি অঞ্চল হওয়া সম্ভব। এও সম্ভব যে, পরে তারা ঐ খোদা বখশ খাঁর বংশধরদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রজায় পরিনত হয়। যারা তাদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। এই সুত্রে হয়তো আলীকদম তাদের প্রিয় রাজ্য ও রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছে। চাকমা কিংবদন্তিতে, খোদা বখশ খান তাদের রাজা না হলেও, আলীকদম তৈন ছড়ি অন্যতম চাকমা রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত। তাই এটা ভাবা সঙ্গত যে, উত্তর আরাকানবাসী চাকমারা স্থানান্তর ও আনুগত্য বদলের মাধ্যমে মুসলিম সামন্তদের প্রভাবাধীন প্রজা ও মিত্র ছিলো। সে সুত্রেও সম্ভব, উত্তরাধিকার ও বংশানুক্রমিক ধারায় চাকমা রাজারা নাম খেতাব আচার অনুষ্ঠান ও দরবারী সাজ পোষাকে, মুসলিম ঐতিহ্যের অনুসারী।

একদা মইসা গিরি অঞ্চলে মগ উৎপীড়ন তীব্র হয়ে দেখা দিলে এবং নিজেদের সামন্ত প্রধানেরা দুর্বল হয়ে উঠার কারণে, চাকমাদের বাংলাদেশে দেশান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সম্ভবতঃ মুসলিম সাহায্য আর সদ্ভাবের আকর্ষণে, তারা মাতামুহুরী উপত্যকা হয়ে বাংলাদেশের দিকে নেমে আসে। সেই দলেরই অন্যতম অগ্রপুরুষ হলেন রাজা শের মস্ত খাঁ ও তার নেতৃত্বাধীন লোকজন। এই বর্ণনার সমর্থনে শক্তিশালী প্রমাণ হলোঃ রাজা শের জব্বার খানের সীল মোহরটি, যা আরবী বর্ণে উৎকীর্ণ এবং যার ভাষ্য হলো 'রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি, ১১১১ শের জব্বার খান' সুতরাং মঘী সন হিসাবে এটা নিশ্চিত যে ১৭৪৯ খ্রীঃ সালেও জাতিগতভাবে চাকমাদের আরাকান ত্যাগ অসমাপ্ত ছিলো এবং তাদের রাজারা ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ১৭৮৭ ক্রীঃ সালে বার্মা রাজার লিখিত চিঠির মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়, চাকমা নামীয় লোকেরা তখনো ছিলো সে দেশের প্রজা। ১৮১৮ খ্রীঃ সালে দলপতি জনৈক ফাপ্রুর অধীনে চার হাজার সংখ্যক টুংটুঙ্গ্যা চাকমা, আরাকান ত্যাগ করে এ দেশে আসে। চাক, থেক, দৈংনাক নামীয় কিছু চাকমাও এককালে দক্ষিণ চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবে বৃটিশ আমলে আরাকানবাসী চাকমাদের অব্যাহত আগমন ও নির্গমন প্রমাণ করে, আরাকানী চাকমা মগ ও অন্যান্য উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের দ্বারাই ধীরে ধীরে এদেশে উপজাতীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। এই সুত্রে জনপ্রিয় ঐ চাকমা গানটিও বিবেচ্য, যাতে তাদের রাজবংশীয় আদি কৌলিন্য আর আরাকানের রোসাংবাস স্বীকৃত, যথা ঃ

'আদি রাজা শের মস্ত খাঁ রোয়াং ছিলো বাড়ি,
তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জমিদারী।'

১০। মুক্তাঞ্চলবাসী উপজাতি, তাদের উৎপাত ও চাকমা আধিপত্য।

১৭৭৬-৮৬ সময়ের চাকমা বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পর দীর্ঘ দিন পর্বতাঞ্চলে শান্তি বিরাজিত ছিলো। কিন্তু বার্মার আভারাজ্য কর্তৃক আরাকান দখলের ফলে এতদাঞ্চলে তথাকার উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। বার্মা বৃটিশ প্রথম যুদ্ধের ফলে আরাকান প্রদেশ ভারতের সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় ঐ উদ্বাস্তুরা এখানে স্বদেশের সমান পরিবেশ লাভ করে, তাতে শুরু হয়ে যায় তাদের স্বেচ্ছাপুনর্বাসন গ্রহণ ও ভূমি দখলের প্রতিযোগিতা। এতে পুরাতন জুমিয়া কুকি ও অন্যান্য উপজাতিদের একচ্ছত্র জুম ভূমির অধিকার বিপন্ন হয়। এতদিন চীন পর্বতাঞ্চল ও লুসাই অঞ্চলের বিভিন্ন স্বাধীন উপজাতিসহ কুকি সমষ্টিভুক্ত লোকেরাই এক চেটিয়া এতদাঞ্চলীয় জুম ভূমি অবাধে ব্যবহার করেছে। এখন সহসা তারা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলো। এই পরিস্থিতিতে তারা ক্ষুব্ধ হয়। এবং তাতে ঐ জন গোষ্ঠী নবাগত মগ, চাকমা, ত্রিপুরা ও মুরংদের বসতি অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে। প্রতিপক্ষীয়দের মদদদাতা সরকার পক্ষ ও আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করে। আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও লোক অপহরণের ঘটনা ক্রমে ব্যাপক ও বৃহৎ আকার ধারণ হয়। এসব সরকারের গোচরিভুত হয় এবং গুরুতর আইন-শৃঙ্খলার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৩২ সালে জনৈক নেতৃস্থানীয় চাকমা শুক লাল খাঁ কুকিদের হাতে নিহত এবং তদীয় কন্যা বোদা চোখী ধৃত হোন। ১৮৩৭-৫৪ খ্রীঃ সময়কালের ১৭ বছরে কুকিরা চট্টগ্রাম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে প্রায় ১৯ বার হামলা চালায়। তাতে ১০৭ জন নিহত ১৫ জন আহত আর ১৮৩ জন অপহৃত হয়। ১৮৩০-৪০ সময়কালে অন্যতম বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায় বনযুগীরা তাদের সর্দার লিয়ান কুং-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের আগে আরাকানের অভ্যন্তরে একটি খুমি বস্তি আক্রমণ ও লুট করে। তৎপর বোমাং সর্দার সানাইঞর গ্রুর অধীনতা স্বীকার পূর্বক ৩৪৫ নং নোয়া পাতং মৌজায় বসতি স্থাপন করেও শান্ত হয়ে যায়। তৎপর ১৮৫৯ সালে কাপ্তাই বাজার লুট ও অগ্নিসংযোগের এক বৃহৎ ঘটনা ঘটে। তাতে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার অধিক বিচলিত হোন। মনে হচ্ছিলোঃ গোটা পর্বতাঞ্চল দুর্যোগপুর্ণ অরাজকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। শেষ ঘটনায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও কৃষক মহল অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর প্রতিশোধমূলক সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ উপজাতীয়দের সমতলের হাটে বাজারে আক্রান্ত হওয়ার আশংখা দেখা দেয়। প্রতিরোধ ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজনে তিনি সরকারের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল পৃথক করার সুপারিশ পেশ করেন। তদানুযায়ী সরকার ১৮৬০ সালে রেইড অব ফ্রন্টীয়ার ট্রাইব নামে ২২ নং আইন ও আদেশ প্রণয়ন ও জারি করেন। ফলে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে এই পর্বতাঞ্চল পৃথক হয়ে যায়। এবং ১লা আগস্ট ১৯৬০ তারিখে, কমিশনারের অধীন, সুপারিনটেনডেন্ট অফ ট্রাইবস নামীয় একজন কর্মকর্তার উপর এর শাসন ভার অর্পিত হয়। তখন কক্সবাজারের কিছু এলাকাও দেমাগ্রী অঞ্চলসহ এতদাঞ্চলের প্রাথমিক আয়তন নির্ধারিত হয় ৬৮৮২

বর্গমাইল। পরে বন সংরক্ষণমূলক আইন একক্ট নং-VII ধারা দুই ১৮৬৫ এর আওতায় ৫৬৭০ বর্গমাইল অঞ্চল বন ঘোষিত হয়। তাতে প্রায় গোটা পর্বতাঞ্চলই বনের আওতায় পড়ে যায়। এতে বসতি অঞ্চলের স্বীকৃতি অনুপস্থিত।

চন্দ্রঘোনায় এতদাঞ্চলের প্রথম সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। ১৮৬০ সালে নিকটবর্তী ত্রিপুরায় কুকিরা বিরাট এক হামলা চালায়। তাতে ১৮৬ জন লোক নিহত আর একশতের মত বন্দী হয়। মনে হয় ঐ আক্রমণকারী কুকিরা, এই পর্বতাঞ্চলেরই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা। তাই ১৮৬১ সালের জানুয়ারীতে তাদের শাস্তি বিধানের জন্য একদল সৈন্য বড়কলে মোতায়েন করা হয। কুকি প্রধান রতন পুইরার আস্তানা সেখান থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত ছিলো। ২৭ জানুয়ারী ক্যাপ্টেন রবন-এর নেতৃত্বে ২৩০ জন সিপাই ও ৪৫০ জন কুলির একটি বাহিনী বড়কল থেকে রওয়ানা দেয়। কুকিদের বসতির হদিস পাওয়া কঠিন ছিলো। তাই সেখানে পৌছতে ছয়দিন লেগে যায়। বড় চড়াই উৎরাই ও নদীনালা পারাপারের পর ১লা ফেব্রুয়ারী সরকারী বাহিনী লক্ষ্যস্থলের কাছে পেঁছে। ইতোমধ্যে কুকিরা মূল্যবান জিনিসপত্র সরিয়ে পাড়ায় আগুন লাগিয়ে অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে আত্মগোপন করে । এই অভিযানের সুফল হলো বিপক্ষদের বাড়ী ঘর ও প্রায় ১৫০০ মন খাদ্য শস্য পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। ফলে তারা কিছুটা দমে যায়। অতঃপর অভিযান পরিত্যক্ত হয় ও আলোচনার মাধ্যমে রতন পুইয়া ১৯৬১ সালের অক্টোবরে আত্মসমর্পণ করেন, ও শান্তি স্থাপিত হয়। পরবর্তী দুবছর কোন ঘটনা ঘটেনি। ১৮৬৪ সালের ১৫ ও ১৯ জানুয়ারী, একদল সেন্দু পূর্ব সীমান্তের দুটি পাড়া আক্রমণ করে ৫ জনকে হত্যা করে ও ২৩ জন মেয়ে পুরুষ ও শিশুকে ধরে নিয়ে যায়। ঐ একই সনের এপ্রিলে সেন্দুরা ২৬ জন বাঙ্গালী কাঠুরেকে আক্রমণ করে পাঁচ জনকে মেরে ফেলেও নয় জনকে বন্দী করে, এবং দুটি পাড়া আক্রমণ করে ৬ জনকে হত্যা ও ৩০ জনকে ধরে নিয়ে পালায়। অতঃপর ১৮৬৫-৬৬ তে আবার তারা দুটি আক্রমণ চালায়। প্রথমটিকে ৫ জন বন্দী ও দ্বিতীয়টিতে ২০ এর অধিক লোক ধৃত হয়। ১৮৬৬ সালে লুসাইদের হাওলং গোত্র অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা ঘটায়। তাতে বনযুগী সম্প্রদায়ের শঙ্খ উপত্যকাভুক্ত তিনটি গ্রামে হত্যাকাণ্ড ও আক্রমণের তান্ডব ঘটে। তাদের অপর একটি দল কাপ্তাই উপত্যকায় অবস্থিত একটি পাড়া ধ্বংস করে ৪ জনকে হত্যা ও ৮০ জনকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়। ওটা ব্যতিক্রমীভাবে, চলাচলের পক্ষে অনুপযোগী ও জুম চাষকালিন বর্ষার সময় অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৬৭ সালের ১২ই জানুয়ারীতে হাওলং গ্রোত্রীয়রা পুনরায় বোমাং সীমানা লঙ্ঘন করে, অনেক মগ পাড়ায় আক্রমণ চালায় ও তাতে ১১ ব্যক্তি নিহত আর ৩৫ জন অপহৃত হয়। ১৮৬৯ সালের জানুয়ারীতে শঙ্খ তীরবর্তী পুলিশ ফাঁড়ি চীমা আক্রান্ত হয়। তাতে ১০ জন পুলিশের মধ্যে সাত জনই নিহত, তাদের পরিবারের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সবাই ধৃত ও ফাঁড়িটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী মাসে মুরুংদের একটি পাড়ায় আক্রমণ ঘটে। ১৮৭০ এর ১৯ জুলাই ভোরে চীমা পুলিশ ফাঁড়ির

আধঘন্টা পথের দূরত্বে অবস্থিত একটি পাড়া, যা পুর্ববর্তী আক্রমণেও ধ্বংস হয়েছিলো এবং নতুনভাবে গড়ে উঠেছিলো, দ্বিতীয়বার আক্রমণের শিকার হয়। তাতে পুনরায় ৪ জন পূর্ণবয়স্ক লোক ও ৬ জন শিশু বন্দী হয়। অনুরূপ আরেক আক্রমণ শঙ্খতীরবর্তী চীমা ও পাইন্দুর মধ্যবর্তী একটি পাড়ায় ঘটে। তাতে দুজন নিহত আর একজন বন্দীত্ব বরণ করে। ১৮৭২ সালের জানুয়ারীতে একদল সেন্দু অতর্কিতে সীমান্ত চৌকি পাইন্দুতে চড়াও হয়। তবে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন ও ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ১৮৭০-৭১ সালে লুসাই গোত্রীয়রা কাছাড়েও আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণে অনেক ইউরোপীয় হতাহত হোন এবং এক চা বাগান মালিকের মেয়ে এবং তাদের এ দেশীয় কিছু কর্মচারীও তাদের হাতে বন্দী হয়। এই আক্রমন সমূহের দ্বারা ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সরকার আর নিষ্কিয় থাকতে পারেন না। এর স্থায়ী প্রতিকারের জন্য সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ফলে কাছাড় থেকে জেনারেল বুচারের পরিচালনায় একদল সৈন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জেনারেল ব্রাউনের নেতৃত্বাধীন আরেকটি বাহিনী লুসাই অঞ্চল আক্রমণ করে। এই যুগপত আক্রমণ পাঁচ মাসকাল স্থায়ী ও তাতে সাফল্য অর্জিত হয়। ধৃত বন্দীরা মুক্ত হোন ও অপরাধীরা আত্মসমর্পণ করে। আক্রমণ ও ক্ষয়ক্ষতি সাধনের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদেরকে বিপুল অংকের জরিমানা দানেও বাধ্য করা হয়। তৎপর কিছুদিন এতদাঞ্চল শান্ত থাকে। তবে ১৮৭৫ সালের বর্ষা শুরুর আগে সেন্দুদের একটি দল দুটি পাড়ায় আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিরোধের মুখে ফিরে যায়।

সেন্দু ও অন্যান্য আক্রমণকারী উপজাতিরা এতদাঞ্চলের দক্ষিণাংশের পূর্ব সীমান্তবর্তী উচুঁ পর্বত শীর্ষে বাস করে ও তার পশ্চিম ঢালুতে অবস্থিত বাংলাদেশের বসতি অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। আক্রমণকারী কুকি ও অন্যান্য উপজাতিরাও সময়ে সময়ে এতদাঞ্চলে চড়াও হয়ে আতংকের সৃষ্টি করে। তাই আরেকটি চূড়ান্ত অভিযানের দ্বারা তাদেরকে স্থায়ীভাবে দমিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই ১৮৯৩ সালে শেষ দমন অভিযান পরিচালিত হয়। যদ্দরুণ দীর্ঘকালের জন্য এতদাঞ্চল হিংসা হানাহানিমুক্ত শান্তরূপ ধারণ করে এবং বিদ্রোহী কুকি ও তাদের সহযোগীদের সংখ্যা ও শক্তি চুরমার হয়ে যায়। তাতে এতদাঞ্চলে তাদের আধিপত্য চিরতরে লোপ পায়। তখন হানাদার মুক্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে শুরু হয়ে যায় চাকমা পুনর্বাসন ও আধিপত্য বিস্তারের সরকার প্ররোচিত প্রতিযোগিতা। সমুদয় বহিরাঞ্চলীয় চাকমারা জড়ো হওয়া শুরু করে কর্ণফুলী ও তার উপনদীগুলোর উপত্যকা অঞ্চলে। রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর থেকে চাকমা রাজদপ্তর ইতোমধ্যে ১৮৭৩ সালে রাঙ্গামাটির বালুখারিতে স্থানান্তরিত হয়ে পরিপূর্ণ রাজবাড়ীর মর্যাদা লাভ করে নিয়েছে। ফলে অচিরেই উত্তর পূর্বাঞ্চল চাকমা প্রভাবিত অঞ্চলে পরিণত হয়। দেশী-বিদেশী চামকাদের ভীড় ও প্রভাবের পাশাপাশি ১৯০০ সালের রেগুলেশন নং-১ এর আওতায় মধ্য-উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চাকমা সার্কেল ঘোষণা ও অধিকাংশ মৌজায়

চামকাদের হেডম্যান পদে নিযুক্তি, তাদের আরো শক্তিশালী করে তুলে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা হয়ে পড়ে তাদের অধীন ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। রাজশক্তি তাদের পৃষ্ঠপোষক। এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে জান মাল ও ইজ্জত রক্ষায় অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের জাতপাত পর্যন্ত ত্যাগ করে চাকমা সমাজে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। এটা চাকমাদের সংখ্যা ও গোত্র গোষ্ঠী বৃদ্ধির কারণ হয়। ১৮৭২ সাল থেকে গৃহীত আদম শুমারী ও রাজাদের সরবরাহকৃত জুমিয়া হিসাবপত্রে যে মূল চাকমা জনগোষ্ঠীর হদিস পাওয়া যায় তাতেও অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি ধরা পড়ে, যা স্বাভাবিক জন্মহারের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। মূল চার চাকমা গোষ্ঠী থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা শতাধিক গোত্র গোষ্ঠীতে সমৃদ্ধ। গোত্র গোষ্ঠীয় নামগুলোর তালিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ ও সম্প্রদায়ের নাম ভুরি ভুরি অন্তর্ভুক্ত থাকা, এই বিস্ময়কর তথ্যেরই প্রমাণ যে, চাকমারা বর্তমানে একটি মিশ্র সম্প্রদায়।
নামেই প্রকাশ ঃ নিম্নোক্ত গোত্র গোষ্ঠীগুলো চাকমাতে আত্মিকৃত, যথা ঃ খ্যাংজয়, চেক কাবা, চেগে, দাজ্যা, বর্গুয়া, লকসর, মগ, তিবিরা ইত্যাদি।

১১। বাংগালী উপস্থিতি ও পাহাড়ী অসন্তোষ।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কুকি ও অন্যান্য অরাজক উপজাতিদের দমন অভিযানে উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সৈন্যদের রসদ, গোলাবারুদ ইত্যাদি পরিবহন ও পথ প্রদর্শন কাজে স্থানীয় জুমিয়াদের সহযোগীতা পর্যাপ্ত না হওয়ায়, বহু বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হয়। জুমিয়াদের সাথে কৃষি ও বনজ দ্রব্যের ব্যবসায়িক লেনদেন, জমি আবাদ ও গৃহায়ন কাজে জড়িত অনেক বাংগালী প্রাচীনকাল থেকেই পার্বত্য অঞ্চলের দোবাসী বাসিন্দা ছিলো। বস্তুতঃ স্বদেশের একাংশ বলে এখানে বাংগালীদের যাতায়াত ও বসবাস বাধাগ্রস্ত ছিল না। পরে ১৯০০ খ্রীঃ সালে রেগুলেশন নং-১ এর আওতায় বাধা নিষেধ আরোপিত হয়। আগে একমাত্র হিংস্র ভয়াল পরিবেশই ছিল তাদের বিপক্ষে বিবেচ্য হুমকি। এমনিতে উপজাতীয় সর্দার ও হেড ম্যানেরা নিজেদের জমি আবাদ, চাষাবাদ, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি কাজের সহায়তায় বহু বাংগালীকে আনয়ন ও পুনর্বাসিত করেন। জুমিয়াদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনে নিযুক্ত বাংগালীদের এখানে উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। জমিয়ারা চিরদিন উৎপাদন, আহরণ ও অলস ভোগেই লিপ্ত লোক। পাহাড় আর বনেই তাদের জীবন ও জীবিকা সীমাবদ্ধ। সেক্ষেত্রে বাংগালীরা তাদের হাতে কৃষি সরঞ্জাম , গৃহস্থালী হাড়ি-পাতিল, সৌখিন দ্রব্য, তেল, মরিচ, পেঁয়াজ, লবণ, ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য এবং অভাবে চাল ও সরবরাহ করতো। খরিদ করে নিতো জুমে উৎপাদিত ও বন থেকে আহরিত পণ্য সামগ্রী। আদিকাল থেকেই বাংগালী ছাড়া জুম ও জুমিয়ারা ছিলো অচল। উভয় সম্প্রদায়ের এরূপ পেশাগত জরুরী পারস্পরিক নির্ভরতা অনস্বীকার্য। তাদের এই সম্পর্ক আর অবস্থান ছিলো সমান্তরাল। একে অস্থায়ী বা সাময়িক ভাবার অবকাশ নেই। এতদাঞ্চলের বাহিরেও এসব বাংগালীর সম্পদ সম্পত্তি থাকায় এখানে তারা ছিল দোবাসী। দেখা যায় বৃহৎ চট্টগ্রামের অংশ থাকাকালীন সময় থেকেই

বাংগালী দোকানদারেরা পুরাতন কাপ্তাই, দেমাগ্রী, থানচি, আলীকদম ইত্যাদি দুর্গম পাহাড়ী বাজারসমূহে ব্যবসায় লিপ্ত। তাদের কৃষক শ্রেণী অক্লান্ত পরিশ্রমে নদী উপত্যকাসমূহ আবাদে ব্যস্ত। মাঝিরা তাদের সাম্পান ও নৌকায় পণ্য সামগ্রী পরিবহন ও লোকজনকে স্থানান্তরে নিয়োজিত। কর্ণফুলী, শঙ্খ, মাতা মুহুরী ইত্যাদি নদী উপনদী সমূহের ঘাটে ঘাটে বেপারীরা নৌকায় পণ্য সম্ভার পৌছাতে এবং কৃষিপণ্য আর বনজ দ্রব্যের ব্যবসায় জুমিয়াদের বসবাসকাল থেকেই নিযুক্ত। তারা নদীকুলেও বাজার সমূহে অবাঙ্গালীদের সাথে, উদ্বৃত্ত পণ্য খরিদ, বিক্রি ও ভোগ্যসামগ্রী সরবরাহে নিরলস সচেষ্ট। এভাবে বাঙ্গালীদের বংশানুক্রমিক স্বার্থ, যোগাযোগ, জন্ম ও মৃত্যু এ মাটির সাথে চিরকাল সম্পৃক্ত ও বহমান। এ মাটি তাদের নাড়ির সাথে চিরকাল সম্পর্কিত। বাঙ্গালীদের এই স্বার্থ সম্পর্ক আদি ও অবিচ্ছেদ্য। আজ কালকার বিচারে তারা অচ্ছ্যুত, আর তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি অস্থানীয়দের অনুপ্রবেশ ও জবরদখল আখ্যায়িত, তবে উক্ত বিশেষণ জুমিয়াদের প্রতি অধিক প্রযোজ্য। অনিবার্য কারণেই চট্টগ্রামের সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকার সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংগালীরা এতদাঞ্চলের উৎপাদন উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবসা ও প্রশাসনিক কাজে অপরিহার্য্যভাবে জড়িত। বাঙ্গালী জুমিয়া উভয় সম্প্রদায়ের সার্বক্ষণিক পারস্পরিক অপরিহার্য্যতা, হালের কিছু ভূমিহীন বাঙ্গালীর পুনর্বাসনে অবাঞ্ছিত হয়ে যায়নি। এই উচ্চ ভূমির জীবন প্রবাহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশমুখী নিম্নগামী। পরিবেশ ও প্রকৃতি এতদাঞ্চলকে বাংলাদেশ নির্ভর ও জুমিয়া জনগোষ্ঠীকে বাঙ্গালী আবেষ্টিক করে রেখেছে। কোন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতির পক্ষে এর পরিপূরক হওয়া অসম্ভব।

যদি এতদাঞ্চল সুদুর অতীত থেকে বাংগালী প্রভাবিত না হতো এবং এখানে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য আদি ও মৌলিক হতো, তা হলে এটা ইতিহাসে বাংলা ও চট্টগ্রাম নামে অভিহিত হতো না। অতীত থেকে এটা বাংলা ও বাঙ্গালীদের স্বার্থ অধিকারভুক্ত অঞ্চল। বাংলা আর বাঙ্গারীদের সাথে এর ভাগ্য ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ। অবাঙ্গালী সম্প্রদায়দের আকস্মিক সংখ্যা প্রাধান্যের বলে আজ পরিচয় আর অধিকার পরিবর্তনের চেষ্টা, এর ইতিহাস ও অবস্থানগত কারণে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখানকার প্রাকৃতিক আনুকূল্য বাংলাদেশ ও বাঙ্গারীদের পক্ষেই প্রবাহিত। এটা ছাড়াও আরো দুটি কারণে এতদাঞ্চলে জুমিয়াদের একক অধিকারের দাবী দুর্বল। জুমকর আদায়ের রশিদ তাদের এতদাঞ্চলবাসী বলে স্বীকৃতি দিলেও, তদ্বারা তাদের ভূমিস্বত্বধারী স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া স্বীকৃত নয়। দ্বিতীয়তঃ ১৯০০ খৃঃ সালের রেগুলেশন নং-১ এর আওতায় জারিকৃত পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন জুমিয়াদের শাসন করার বিধি মাত্র, তাদের ভূম্যাধিকারের সনদ নয়। অতএব ভূম্যাধিকারহীন খাটি জুমিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কোন লোকের পক্ষে, বাংলার ঐতিহাসিক মূল নাগরিক বাঙ্গালীদের ভৌমিক অধিকার চ্যালেঞ্জ করা অনধিকার চর্চা। এর যৌক্তিক ভিত্তি যথেষ্ট শক্ত নয়। ভূমিহীনদের খাস জমিতে পুনর্বাসন দান জাতীয় দায়িত্ব। এটা নিরূপায় পালনীয় বিষয়। ভূমিহীন বাঙ্গালীদের পুনর্বাসনের ঘটনা সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যাকে প্রভাবিত

করে সত্য। এর সুফল কুফল উভয়ই স্বীকার্য। তবে বহু সম্প্রদায় বিশিষ্ট জাতি ও দেশে, সামগ্রিক সুবিধাই প্রধান বিবেচ্য। শুধু সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধা ও প্রাধান্যকে অগ্রাধিকার দান বৈষম্যহীন ন্যায়াচরণের পরিপন্থী। কোন অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষের প্রাধান্য রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে, এই সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় অখন্ডতাকে অক্ষুণ্ন রাখার আগাম সতর্ক ব্যবস্থা হিসাবে অখন্ডতার জামিনদার প্রধান জনশক্তির বিস্তার ও সমাবেশের মাধ্যমে, সন্দেহভাজন জনশক্তিকে কাবুতে রাখা, রাষ্ট্রীয় রাজনীতির দায়িত্ব। এর অর্থ সংখ্যালঘুদের দমন ও নির্মূল করা নয়। এমন অবস্থায় বিদ্রোহ ঘটা, দূষণীয় বলা যাবে। এ দেশের সংখ্যালঘু জুমিয়া সম্প্রদায়ের ধ্বংস কারো কাম্য নয়। শুধু অগ্র সুবিধা লাভের মতলবে তারা চরমপন্থী ব্যবস্থায় অস্ত্র হাতে ঝাপিয়ে পড়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে যে সমস্যার মোকাবেলা করা সম্ভব, তার সমাধানে অস্ত্রধারণ হয়েছে চরম অসহিষ্ণু ব্যবস্থা। তবু সুবিচার জাতীয় সহানুভূতি ও সদিচ্ছা থেকে সংখ্যালঘু জুমিয়া সম্প্রদায়ের বঞ্চিত ভাবার বিশ্বাসযোগ্য বিশেষ কোন কারণ নেই। উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপকে ভুল পদক্ষেপ জ্ঞান করে, বাঙ্গালীরা তাদেরকে করুণার চোখেই দেখে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এখনো তাই বজায় আছে।

এই পর্বতাঞ্চল মূলতঃ চট্টগ্রামেরই অংশ। আগের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এখন স্বতন্ত্র তিন জেলায় পরিণত। প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যথাক্রমে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের কারোরই এতদাঞ্চল আদি বাস ভূমি নয়। এদের সবাই বহিরাগত জনগোষ্ঠী। মোগল আমলে তাদের একাংশ পাহাড়ী সীমান্ত পথে অনুপ্রবেশ করে। বৃটিশ আমলে সে অনুপ্রবেশ আরো বৃদ্ধি পায়, এবং পাকিস্তান আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাদের অস্বাভাবিক সংখ্যালবৃদ্ধি অনুরূপ অনুপ্রবেশের ফল। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকেই এই অনুপ্রবেশ ঘটেছে। চাকমা ও মগেরা দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বসবাস এলাকা থেকে বৃটিশ আমলে উত্তর ও পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হয়েছে, এবং জুমের সুবিধা সুযোগকে অনুসরণ করেই, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। আদি কালে ও মোগল আমলে আগত স্বল্পসংখ্যক মগ বা মারমাদের বৃহদাংশ, বান্দর বন রামগড় ও তার সন্নিহিত অঞ্চলকেই স্থায়ী আবাস হিসাবে বেছে নিয়ে ছিলো। চাকমারা প্রথমে মাতামুহুরী নদী উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সংখ্যাগুরু মারমাদের চাপ ও জুম ভূমির অভাবে, বৃটিশ আমলেই প্রথমে কোদালা ও শিলক নদী উপত্যকায়, ও তৎপর কর্ণফুলী পাড়ি দিয়ে রাঙ্গুনিয়া থেকে সীতাকুন্ড পর্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। মগ ত্রিপুরা ও স্থানীয় বাঙ্গালীদের চাপে অবশেষে উর্বর জুম ভূমির অনুসরণে, কুকি পরিত্যক্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ আমলে স্থায়ী প্রাধান্য গড়ে তুলে। নতুবা এখনো তাদের চট্টগ্রামের অন্যতম সংখ্যালঘু বাসিন্দা হয়েই থাকতে হতো। কুকিদের সাথেও বাঙ্গালীরা কাজ কারবার ও লেনদেন করেছে। ১৮৬০ খ্রীঃ সালের আগে পরে বিভিন্ন নদী উপত্যকা ও বাজার এলাকার বাসিন্দা বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চলে উপজাতিদের চেয়ে কম কুলিন,

একথা বলা সঙ্গত নয়।

১২। উচ্চাভিলাষের পটভূমি।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, সাবেক চট্টগ্রামের দুর্গম পর্বতাঞ্চলের অধিবাসী মগ ও চাকমাদের আনুগত্য আদায় ও শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে, তাদের তিন দলপতি ও নেতৃস্থানীয় লোকজনকে, কিছু রাজনৈতিক ও আর্থিক সুবিধা মঞ্জুর করেন। যদ্দরুণ তাঁরা সামাজিক বিচার ক্ষমতার অধিকারী, ভূমি প্রশাসক ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন জুম রাজস্বের ভাগিদারে পরিণত হোন। তাদের এই সুযোগ-সুবিধা ১৯০০ খৃঃ সালে জারিকৃত রেগুলেশন নং-১ এর আওতায় রচিত পার্বত্য শাসন আইনে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে, যার প্রতিক্রিয়ায় এখানকার অবাঙ্গালীরা স্বাতন্ত্র্য আর বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। অথচ স্বাধীন ভারতে একদেশ ও একজাতি গড়ার ধারায় বিপুল সংখ্যক দেশীয় রাজ্য আর আঞ্চলিক জাতিত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত। স্বাধীনতাও গণতন্ত্রই সেখানে মুখ্য, আচরণ বিধি। দেশীয় আধা স্বাধীন রাজ্যের একটিও সেখানে অবশিষ্ট নেই। অথচ এতদাঞ্চলে বৃটিশ আমলে মঞ্জুরকৃত সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত আছে। চাকমা মাং ও বোমাং এই তিন সর্দারের অধীন তাদের অনুগামীদের সংখ্যা প্রাধান্যের ভিত্তিতে তিন জুম রাজস্ব সার্কেল বা পরগণা এবং ঐ পরগণাগুলো কতিপয় মৌজায় বিভক্ত। সার্কেল প্রধানেরা সর্দার, মৌজা প্রধানগণ হেডম্যান বা মাতবর এবং পাড়া প্রধানেরা কারবারী আখ্যায় অভিহিত। তাদের সবাই জুম কর ও ভূমি প্রশাসনের অংশীদার মাসোহারা ভোগী ও সমাজপতি। এই তিন অভিজাত উপজাতীয় সর্দার ও জেলা প্রশাসকদের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীন পার্বত্য চট্রামের অতীত সমৃদ্ধ নয়। শতাব্দী-দীর্ঘ সে অতীত কালের মাঝে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও ক্ষুদ্র একটি হাসপাতালই মাত্র সুবিধা সুযোগের উদাহরণ হয়ে আছে। কিছু মওসুমী কাঁচা রাস্তায় পায়ে হাটাই ছিল স্থল পথে যোগাযোগের মাধ্যম। নদী পথে বেসরকারী লঞ্চ সার্ভিস আর নৌকা সাম্পানই ছিলো যাতায়াতের একমাত্র উপায়। জনগণের কাছে সে যুগ জুম নির্ভর শস্য প্রাচুর্য্য আর পুরাতন বনজ সংস্কৃতির জন্য কীর্তিত, যা বাস্তবে পশ্চাত মুখী আদিমতা। সমালোচনা করা হলেও বাংলাদেশ আমলেই কৃষি, শিল্প, পূর্ত, যোগাযোগ, শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। যদ্দরুণ এখানকার অবাঙ্গালীদের জীবন মান অতীতের অনুন্নত আদিমতা থেকে মুক্ত। নতুন একটি আদমশুমারী বা তথ্যানুসন্ধানী উদ্যোগ গৃহীত হলে, তা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে যে, এখানকার অবাঙ্গালী জীবনমান অতীতের তুলনায় তো বটেই, বর্তমানেও বাংলাদেশের ভিত্তিতে সর্বোন্নত, এবং এই পর্বতাঞ্চল সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্ত এলাকা।

রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী, অবাঙ্গালী সংখ্যালঘু নেতারা দীর্ঘকাল থেকেই স্বসমাজে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াসে লিপ্ত। দেশ বিভাগ কালের পরিবেশে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হল ঃ ইংরেজদের স্বাধীনতা দানের সাথে সাথে এতদাঞ্চলের দক্ষিণাংশের মগেরা বার্মার সাথে এবং উত্তরাঞ্চলের চাকমারা ভারতে যোগদানের

দাবীতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আর তাতে বান্দরবনে বার্মার পতাকা ও রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকার উত্তোলন ঘটে, যা ত্বরিত সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দমিত হয়। ঐ বিদ্রোহ ঘটনার অন্যতম নায়ক স্নেহ কুমার চাকমা পরিশেষে নিজের কতিপয় অনুসারীসহ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যান এবং আজীবন একই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে, জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীকে ঐ আন্দোলনের উত্তরাধিকারী করে, ইহলোক ত্যাগ করেন। ঐ আন্দোলনের মূল চরিত্র বাঙ্গালী বিদ্বেষ আর তার লক্ষ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এ কাজে দেশ বিভাগ কাল থেকেই ভারত তাদের সহায়ক শক্তি।

ভারত প্রকাশ্যে না বললেও অমুসলিম অঞ্চল হিসাবে দেশ বিভাগের নীতিতে এতদাঞ্চল তার প্রাপ্য বলে, ধারণা পোষণ করে। স্থানীয় সংখ্যালঘুদের দ্বারাই তার এতদাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস ও কুটকৌশলে লিপ্ত থাকা সম্ভব। এতদর্থেই সে বিদ্রোহীদের আশ্রয়, প্রশ্রয়, টেনিং, অস্ত্র আর অর্থ দানের সাথে জড়িত বলা যায়। তার সহায়তা নিঃস্বার্থ বা মানবিক হলে, তার সাথে অস্ত্র আর গোলা বারুদের সংযোগ থাকতো না। ঐ অবাঞ্ছিত সংযোগটাই বিষয়টিকে সন্দেহপূর্ণ করে তুলেছে। ফলে জনসংহতি সমিতি, আর শান্তিবাহিনী তাদের অজ্ঞাতে অথবা জ্ঞাতসারেই ঐ ভারতীয় কুমতলবের শিকার হয়েছে, যে ষড়যন্ত্রের কথা, সাধারণ সংখ্যালঘু উপজাতিদের ধারণায় না থাকাই স্বাভাবিক। অবাঙ্গালী স্বাতন্ত্র্য আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবী, ভারতীয় দাসত্ব কামনার নামান্তর না হলে, তা শ্রদ্ধাযোগ্য হতো। বাঙ্গালীদের উক্ত আন্দোলন থেকে বাদ দিয়ে রাখায়, তাতে অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন চরিত্র নেই। ভারত তার সাথে সম্পৃক্ত থাকায়, দেশের অখন্ডতা ও বিপদমুক্ত নয়। যে আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব তা সশস্ত্র হওয়ায়, তাতে অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটেছে, শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছে, আর জনজীবনে অশান্তি ও বেড়েছে। এটা বিপ্লববাদী রাজনীতি। এ স্বাধীন দেশ ও জাতির পক্ষে এটা অবাঞ্ছিত।

১৩। বহু পক্ষীয় প্রশাসন।

১৮৬০ খৃঃ সালে সাবেক চট্টগ্রামকে সমতলেও পর্বতে উত্তরে দক্ষিণে বিভক্ত করে, পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত হয়। এই বিভক্তির কার্য্য কারণ হলো, কুকিসহ মুক্তাঞ্চলবাসী উপজাতিদের সশস্ত্র উৎপাত দমাতে প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী করা। প্রাচীন কাল থেকে এটা অরাজকতা প্রবণ এলাকা। এখানে সামরিক ও বেসামরিক সরকারী নিয়ন্ত্রণের মিশ্র ধারার পাশাপাশি, উপজাতীয় সর্দারী প্রশাসনকেও সহযোগী রাখা হয়েছে, যাতে উপজাতিদের নিজস্ব সামাজিক নিয়ম-কানুনের আওতায়ও বটে, নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুকাল পর্যন্ত এই অলিখিত মিশ্র ধারার প্রশাসন প্রচলিত ছিলো। তৎপর সরকার ১৯০০ খ্রীঃ সালের রেগুলেশন নং-১ এর আওতায় উক্ত মিশ্র ধারার প্রশাসনকে

বিধিবদ্ধ করেন; যা এখনো পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত হয়নি। সরকারী ও সর্দারী দ্বৈত শাসনের সাথে ষাটের দশকে স্থানীয় শাসনের সংযোগ ঘটে, যা বাংলাদেশ আমলের আশির দশকে উপজেলা প্রশাসন ও চূড়ান্তে জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ প্রশাসনে রূপলাভ করেছে। এই পরিষদ গুলো বিধি বিধান রচনা, প্রয়োগ, কর আরোপ সহ বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী। এরা সবাই প্রশাসনের শরিক কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এখানে উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। স্থানীয় স্বাধীকার অর্জনের উদ্দেশ্যে উপজাতীয়দের দ্বারা সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়। তারা হত্যা উৎপীড়ণ ও আদেশ নিষেধ জারির মাধ্যমে আরেক অদৃশ্য কর্তৃপক্ষের রূপ ধারণা করে। এ পঞ্চম কর্তৃত্ববাদীদের দমাতে স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী সক্রিয় হয়, যারা কার্যতঃ হয়ে দাঁড়ান ষষ্ঠ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। আনুষ্ঠানিকভাবে বেসামরিক কেন্দ্রীয় প্রশাসন তার সমন্বয়ভুক্ত সহযোগীদের সহ কার্যকরী থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে তারা সামরিক কর্তৃপক্ষের অধঃস্তনে পরিণত হোন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৫২ ধারা বলে এতদাঞ্চলে বহিরাগমন নিয়ন্ত্রিত। বিদেশীসহ কোন বহিরাঞ্চলবাসীকে ছাড়পত্র ছাড়া এখানে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। ঐ আইনের দ্বারা কার্যতঃ এতদাঞ্চল স্বদেশের ভিতর আরেক বিদেশে পরিণত, এবং উপজাতি সহ সবাই ভিন্ন ভিন্ন আইন ও আদেশে শাসিত। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার উপজাতিদের সাথে স্বদেশবাসীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পার্থক্য রচিত হয়েছে। এর অতিরিক্ত ১৭৮৪-৮৫ খ্রীঃ সালে আগত বিপুল সংখ্যক আরাকানী উদ্বাস্তুদের, দেশবাসীর সম্মতি ছাড়াই, অভিবাসন প্রদান করা হয়। স্বদেশবাসীদের এতদাঞ্চল থেকে সরিয়ে রেখে, বিদেশী উপজাতীয় অভিবাসীদের প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। সেই ঔপনিবেশিক কার্য্যক্রমেরই ফল আজকের বাঙ্গালী সংখ্যাল্পতা। ঐ বিদেশী অভিবাসনের উদ্দেশ্য ছিলো, তাদের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরাকান ও বার্মার মূল ভূখন্ডে ভারত ভিত্তিক বৃটিশ উপনিবেশের সম্প্রসারণ ঘটা, এবং খৃষ্ট ধর্মে উপজাতিদের ধর্মান্তরকরণ। বৃটিশদের এ উদ্দেশ্য মূলক ঔপনিবেশিক ও ধর্মীয় স্বার্থকে নিরাপদ রাখার প্রয়োজনে ৫১ ৫২ নং ধারাটিও সংযোজিত হয়, যাতে স্বদেশী বাঙ্গালীসহ যে কোন ব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এতদাঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেয়া যায়। আরো বিস্ময়কর হলো, উক্ত আইন ও আদেশের বিরুদ্ধে একমাত্র বিভাগীয় কমিশনার ও বাংলার গভর্ণর ছাড়া আর কোন ঊর্ধ্বতন আদালতে বিচারপ্রার্থী হবার অধিকার ও রাখা হয়নি। প্রশাসনিক আদেশই সর্বোচ্চ পালনীয় আইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। বর্ণিত ৫১ ও ৫২ ধারার বিধিনিষেধ মূলতঃ বাঙ্গালীদের উপরই আরোপিত হয়। কোন উপজাতি বা অবাঙ্গালীর বহিরাগমন তদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। যদিও কার্যতঃ বিদেশী বিজাতীয় লোকদের নিয়ন্ত্রণই ছিলো অভিবাসন আইনের মর্ম কথা। এ আইনের বক্তব্যে কোন স্বদেশী ও বাঙ্গালী নিয়ন্ত্রণের কথা সরাসরি বর্ণীত নয়। বর্ণিত আইনের ৫২ নং ধারাটি অভিবাসন নামে চিহ্নিত যা। বার্মা ও আরাকানকে বৃটিশ ভারতীয় প্রশাসন

থেকে পৃথক করার পর রহিত হয়, এবং ৫১ নং ধারাটি ষাটের দশকে ঢাকা হাইকোর্টের দ্বারা বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পর স্থগিত হয়ে যায়। তবু পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি বলে জেলা প্রশাসকেরা দেওয়ানী ফৌজদারী ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী থাকেন। বিচার কাজ প্রশাসন ও রাজস্ব আদায় ক্ষেত্রে তারা হোন স্থানীয়ভাবে প্রধান নির্বাহী। আশির দশকে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রবর্তিত হওয়ায়, সর্বপ্রথম জেলা প্রশাসকদের সার্বিক ক্ষমতা আংশিক খর্বিত হওয়া শুরু হয়। তৎপর জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ ঘঠিত হওয়ায়, তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদার আরো অবনতি ঘটেছে।

১৯০০ খ্রীঃ সালের রেগুলেশন নং ১ এর আওতায় রচিত আইনে স্থানীয় জেলা প্রশাসককে সার্বিক নির্বাহী প্রধানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাই বৃটিশ আমলেতো বটেই পাকিস্তান আমলের শুরু পর্যন্ত জেলা প্রশাসকেরা যুগপৎ সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার, নির্বাহী প্রকৌশলী ইত্যাদির দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করেছেন। আয়তনে ৫০৯৩ বর্গ মাইল হলেও, এতদাঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চল হলো সংরক্ষিত, আধা সংরক্ষিত, আর অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল, যার তুলনায় আবাদী অঞ্চল নগণ্য। কিন্তু ক্ষতিকর উদারতার জন্য অনিয়মিত বনাঞ্চলে জুমিয়াদের জুম চাষ অবারিত আছে। তাতে প্রতি বছর নতুনভাবে ১২০ বর্গ মাইলের মত এলাকায় জুমিয়াদের দা কুড়াল ও আগুন, কোটি কোটি টাকা মূল্যের বনজ সম্পদ ধ্বংস করছে। অথচ সরকারী খাস হিসাবে বনাঞ্চলটি নিয়মিত রক্ষিত হওয়া ছিলো স্বাভাবিক। ফলে বন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এবং তার অনেকাংশ অনিয়মিতভাবে আবাদী অঞ্চলের রূপ ধারণ করেছে ও করছে। জুমকে অব্যাহত গতিতে চলতে দেয়ার কারণে, প্রতিবেশী দেশসমূহের অভাবী আর অনিয়ন্ত্রিত জুমিয়ারাও, এতদাঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, বেআইনী অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, যদ্দরুণ আজ এই পর্বতাঞ্চল দেশী-বিদেশী জুমিয়া উপজাতিদের দ্বারা ঘন অধ্যুষিত। বৃটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থে আরোপিত উদারতা আজ বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টি করেছে, উপজাতীয় স্বাধীকারের অশান্তি। নতুবা আজ এতদাঞ্চল হতো আরো সমৃদ্ধ বনাঞ্চল, এবং এর অধিবাসীরা হতো স্বল্প সংখ্যক বাঙ্গালী আর উপজাতি, যারা বৈষয়িকভাবে হতো অধিক স্বচ্ছল। এখানে ১৮৭৫ খ্রীঃ সালের রাজস্ব সংক্রান্ত চিত্রটি প্রদর্শিত হলো।

মূলে কক্সবাজারভুক্ত কিছু এলাকা ও দেমাগ্রী অঞ্চলসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ছিলো ৬৮৮২ বর্গমাইল, যার ৫৬৭০ বর্গমাইলই বন ঘোষিত হয়। পরে ঐ দুই অঞ্চল প্রত্যাহৃত হলেও, অবশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্বিকভাবে ঘোষিত বনেরই অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই হিসাবে বসতির স্বীকৃতি অনুপস্থিত। মূলতঃ উপজাতিরা খাস বনাঞ্চলেরই জুম চাষী। কিন্তু ১৮৬৫ সালের ঐ বন সংরক্ষণ আইন আদৌ কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। ফলে আজকের বিতাড়িত রোয়াঙ্গ্যাদের মত অতীতের উদ্বাস্তু উপজাতীয় রোয়াঙ্গ্যারাও বন ধ্বংস, তাতে বেআইনী বাড়ি ঘর তৈরী, আর অবাধ বসবাসের সূত্র পাত করেছে।

১৪। চাকমা আভিজাত্যের রহস্য।

চাকমা পন্ডিতদের লিখিত পুঁথি পুস্তক আর লোক সাহিত্যের বর্ণনায় তাদের যে কৌলিন্যের উল্লেখ আছে, যুক্তির মূল্যায়নে তার কোন স্বীকৃতি মিলে না। তারা নিজেদের জুম সংস্কৃতির অধিকারী বলেও দাবী করেন। অথচ উক্ত পেশায় উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন স্বীকৃত নয়। স্বভাবতই এ পেশার অনুসারীদের স্থায়ী পাড়া বা নগর জীবন থেকে দূরে দুর্গম পাহাড় ও বনাঞ্চলে থাকতেও প্রতিবছর স্থানান্তিরত হতে হয়। অনুরূপ যাযাবর জীবনে শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা সহ সুন্দর ও সুস্থ জীবন-যাপনের উপকরণ ও পরিবেশ থাকে না। তাদের আদিম অনুন্নত জীবন-যাপনের স্বীকৃতি মিলে রাজা বিজয় গিরির বিখ্যাত ঐ উক্তিতে, যথাঃ

লোকগীতির ভাষ্য ঃ	=	**বাংলা ভাষ্যঃ**
পরুয়া পন্দিত নেই যে দেজৎ	=	পড়ুয়া পন্ডিত নেই যে দেশে
যেতুং নয় সৈন্যগণ সেই দেজৎ।	=	যাবোনা সৈন্যগণ সেই দেশে।

বর্ণনা অনুযায়ী বিখ্যাত নায়ক ও নায়িকা রাধা মোহন ও ধনপতির মা দুজনই সহোদরা বোন, বা জ্ঞাতি বোন বা বান্ধবী।

রাজ পরিবার বা সামন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের গর্বিত সদস্য তারা। অথচ তাদেরকে এবং তাদের ছেলে-মেয়েকে অতি অনুন্নত আদিম জীবন-যাপন করতে হয়, যথা ঃ

লোকগীতির ভাষ্য ঃ	=	**বাংলা ভাষ্য ঃ**
(ক) পূব বেলান পজিমে গেল,	=	পূর্বের বেলা পশ্চিমে গেল,
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক,	=	কাটা ডালপালা বেঁধে নিলে,
মেনকা কবুদি দ্বিবোন,	=	মেনকা কপোতি দু'জনে বোন,
রান্যাত্তোন লর দিলাক,	=	জুম ভূমি থেকে হাটা দিলে,
(খ) লুই য়ে মাচ্ছুন তগাদন,	=	ঝাকিতে তারা মাছ খুঁজে,
মাদি বেগুনি ছাগদন!	=	মাটি সারাটি ছেকে নেয়,
ধিমা তিতা উগুরাদন!	=	ধিমা তিতা তুলে আনে!
কাত্তোল ধিঙি তগাদন !	=	কাঁঠাল ঢেঁকি খুঁজে নেয়,
বাতবাত্যা সাগ ভাঙ্গদন!	=	বাটবাটি শাক ভেঙ্গে লয়!
কাবি কুচ্যাল পেরাদন !	=	কুশ্যাল কেটে রস চিপোয়!
(সূত্র ঃ রাধা মোহন ধনপতি পালা)		(সূত্র ঃ রাধা-মোহন ধনপতি পালা)

উপরোক্ত উদ্বৃতির মাধ্যমে এটা পরিষ্কার যে, তারা অতি সাধারণ মানুষ, যারা নির্দ্বিধায় জুম চাষ করে, লাকড়ি কাটে, জঙ্গল থেকে তরকারি হিসাবে শাক পাত তুলে, ও ছড়ায় ঝাকি দিয়ে মাছ ছেকে ধরে।

রাজ পরিবারের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, তাদের এতদাঞ্চলের অন্যতম রাজা

ধাবানা, মাতামুহুরী নদী উপত্যকার তৈন ছড়ির মুখে স্থাপিত বাঁশ বেতের সিংহাসনে আসীন হয়ে ছিলেন, যা জৌলুসপূর্ণ কোন আয়োজন নয়। এমনি ভাবে রাজ পরিবারের অনেক সদস্যের নাম পদবী অর্থহীন ও তুচ্ছ শব্দের সমষ্টি। আভিজাত্যের উপযোগী উন্নত ও মূল্যবান আসবাব, উপকরণ, জৌলুশ, অলংকার, আড়ম্বর ও প্রাসাদোপম বাড়ি-ঘর তাদের অধিকারে অনুপস্থিত। জুমিয়া বলতে আমাদের মানস চোখে ভেসে ওঠে এক অনুন্নত আর্ত মানুষের ছবি, যে দুর্গম পাহাড় ও বনের ছন বাঁশের তৈরী টং বাসী। তার পরনে এক খানা নেংটি বা গামছা। শরীর প্রায় উদোম বা ঘরে তৈরী নিমায় ঢাকা। মাথায় পাগড়ি পেচানো। ঘরে আসবাব বলতে কিছুর আয়োজন নেই। হাতে দা এবং পিঠে বাঁশ বেতের বোনা একটি ঝুঁড়ি। মেয়েদের ব্যবহার্য্য অলংকার হলো রূপার তৈরী খাড় হাচুলী পুঁতির মালা, এবং সাধারণ কাপড়। তারা নোংরা অপরিচ্ছন্ন, দুর্গম ও নির্জন পরিবেশবাসী, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংযোগ বর্জিত এই আদিম জীবনে উন্নত জীবন চর্চার কথা চিন্তাও করা যায় না। এটা প্রমাণ করছে যে, জুম সংস্কৃতি চাকমা সমাজের পক্ষে উন্নত অতীত ও রাজা উজির হওয়ার দাবী প্রকৃতই গালগল্প। তবে তাদের নিকটবর্তী অতীতের এতদাঞ্চলীয় আভিজাত্য ও কৌলিন্য সামান্য হলেও উল্লেখযোগ্য, যা অংশতঃ মুঘল ও কিছুটা বৃটিশদের দ্বারা রচিত। মুঘল আমলে তাদের সাথে সম্ভবতঃ মুসলমান সৈনিক ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের রক্তের সংমিশ্রন ঘটে, ও কিছু আত্মীয়তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই তারা আনুকূল্যের ছোয়া ও পায়। সে যুগের চাকমা রাজ পরিবারের প্রধানগণের সীলমোহর ব্যবহারের নমুনা প্রমাণ করে যে, ক্ষেত্র বিশেষে তাদের কিছু সামন্তীয় আধিপত্য ছিলো। প্রকৃতই রাজা হলে তাদের প্রবর্তিত মুদ্রা পাওয়া যেতো এবং কিছু হলেও তা রাজ পরিবারের সংগ্রহে থাকতো। অতীত ঐতিহ্যের গৌরবজনক অধিকার, অতি মূল্যবান বলে খান্দানী লোকজনের তা সংরক্ষণ করার নজির সর্বত্রই আছে। চাকমা অভিজাত শ্রেণী ও তাদের অতীত ইতিহাসকে ধরে রেখেছেন। সুতরাং প্রাপ্ত সীল মোহরের মত মুসলিম বাদশাহী বা সুলতানী আমলের, উল্লেখযোগ্য নির্দশন ও প্রমাণাদি থাকলে, তা তাদের গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক ও অনুকূল হতো। রাজাদের মুগলাই নাম উপাধি বৃটিশ আমলের মধ্যাংশে লোপ পেলেও, অদ্যাবধি, মুঘলদের দরবারী সাজপোষাক ও আড়ম্বর তাদের মাঝে অনুসৃত হয়। এবং এটাই তাদের সর্বাধিক প্রাচীন ও মূল্যবান অতীত আভিজাত্যের প্রতীক। তাদের কালজয়ী আভিজাত্যের দ্বিতীয় উদাহরণ হলো বৃটিশদের দ্বারা প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক সর্দারী পদবী। অতীতকে বাহুল্য বলে ফেলে দিলেও, এ দুটি মর্যাদার সুত্র, তাদের গৌরবের পক্ষে যথেষ্ঠ।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমাদের মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত ভাবা যায়। তবে তারা যে বিশুদ্ধ বা আদত মঙ্গোলীয় নয়, আর্য্য দ্রাবিড় আর মঙ্গোলীয় সংমিশ্রন জাত সংকর, তা তাদের ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কার, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও শারীরিক রং গঠনের বৈচিত্র্যেই ধরা পড়ে।

খৃষ্টাব্দ প্রথম শতক থেকে ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভাবিত ছিলো। অনেক ভারতীয় তখন উক্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ভারতীয় রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে নতুন সভ্যতায় উদ্ভব হয়, তা অদ্যাবধি উক্ত অঞ্চলে স্বকীয় পরিচয়ে বিদ্যমান আছে। থাই রাজ পরিবার সহ সাধারণ মানুষ এখনো সংস্কৃত নাম ধারণ করে থাকেন। ইন্দোনেশীয় যাত্রীবাহী বিমান সংস্কৃত গরুঢ় নামে পরিচিত। বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে উল্লেখিত নিম্নোক্ত বিবরণটিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের অন্যতম দলিল, যথা ঃ 'এক সময় জনৈক চম্পা রাজকুমার বহু অনুচর বর্গ সহ সমুদ্র পথে, তাম্রলিপ্ত হয়ে ব্রহ্মদেশ গমন করেছিলেন।' (চাকমা সংস্কৃতির আদি রূপ, পৃঃ ৫৫)
সুতরাং চাকমারাও সে দলের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন ভারতীয় লোক হতে পারেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, চম্পা ভারতের বিহার প্রদেশভুক্ত একটি এলাকা, এবং বিহার বাংলা ও নেপালের সীমান্ত সংলগ্ন ত্রিভুজেও এ নামের আরেকটি স্থানের উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়। এ নামটির সাথে তাম্রলিপ্ত এবং সমুদ্র যুক্ত থাকায়, স্বাভাবিকভাবেই ভাবা যায় যে, সম্ভবত চম্পাই চাকমা উপখ্যান খ্যাত চম্পক নগর, এবং তার ব্রহ্মদেশ অভিযাত্রী রাজকুমারই রাজা বিজয়গিরি। সুতরাং এ সুত্রে চাকমা সমাজ মূলতঃ ভারতবাসী। তাই তাদের ভাষা, আচার, আচরণ, নাম করণ ও ধর্মীয় বিশ্বাসে ভারতীয় প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক, এবং কার্যতঃ তাই আছে।

চম্পক নগরকে প্রাচীন ভারতীয় এলাকা এবং বিজয়গিরি ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের ভারতীয় লোক জ্ঞান করা সঙ্গত হলে, তথাকার লোক বলে তারা হয় ভারতীয় মিশ্র মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত হবেন। পরে দীর্ঘ আরাকান প্রবাসে তথাকার মঙ্গোলীয়দের সাথে রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটায়, তাদের পক্ষে পরিপূর্ণ মঙ্গোলীয় রূপধারণ সম্ভব হয়েছে।

আরব, ইরানের ধর্ম প্রচারক বণিক স্মপ্রদায় যাদের বিদেশে সম্মানার্থে শেখ সম্বোধন করা হয়, এবং বাণিজ্য উপলক্ষ্যে যাদের অনেককে চট্টগ্রাম ও আরাকানের সাগর উপকূলে বসবাস করতে হয়েছে, এবং এতদ্দেশীয় অনেক বাঙ্গালী পাঠান ও মোগল, যারা ব্যবসা ও রাজনৈতিক কারণে আরাকান অঞ্চলে প্রবাসী হয়েছিলেন, তাদের সবার স্থানীয় স্ত্রীদের গর্ভজাত মানবগোষ্ঠী, মাতৃ আকৃতি লাভের দ্বারা মঙ্গোলীয় রূপ লাভ করে থাকবেন। অনেকের মতে তারা হলেন তথাককার থেক বা সেক, যারা জের বাদী ও রোহিঙ্গা খ্যাত লোক। ওদের সবাই সংকর মঙ্গোলীয়। ওরা অবিমিশ্র মঙ্গোলীয় হলে, তাদের ভাষায় ও নামকরণে অবশ্যই মঙ্গোলীয় উপাদান অবশিষ্ট থাকতো। অনেকের ভিন্ন ভাষা গ্রহণের নজির থাকলেও, আদি ভাষার অবশেষ সবার মাঝেই কম-বেশী থাকে, যেমন আর্যদের দুনিয়াজোড়া বিস্তৃতি সত্বেও ভারতীয়রা বলে মাতাপিতা, ইরানিরা বলে মাদর পিদর এবং ইংল্যান্ডবাসীরা বলে মাদার ফাদার। এভাবে সবার মাঝেই আর্য ভাষার মৌলিকত্ব বিদ্যমান। এটা মানবিক শ্রেণী

নির্ণয়ের প্রধান শক্তিশালী উপাদান।

চাকমাদের শ্রেণী নির্ণয়ের ব্যাপারে, তাদের গৃহীত খেমার চরিত্রের বর্ণমালা কিছু বৈপরিত্যের সৃষ্টি করে। তবে তা তাদের আরাকান ও দক্ষিণ বার্মার পেগু অঞ্চলে দীর্ঘ প্রবাসের উপজাত ভাবাই সঙ্গত। কারো কারো মতে এতেও ভারতীয় ভাষা ও বর্ণের মিশ্রণ আছে। বর্ণগুলো মাত্র আকৃতিতেই খেমার চরিত্র ভিত্তিক। কিন্তু নামে ও বর্গের উচ্চারণে বাংলা অনুসারী তথা ভারতীয়। বর্মী ও ইন্দোচীনী ভাষার অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক শব্দই চাকমা ভাষায় বিদ্যমান, যা তাদের দীর্ঘ প্রবাসের উপজাত। আদতে তারা তথাকার আদি বাসিন্দা হলে, অধিক সংখ্যায় বর্মী ও ইন্দোচীনী শব্দই তাতে পাওয়া যেতো। প্রত্যেক জাতির নাম ও ক্রিয়াপদে ফল্গুধারার মত আদি ভাষার অবশেষ অক্ষুণ্ন থাকে, এবং তাতে জাতিগত মৌলিকত্ব নির্ণীত হয়। চাকমাদের নামেও ভাষায় ভারতীয় মৌলিকত্ব বিদ্যমান থাকায়, তাদেরকে ভারতীয় মূলের আরাকানী লোক ভাবা যায়।

আরবী ও পালি ভাষার বর্ণমালার মত চাকমা বর্ণমালা আকারে উচ্চারিত হয়, এবং নামগুলো আকৃতি জ্ঞাপক এবং বাংলা বর্ণমালার নাম সম্বলিত। বাংলা বর্ণ বিন্যাস ও স্বরচিহ্ন তাতে গৃহীত। এককালে তাদের মাঝে আরবী বর্ণের চর্চাও প্রচলিত ছিলো, যার প্রমাণ নয়টি রাজকীয় সীলমোহর।

ধর্ম-বর্ন সম্প্রদায়-সমাজ ও অঞ্চল নির্বিশেষে সব বাঙ্গালীর সাহিত্যিক ভাষা, বর্তমানে এক সর্বসম্মত অভিন্ন কথ্য বাংলার রূপ ধারণ করলেও, প্রত্যেকের নিজ নিজ গন্ডিতে পৃথক ব্যবহারিক ও সামাজিক ভাষা সর্বদাই ভিন্ন। পূর্বে হিন্দুয়ানী বাংলা ও মুসলমানী বাংলার পৃথক দুধারা প্রচলিত ছিলো, এবং এখনো তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান আছে। একজন হিন্দু কারো ডাকে আজ্ঞা বলে সাড়া দেন, কিন্তু একজন মুসলমান সে ক্ষেত্রে বলেন জি। মুসলমানরা যাকে বলেন হুজুর, হিন্দুরা তাকে সুধান কর্তা। এমনি সুফিকে সাধু, ফকির দরবেশকে মুণিঋষি ইত্যাদি। কিছু বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ যথাঃ বেহেশত, দোজখ, গোসল, ওক্ত, আওয়াজ, গুনাহ, ছোয়াব, মর্দ, পাক, নাপাক, আজাব, পানাহ, ফরজন্দ, হারাম, হালাল, তকদীর, হায়া, শরম, হায়াৎ, মৌৎ, রিজেক, দৌলত ইত্যাদি খাটি মুসলমানী শব্দ। অমুসলিম সমাজে এ জাতীয় শব্দাবলী কচিত ব্যবহারের নজির আছে। অনুরূপভাবে হিন্দুয়ানী শব্দ যা সংস্কৃত ও দেবদেবী ঘেষা, তা মুসলমান সমাজে, কমই ব্যবহৃত হয়, যথাঃ ঈশ্বর, ভগবান, স্বর্গ, নরক, শ্রাদ্ধ, জল, যারজ, স্নান, আহ্নিক, আত্মা, খুড়া, পিসি, ঠাকুরদা, শুচি, অশুচি ইত্যাদি। সাজপোষাক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের আধুনিক ধারায় অনেকের ধর্ম ও সামাজিক পার্থক্য ধরা না গেলেও, আন্তরিক ও ঘনিষ্ট আলাপে ভাষাজাত পার্থক্যের পৃথক পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চাকমা সাহিত্য ও লোকগীতির ভাষাকে বিশ্লেষণ করে, এমনিভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, তাতে মুসলিম ভাষা চরিত্রের প্রভাবই বেশী। রাধা মোহন ধনপতি নামীয় লোকগীতির ভাষা লক্ষ্যণীয়, তাতে একটি আরবী বাক্যাংশই স্থান করে নিয়েছে, যথা ঃ লবিয়ং সবিয়ং

থুম, মানে আদর আপ্যায়ন শেষ। থুম আরবী তামের বিকৃতি, যার অর্থ শেষ।
(সূত্র ঃ রাধা মোহন ধনপতির বিবাহ পর্ব)
এই একই পালার দ্বিতীয় উদাহরণ হলো ঃ
'অইয়োন গাভুর মর্দে আধা লাংগ্যা আধা নেক।'
এখানে মোট সাতটির মধ্যে পাঁচটি খাটি মুসলমানী শব্দ। লাং উপপতি এবং নেক স্বামী অর্থে ব্যবহৃত বাঙ্গালী মুসলমানদের খাটি সামাজিক শব্দ। মর্দ শব্দটি ও মুসলিম বাঙ্গালীদের ব্যবহৃত। এভাবে চাকমা ভাষা বিশ্লেষণের দ্বারা, উক্ত ভাষায়, মুসলমানী ভাষা ঐতিহ্যের প্রাচুর্য্য উদঘাটিত হয়, যা এককালে তাদের মাঝে ঐ সমাজের লোকদের ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটার প্রমাণ। ভাষাগত সংমিশ্রণ, শিখানো বুলি বা অনুকরণ জাত কিছু নয়। নতুবা হিন্দু সমাজ সর্বাগ্রে তাদের প্রাচীন প্রতিবেশী ও রক্তের অংশীদার মুসলমানদের ভাষা ঐতিহ্যে অধিক অভ্যস্ত হতেন। তারাও চাকমাদের মত ঈশ্বরকে খোদা বলে সম্বোধন রপ্ত করে নিতেন।
এমনি চাকমাদের নামের সাথে খাঁ ও বিবি ব্যবহারের ধারা, প্রভাব বা অনুকরণজাত ভাবা যায় না। তাদের অনুসৃত মুসলিম নামকরণ রীতির প্রথম উদাহরণ হলো, তৃতীয় রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈনিক রাজার মেয়ে মানিক বি। উক্ত বি. যা বিবি শব্দের অপভ্রংশ, প্রমাণ করে যে তখন ছিলো মুসলিম আমল, এবং মানিক বি নিজে হয় মুসলিম ছিলেন, অথবা মুসলিম স্বামী সুত্রে তিনি বিবি উপাধি লাভ করেছেন। তবে কোন সুত্রেই তখন তাদের উপর অপ্রতিরোধ্য মুসলিম প্রভাব ছিলো বলে জানা যায় না। লোককাহিনী সুত্রে তখন তারা আরাকানের অভ্যন্তরে বিজিত রাজ্যের অধিবাসী রাজপুরুষ। সুতরাং মুসলিম ধর্ম নাম উপাধি তাদের উপর আরোপিত ভাবার অবকাশই নেই। অনেকে বিকৃত অর্থহীন এবং বিজাতীয় উপসর্গ সম্বলিত নামধারী হলেও, তারা অমুসলিম ছিলেন, এ দাবীও প্রামাণ্য নয়। রাজা শের জব্বার খার সীলমোহর সূত্রে ও বলা যায়, চাকমা রাজবংশের কার্যতঃ ইসলাম ধর্মাবলম্বী না হওয়া সন্দেহজনক। নাম, উপাধি, ভাষা ও আচরণের চরিত্রগুণে, সাধারণ আর অভিজাত অনেক চাকমার রক্ত ও ধর্মের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নির্ণীত হয়, যা অতীতে উভয়ের মাঝে সংমিশ্রণ ও একাত্মতা ঘটার লক্ষণ।

চাকমা সমাজের উদারমনা পন্ডিতদের কেউ কেউ স্বীকার করেন এবং অনেক লেখক ও উল্লেখ করেছেন যে, অতীতে চাকমা মহিলাদের লাশ কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিলো। এখনো দেখা যায়, জুমিয়া, টুংটুংগ্যা ও স্যাক মেয়েরা, চিকন গলাও ভরা হাতা ফতুয়া পরে, বুকে এক খন্ড কাপড় পেচায় ও মাথায় পাগড়ি বাঁধে, এবং দীর্ঘ পিননে নিম্নাঙ্গ ঢাকে। যদ্বারা ভালভাবেই তাদের শারীরিক পর্দা পালিত হয়। এটাকে ইসলামী পরিভাষায় ছতর ঢাকা বা আব্রু করা বলে। চাকমা ভাষার যৌন অঙ্গগুলো ঢাকাকে হুবহু আব্রু আর ছদর ঢাকা বলে। ছদর শব্দটি ছতরেরই অপভ্রংশ, যার অর্থ গোপন অঙ্গ। শব্দটি মূলতঃ আরবী। ইসলামী নিয়মে ছতর হলো পুরুষদের বেলায় নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত এবং মেয়েদের বেলায় মুখ মন্ডল, কব্জি পর্যন্ত হাতের

অগ্রভাগ এবং ঘন্টির অগ্রভাগ পা বাদে সমস্ত শরীর। পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ছতর বা গোপন অঙ্গ ঢাকা ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয়। ইসলামী নীতিতে বিবাহের পাত্রীকে মোহরানা বা কন্যাপণ দান ফরজ। চাকমা সমাজেও দাবা নামে এটা প্রচলিত। শব্দটি আরবী দাওয়ার অপভ্রংশ, যাকে বাংলায় বলে দাবী। অনুরূপ পুরুষ মুসলিমদের মত চার পর্যন্ত একাধিক বিবাহ রীতিও তাদের মাঝে প্রচলিত। জন্মগত কারণেই ভিন্ন সমাজের নাম, পদবি, ধর্মাচার, ভাষা ও আদব কায়দার অনুপ্রবেশ প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজে ঘটে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্তমানেও বিদ্যমান। রাঙ্গামাটির অধিবাসী নিহত হানিফ বিহারীর উপজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত ছেলে-মেয়েরা নামে, ধর্মে ও ভাষায় সংকর চরিত্র সম্পন্ন। এই একই ক্ষেত্রে মাঝির বস্তির মৃত রাজ্য ধনের মেয়েটিও মৃত মুসলিম স্বামীর ঔরশজাত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কখনো মুসলিম, কখনো বৌদ্ধ আর কখনো খৃষ্টান পরিচয়ে পরিচিত। চিত মরমের মরহুম লবির আহমদ চৌধুরীর উপজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের সবাই নির্ভেজাল মুসলিম ঐতিহ্যের অধিকারী নয়। এদের সবাই নাম পদবি, ভাষা, আদব কায়দা ও ধর্মানুসরণে মিশ্র ধারার অনুসারী। এমনিভাবেই রাইংখ্যং মুখের অধিবাসী রকিব আলী মাহুতের উপজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের কেউ কেউ নামে ঐতিহ্যে মুসলমান, কিন্তু আত্মীয়তা ও সামাজিকতায় মাতৃবংশের সাথে সম্পৃক্ত। অনুরূপ প্রত্যক্ষ উদাহারণের সংখ্যা ভূরি ভুরি, যা অতীত ঘটনাবলীরই হাল প্রতিচ্ছবি। সুতরাং ঔরশজাত সন্তানদের দ্বারা পিতৃ-মাতৃ ঐতিহ্য, প্রতিপক্ষীয় সমাজে সংক্রমিক হওয়া এবং অনুরূপ সংকর জাতের লোকজনের দ্বারা জন্মে প্রজন্মে, নামে খেতাবে, ভাষায় আর আচরণে মিশ্র ঐতিহ্যের সংক্রমণ ঘটা সম্পুর্ণ সম্ভব। চাকমাদের পক্ষে ঐ মিশ্রণধারা থেকে মুক্ত আর বিশুদ্ধ থাকা প্রমাণিত নয়। নাম, খেতাব, ভাষা ও আদব-কায়দার সাথে ইসলাম ধর্মীয় অনেক উপসর্গ প্রবিষ্ট থাকায়, তাদের খন্ডিত মুসলিম পরিচিতি বা মিশ্র জাতিসত্তা প্রমাণিত। মুসলিম আত্মীয় কুটুম্ব থাকার অর্থেই খিসা বা খেশা, দেওয়ান, তালুকদার, খাঁ ও বিবি খেতাবের প্রচলন ঘটা সম্ভব। হালের উত্তেজনাকর রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বন্দ্বেও, সে মৌলিক পরিচয় স্বীকার্য, যা কার্যতঃ উভয়ের মাঝে জাতিগত সম্প্রীতি রচনার এক গুরুত্বপুর্ণ সেতুবন্ধনরূপী সূত্র হওয়ার যোগ্য।

১৫। অভাব দুর্ভিক্ষ আর অর্থনৈতিক দূরবস্থা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনই এখানকার লোকের অভাব ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। এটা কর্মসংস্থান, রুজি-রোজগার, খাদ্য ও বাসস্থান যোগাড়ের অবলম্বন তো বটেই, সম্পদ সৃষ্টিরও সহায়ক। একজন অভাবগ্রস্ত লোক মাত্র একটি দা ও কুড়াল অবলম্বন করে বিনা বাঁধায় নিকটবর্তী খাস বন ও পাহাড় থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময়ের ভিতর বাঁশ গাছ, বেত, লতা-পাতা, লাকড়ি, ঝাড়ু ফুল, বন্য তরিতরকারী ও শাকসবজি অনায়াসে সংগ্রহ করে এনে নিকটবর্তী বাজারে বা পাড়ায় বিক্রি করে,

তার প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে দিনে দিনেই ঘরে ফিরতে পারে। এক প্রকার বন্য আলুতেও সাময়িক ক্ষুধা নিবারণের সুযোগ আছে। জীবিকা নির্বাহের এই প্রাকৃতিক সুযোগের সাথে কর্ণফুলী হ্রদ ও তার বিপুল পরিমান মৎস্য সম্পদ আর সহজ নৌ-যোগাযোগের সুবিধাগুলো সংযোজিত হয়েছে। তাই একমাত্র অনড় অলস ছাড়া কারো পক্ষে এতদাঞ্চলে ভুখা নাঙ্গা থাকা প্রায় অসম্ভব। তবু এতদাঞ্চলে স্বচ্ছল লোকের সংখ্যা নগণ্য, এবং সম্পদশালী লোক অত্যন্ত বিরল। সম্পদ গড়ার শিল্প বাণিজ্যে স্থানীয় লোকেরা তৎপর নয়, এটাই তাদের হীনতা ও দীনতার কারণ। এ সত্যটি পাহাড়ীদের বেলায় অধিক প্রযোজ্য।

সংরক্ষিত বন আর অশ্রেণীভুক্ত বনের সম্পদ পরিমানে বিপুল। বৈধ অবৈধ উপায়ে এই সম্পদ আহরণ চালান দেয়া ও খরিদ বিক্রি টাকা কমানোর এক বিরাট মাধ্যম। এই সম্পদ লোকালয় পার্শবর্তী হওয়ায় এবং হ্রদ ও নদী পথে যুক্ত থাকায় স্থানীয় কাঠুরেদের ও বেপারী মহলের নাগালাধীন। টাকা কমানোর এটাও সহজ ও পর্যাপ্ত সুযোগ। এই সুযোগকে স্থানীয় কাঠুরেদের মাধ্যমে কাজে লাগাচ্ছে প্রধানতঃ ব্যবসায়ী, ব্যাপারিপাচারকারী ও অর্থলোভী বন কর্মকর্তা ও কর্মচারী মহল। তাতে কাঠুরেদের কামাই রোজগার নগণ্য। তবে সম্পদশালী হচ্ছে বেপারী ব্যবসায়ী বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় সম্পদ বন লুট হয়ে যাচ্ছে। নিস্ব হচ্ছে বন। সাধারণের এই কামাই রোজগারের সুত্র নিঃশেষ হয়ে পড়ছে।

১৭৬৯-৭০ সালের দেশজোড়া দুর্ভিক্ষে এক-তৃতীয়াংশ বাঙ্গালীর জীবনহানি, ১৮৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে অগণিত লোকের জীবননাশ এবং ১৯৪৩ সালের খাদ্যভাবে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙ্গালীর অপমৃত্যু হলেও, পার্বত্য, চট্টগ্রাম তা থেকে মুক্ত ছিলো। তবু এখানেও মাঝে মধ্যে অভাব অসুবিধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ১৮৯১ সালে চেঙ্গী উপত্যকায় জুম কৃষি আশানুরূপ হয়নি। ফলে সর্বত্র খাদ্যশস্যের হাহাকার দেখা দেয়। তার মোকাবেলায় রেঙ্গুনী চাল খরিদ করে, সরকার তা ঋণ হিসাবে বিতরণের জন্য বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। পুনরায় ১৯০৫ সালে অসময়ে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে, জুম পোড়ানো ও বীজ বুনা সম্ভব না হওয়ায়, খাদ্য শস্যের অভাব দেখা দেয়। এর প্রতিকারে জনগণের খাদ্যের সংস্থান ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বনজ পণ্য সংগ্রহ ও বিক্রি, এবং কৃষি কাজের জন্য মাইনীর সংরক্ষিত বনের একাংশ মুক্ত করে দেয়া হয়। সমগ্র অঞ্চল ব্যাপ্ত অভাবে বিতরণ করার জন্য সরকার বেঙ্গুনী চাল কিনে জনসাধারণের মাঝে নগদ ও ঋণ হিসাবে বিতরণ করার জন্য আশি হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। মাতামুহুরী, শঙ্খ, কর্ণফুলী, চেঙ্গী কাচালং ইত্যাদি উপত্যকা অঞ্চলে বহু খাদ্য গুদাম খোলা হয়। অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খয়রাতী সাহায্যও বিতরিত হয়। খ্রীষ্টীয় বেপ্টিষ্ট মিশন চাঁদার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের চাল ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। চাকমা রাজা ও পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের চাল ঋণ হিসেবে বন্টন করেন। কোন উপজাতীয় সর্দারের ওটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কাজ।

ঐ অভাব ও দুর্ভিক্ষে প্রাণহানি স্বীকৃত না হলেও, অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণের দ্বারা সৃষ্ট পেটের অসুখে বহু লোকের প্রাণনাশ ও অসংখ্য লোক অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। এটা বৃদ্ধ ও শিশুদের পক্ষে অধিক মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এই সাথে ইদুঁরের উৎপাতে কৃষি ও খাদ্যশস্য ভীষণ ক্ষতির কবলে পড়ে। অনুরূপ প্রথম ঘটনা ঘটেছিলো ১৮৬৪ সালে। তখন সাজেকসহ গোটা উত্তরাঞ্চল ছিলো ইদুর বন্যার শিকার। কৃষিক্ষেত্রসহ বাগান, বাড়ী-ঘর, গুদামের যাবতীয় কিছুই তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

মিঃ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার স্বীয় পুস্তক দি স্টেটিষ্টিকেল একাউন্ট অফ বেঙ্গলে উনবিংশ শতাব্দীতে এতদাঞ্চলের উপজাতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নকারে বর্ণনা করেছেন ঃ

'সর্দার ও কিছু হেডম্যান বাদে সাধারণ লোকজনের সবাই দরিদ্র। তারা নিজেদের পাড়ার নিকটবর্তী পাহাড় ও বনে তার শেষ ভূমি খন্ডটির ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত, জুম চাষ করে। অতঃপর নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। ফসল উৎপাদনে মন্দা দেখা দিলে তারা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে এই আশায় যে আগামীতে ভাল ফসল হবে এবং তাতে ঋণ হাওলাত শোধ করা যাবে। নৌকা, কাঠ অথবা বাঁশ সরবরাহের দ্বারাও ঋণ হাওলাত শোধ করা হয়। পাহাড়ী লোকেরা বিশেষতঃ মগ ও ত্রিপুরারা মদের প্রতি অধিক আসক্ত। ১৮৭০ সালে জেলা প্রশাসক বলেছেন, তিনি সতর্ক অনুসন্ধানের দ্বারা নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে একজন পাহাড়ীর অন্ততঃ অর্ধেক আয় রোজগার মদের পিছনেই ব্যয় হয়ে যায়।'

চট্টগ্রাম ডিভিশনের মাননীয় কমিশনার ১৯১৭ সালে স্বীয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন ঃ 'পাহাড়ী লোকদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এবং তা প্রতিবছর অধিকতর মন্দই হচ্ছে। একজন পর্যটককে প্রথমে যে জিনিসটি পীড়া দিবে, তা হলো সাধারণ লোকের ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য। ১৮৯১ সালের পর থেকে প্রতি বছর কষ্টের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।
ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন। ১৮৬৯ সালে জুমিয়াদের আয় রোজগারের নিম্নোক্ত হিসাব প্রদান করেছেন ঃ

'সাধারণতঃ একটি জুমিয়া পরিবার প্রায় ৯ কানি বা ৩.৬০ একর জমি নিয়ে জুম করে। তাতে গড়ে ৭২ মন ধান, ১২ মন তুলা, এ ছাড়াও তরিতরকারী তিল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যময় ভোগের জন্য ৪০ মন ধান প্রয়োজনীয়। বাকি ৩২ মন বিক্রয়যোগ্য। দু'মন তুলা পারিবারিক ব্যবহারে লাগে। ১০ মন বিক্রির জন্য থাকে। তিলাদি ও তরিতরকারীর বিক্রয়মূল্য সহ ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে উদ্বৃত্ত ধান ও তুলা থেকে তার আয় হয় ৭০ থেকে ৮০ টাকা।'

'এই কৃষি কাজের অতিরিক্ত একজন জুমিয়া নিকটবর্তী খাস বন থেকে বাঁশ গাছ, লতা, লাকড়ি, ইত্যাদি বনজ পণ্য সংগ্রহ করে নিকটবর্তী বাজারে অথবা বেপারীদের

নিকট বিক্রি করে তার আয় বাড়াতে পারে। তবে ঘরে ফসল তোলার পর তারা প্রায় অলস ভোগ ও মদ খেয়ে কাটায়। সঞ্চয়, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা লাঙ্গল কৃষির প্রতি তারা উদাসীন।' লুইন সাহেব স্বীয় পুস্তকে আরো মন্তব্য করেছেনঃ

(ক) 'সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের কোনখানে এমন কোন পাহাড়ী লোকের সন্ধান আমি পাইনি, যে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে। প্রকৃতপক্ষে জুম চাষ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এমন ব্যক্তি কদাচিৎ দেখা যায়। কতিপয় সর্দার মাতবরের গ্রামের কাছে কখনো সখনো কয়েক একর লাঙ্গল চাষের জমি লক্ষ্য করা যায়। তবে তারা তা দেখা শোনা করার জন্য বাঙ্গালী চাষী নিযুক্ত করে থাকেন।'

(খ) 'একজন উপজাতীয় চাষী সমতল ভূমিতে চাষ করাকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী মনে করে। সমতল ভূমির চাষীএকজোড়া মহিষের লেজে নাড়া দিয়ে স্বীয় ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে কড়া রোদের দুপুরে, ও হাটু সমান কাদায় ডুবে কাজ করে যায়। মাঠের ভিতর কোন গাছ বা আচ্ছাদন থাকে না, যার ছায়ায় মধ্যাহ্নের খাঁ খাঁ রোদে কিছুক্ষণের জন্য হলেও জিরাতে পারে। তার চতুরপার্শে থাকে শুধুই বিস্তৃত কর্দমাক্ত জমি। তাদের স্ত্রীরা তখন ঘরে হিংস্র জন্তু জানোয়ার পরিবেষ্টিত পরিবেশে আবদ্ধ থাকে। এর মধ্যে চাষীটি যদি তার মহ্যাহ্নের খাবার যোগাড় থাকে, তবে তা কর্মমাক্ত লাঙ্গলের পাশে বসেই গ্রহণ করে। তাই সমতল ভূমির চাষের চেয়ে, একজন পাহাড়ী দিনে দু'টাকা রোজগার করলেও তা হয় তার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। এতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই নেই। পাহাড়ীরা তাদের জীবন যাত্রার প্রতি খুবই আবেগপ্রবণ। এবং তারা স্বাভাবিক বন্য জীবন যাত্রার বিপরীতে সমতল ভূমির জীবন যাত্রা প্রণালীকে মনে করে এক ঘেয়ে, যা অবলম্বন করাকে তারা অপছন্দ করে। (সূত্র ঃ দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এণ্ড দি ডোয়েলার্স দেয়ার ইন)

১৮৬৫ সালে প্রণীত ও জারিকৃত বন সংরক্ষণ আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগের দ্বারা জুম কৃষি থেকে পাহাড়ীদের বিরত না করে, হাল কৃষি গ্রহণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ শুরু হয়। আসলে হালকৃষি হলো অধিক লাভজনক। তাতে পরিবেশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। তদ্বারা লোকজন স্থায়ী পাড়া জীবন-যাপনের সুযোগও পায়। বন্দোবস্ত গ্রহণের দ্বারা তাতে জমির ব্যবহার ও মালিকানা স্থায়ী হয়। বাগান ও সব্জি ক্ষেত গড়ে তোলা যায়, যা হয় বাড়তি আয় ও আয়েশের উৎস। স্থায়ী পাড়া জীবনে শিক্ষা লাভ, স্বাস্থ্য সুবিধা ভোগ, বিনোদনমূলক সংস্কৃতির চর্চা, আয়েশমুলক আবাসন ও শিল্প সুবিধা নিহিত থাকে, যা একজন জুমিয়ার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সুখী ও সভ্য জীবনের বাহন হলো প্রথমতঃ ভূমি বন্দোবস্তি লাভ ও হালকৃষি অবলম্বন। সরকার এই ব্যবস্থাটি উপজাতিদের মাঝে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ ভূমি বন্দোবস্তি সহজতর করেন। মৌজা প্রধানদের ভূমি পত্তনের ক্ষমতা দেয়া হয়। প্রথম তিন বছরের জন্য জমি গ্রহীতারা খাজনা মুক্ত হোন। জমির দখল ও আবাদের সুবাদে তৎপর জেলা প্রশাসক এবং মহকুমা প্রমাসকেরা প্রথম শ্রেণীর কৃষি জমির

জন্য একর প্রতি তিন টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দু'টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য এক টাকা খাজনা ধার্য্য করে, অতি সহজ পদ্ধতিতে বন্দোবস্তি বা ইজারা প্রদান করেন। এই ব্যবস্থাও জুমিয়াদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হলে, হাল কৃষিতে তারা অনভিজ্ঞ বলে, সরকারী ব্যয়ে বাঙ্গালী কৃষক নিযুক্ত করে, হাল কৃষি শিক্ষাদান ও পাশাপাশি বীজ, পুঁজি, হালের বলদ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের সরকারী উদ্যোগ গৃহীত হয়। তবু এটা বাঞ্ছিত সুফল দানে ব্যর্থ হয়। হালকৃষি সীমিতভাবে শুরু হলেও, সর্দার ও মাতবরদের উৎসাহে জুম কৃষিটিও অব্যাহত থাকে। কারণ সর্দার ও মাতবরদের আয়ও পদবিগত মর্যাদা জুম কৃষির সাথে জড়িত, এবং উপজাতীয় সমাজও সার্বিকভাবে তাদের দ্বারা পরিচালিত। তবে প্রকৃতিগত কারণেও লোক বৃদ্ধির ফলে জুম কৃষি হ্রাস পায়, এবং একই ভূমিতে বারবার চাষ ও সার প্রয়োগের দ্বারা বাড়তি খাদ্য ফলানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাতে হালকৃষি অবলম্বন ছাড়া উপায় থাকে না। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে ধীরে ধীরে হাল কৃষির যুগ শুরু হয়ে যায়। এ কাজে তাদের গুরু হলো ঐসব বাঙ্গালী, যারা লুসাই অভিযানকালে কুলি হিসেবে আনিত, সরকার কর্তৃক চাষ শিক্ষাদানে নিযুক্ত, এবং সর্দার ও মৌজা প্রধানদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত খামারে বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে চাকুরী প্রাপ্ত হয়েছিলো। এটা ছাড়াও সৌখিন খামারী ও ভাগ্যান্বেষী চাষী হিসেবে সর্দার ও হেডম্যানদের অনুমোদন ও উৎসাহে অনেক বাঙ্গালী কৃষিকাজ ও ভূমি আবাদে নিযুক্ত হয়। প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইনের সময় ও বাঙ্গালীরা ভূমি বন্দোবস্তি ও ইজারা লাভ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন ঃ

'খামারে স্বাধীন উপজাতিদের আক্রমণের ভয় থাকায় এ পর্যন্ত বাঙ্গালীরা এ জেলার বিস্তৃত সমতল ভূমি অধিকার করে চাষাবাদ করার সাহস পায়নি। তবে সম্প্রতি একটি উদ্যোগ শুরু হয়েছে, এবং গত দু'বছর ধরে এ জেলার চট্টগ্রাম সীমান্তের অনেক জমি সমতলবাসীদের কাছে ইজারা দেয়া হচ্ছে। (সূত্র ঐ)

মিঃ পিয়ের বেসানেত বলেন ঃ 'লাঙ্গল পদ্ধতির চাষ পাহাড়ীদের নিজস্ব নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উপজাতীয় রাজারা বাঙ্গালীদেরকে পাহাড়ের নিম্নাংশের যেখানে সেচ করা সম্ভব, সে সব জায়গায় বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ করে আনেন এবং তারাই হাল কৃষির প্রবর্তন করে। ওদের বংশধরেরা এখনো ঐ সব জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু তাদেরকে পাহাড়ী না বলে সমতলবাসী বলা হয়ে থাকে।.....প্রায় দেড় শত বছরের মধ্যে অনেক পাহাড়ী লোকই তাদের কাছ থেকে চাষে লাঙ্গল ব্যবহারের কৌশল শিখে নিয়েছে। (সুত্র ঃ ট্রাইবসম্যান অফ দি চিটাগাং হিলট্রাক্টস)

আজকাল উপজাতিদের আয় রোজগারের সম্প্রসারিত সুত্র হলোঃ কৃষি ব্যবসা ও চাকুরী।

১৬। উপাজাতীয় সমাজে সংকরায়ন ও বিবর্তন।

দাম্পত্য আর যৌন সম্পর্ক রচনায় এতদাঞ্চলীয় উপজাতীয় সমাজের কোন কোন সম্প্রদায় উদার, আর কেউ কেউ কিছুটা রক্ষণশীল। সাধারণ চাকমারা এ ব্যাপারে আধা শুদ্ধাচারী। মারমা, মগ রোয়াঙ্গ্যা ও রাখাইনরা অপেক্ষাকৃত উদার। ত্রিপুরাসহ অন্যান্যরাও অসামাজিক যৌনাচার ও বহির্বিবাহে অভ্যস্ত। আংশিক শুদ্ধাচার, ও সমাজমুখী যৌন রীতি উজজাতীয় সমাজে প্রচলিত। সমাজপতি, অভিজাত, আর শিক্ষিতদের মাঝে আন্তঃসমাজ দাম্পত্য সম্পর্ক প্রায় প্রচলিত। উঁচু মহলে বর্হির্বিবাহ প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাধারণের মাঝে অনুরূপ ঘটনা উত্তেজনার কারণ হয়। আর এ ব্যাপারে প্রতিবাদী ভূমিকা উঁচু মহলের দ্বারাই পালিত হয়। রাজনৈতিক কারণে চাকমা দুহিতাদের সাথে বাঙ্গালী মুসলিম পাত্রদের বিবাহ বা যৌন সম্পর্ক অধিক আপত্তিকর। যদিও প্রেমঘটিত কারণে অনুরূপ সম্পর্ক রচনার ঘটনা মাঝে মধ্যে ঘটে এবং তা প্রচুর সাম্প্রদায়িক উত্তাপ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অনুরূপ উত্তেজনাকর প্রধান ঘটনা হলো : সম্ভবতঃ ১৯৫৩ সালে সংঘটিত মকতুল হোসেন ও অমীয় বালা চাকমার পারস্পরিক প্রেম ও পলায়নের ঘটনা এবং তা থেকে চাকমা রাজ আদালতে চলমান সামাজিক মামলা ও তার উত্তেজনাকর পরিণতি। বিচার চলাকালে তখনকার যুবক রাজা ত্রিবিদ রায়, আসামীদ্বয়ের পক্ষে সমবেত উৎসুক বাঙ্গালী জনতার প্রতি, যুবা সুলভ উত্তেজনা বশতঃ বন্দুক তাক করেন, এবং সম্ভবতঃ গুলিও ছুড়েন। তাতে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে কতোয়ালী থানার তখনকার দারোগা সোনা মিয়া তাকে গ্রেফতার করেন। পরে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে রাজা বাহাদুর মুক্তি পান ও প্রেমিক যুগলের বিবাহ অনুমোদিত হয়। এটা উল্লেখ্য যে, খোদ চাকমা রাজা, স্বীয় সহোদরা, এবং পিতৃব্যজাত ভাইবোনদের অনেকেই, বাঙ্গালী ও বিজাতীয় রক্তের অংশীদার। তাদের অধিকাংশ নিজেরাও বাঙ্গালীসহ বহির্বিবাহে আবদ্ধ।

এটা আনন্দ আর গর্বের বিষয় যে, প্রয়াত রাজা ভুবন মোহন রায়, স্বীয় প্রথম পুত্র নলিণাক্ষ রায়কে কুলিন হিন্দু ব্যারিষ্টার সরল কুমার সেনের বিদুষী কন্যা শ্রমতি বিনীতা সেনের সাথে এবং দ্বিতীয় পুত্র বীরুপাক্ষ রায়কে আরেক কুলিন হিন্দু জমিদার ভবেন্দ্র নারায়ণ ভূপের কন্যা শ্রীমতি সুধীরা ভূপের সাথে বিবাহ দেন। এই দুই বৈবাহিক সূত্রেই সর্বপ্রথম চাকমা রাজ পরিবার ভারতীয় কৌলিন্যে উন্নীত হোন। ঐ দুই কুলিন মহিলার সম্পর্কের গুণেই আদিম জুম ঐতিহ্যের ধারক চাকমা রাজপরিবার এবং তৎসূত্রে আংশিক গোটা চাকমা সমাজ আভিজাত্যে উন্নীত। নতুবা অদ্যাবধি জুমিয়া পশ্চাদপদতা, আর অনুন্নত জীবনচর্চাই হতো চাকমা আভিজাত্যের ভাগ্য। মুসলিম বা হিন্দু ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীতে স্বীকৃতি লাভের মাধ্যম হলো তাদের আদব-কায়দা ও জীবন মানে অভ্যস্ত হওয়া, এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন। এই বিচারে আদিম বন্য সংস্কৃতি উন্নত মর্যাদার বাহন নয়। তাই রাজা ভুবন মোহন রায় নিজ পরিবারকে কুলিন মান প্রদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

তাদের অতীত মুসলমানদের সাথেও আত্মীয়তায় আবদ্ধ বলে মনে করা হয়।

বহির্বিবাহে সাধারণ অনীহা সত্ত্বেও বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে বিজাতীয় পাত্রদের সাথে চাকমা পাত্রীদের এমন লোভনীয় প্রচুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, যা উক্ত সমাজের পক্ষে গর্বের বিষয়। উচ্চ শিক্ষিত পদাধিকারী ও সংস্কৃতিবান ঐসব পাত্র, তাদের পক্ষে সাধারণভাবে দুষ্প্রাপ্য। নিঃসন্দেহে পাত্রপক্ষ ঐ সম্পর্কগুলোর দ্বারা উপকৃত হয় না। বিবাহের দ্বারা শুধু দুই-পাত্র-পাত্রীর জোড় বাধাই নয়, তাতে তাদের সাথে সম্পর্কিত একদল আপনজনের পারস্পরিক মধুর আত্মীয়তা ও রচিত হয়। সামাজিকতা পানাহার, সাজ-পোশাক, একাত্মতা, মজলিসদারী, রুচি- বিলাসিতা ইত্যাদি অনেক কিছুর চর্চা এর সাথে জড়িত। রং রূপ ও সাময়িক ব্যক্তিগত ভাললাগার বাহিরে, তৃপ্তিকর অনেক কিছুই জীবনসাথীর মাধ্যমে প্রাপ্য হয়। আচার ব্যবহার, আদব কায়দার অভিজাত উন্নত ধারাটিও এই পাওনার সাথে যুক্ত। বাঙ্গালী পাত্রকে এসব অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করেই, সাময়িক উত্তেজনার বশে উপজাতীয় পাত্রীর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হতে হয়। পরিণামে এসব সম্পর্ক খুব কমই সার্বিক অর্থে সুখকর হয়ে থাকে। বিধর্মীয় সমাজে মুসলিম পাত্রী দান, ধর্ম ও সামাজিক নীতিতে নিষিদ্ধ। তাই অনিহার মধ্যেও বিজাতীয় পাত্রী গ্রহণের বিপরীতে, তাদের কাছে মুসলিম কন্যা দান প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ধর্মীয় সমীকরণ ছাড়া কোন পাত্রের সাথেই, কোন মুসলিম পাত্রীর বিবাহ, সমাজে স্বীকৃত নয়। ধর্ম ও সমাজের এই কড়া নিষেধাজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। তাই বিজাতীয় পাত্রীরা মুসলিম সমাজের পাত্র গ্রহণে সক্ষম হলেও বিনিময়ে বিজাতীয় পাত্র, কোন মুসলিম পাত্রী গ্রহণে কমই সক্ষম হয়। মুসলমানদের এই একতরফা সম্পর্ক রচনার কড়াকড়ি ধারা, বিজাতীয়দের সাথে রক্ত-মাংসের আত্মীয়তা রচনার পক্ষে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এ কারণে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে চাকমাদের আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে উঠলেও, মুসলমান সমাজ থেকে তারা দূরে অবস্থিত। হতে পারে মুসলমানদের সাথে তাদের অনাত্মীয় আচরণের এটাও অন্যতম কারণ। এটা অবশ্য সুফলদায়ক ও বটে। নতুবা বাঙ্গালী মুসলিম জনসংখ্যার এক শতাংশের ভগ্নাংশ সংখ্যক চাকমাদের পক্ষে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব হতো। বিপরীতে অমুসলিম বাঙ্গালীরা আত্মীয়তা সূত্রে উপজাতিদের সাথে অধিক ঘনিষ্ট।

এতদ কারণে ধীর ও স্বল্প সংমিশ্রণ ধারায় চাকমাসহ অন্যান্য মঙ্গোলীয়রা ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালীধর্মী তীক্ষ্ণতা ও মালিন্যে ভূষিত হচ্ছে। এভাবে ধীর গতিক শারীরিক বিবর্তন বাস্তবায়িত হওয়াতে এখন অবিমিশ্র মঙ্গোলীয় চরিত্র তাদের মাঝে প্রায় অপসৃয়মান।

চাকমাদের মাঝে বিজাতীয় পাত্র গ্রহণের সামাজিক অনীহা ও কড়াকড়ি সত্ত্বেও, সমাজের বাধ্যগত অনুমোদনক্রমে বিজাতীয় অনুপ্রবেশ ঘটার সাম্প্রতিকতম ঘটনা হলো জীপতলী মৌজায় নতুন এক সাপ্যা গোষ্ঠীর উদ্ভব। কোন এক ইংরেজ কর্তৃক জনৈকা চাকমা মহিলাকে বিবাহ করার মাধ্যমে জন্মপ্রাপ্ত সন্তান-সন্ততির দ্বারা গত

প্রায় শতাব্দী কালের মধ্যে, এই গোষ্ঠীটির উদ্ভব হয়েছে। ইতোপূর্বে দাজ্যা ও চেক কাবা ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলোর মুসলিম পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে উদ্ভুত হওয়া সম্ভব। গোষ্ঠীগুলোর নামকরণের ভিতরই সে রহস্যের ইঙ্গিত নিহিত। চেক কাবা মানে খতনাকৃত আর দাজ্যা মানে দাড়িওয়ালা। বিরল শ্মশ্রু চাকমাদের দাড়ি রাখা ও খতনা করা রীতি নয়। এটা মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্য।

যে সব মঙ্গোলীয় পাত্রী, বহির্বিবাহের দ্বারা সমাজ ত্যাগ করেছে, তারা নিজেদের সন্তানাদিসহ ভিন্ন সমাজে সংযোজিত হয়েছে। তাদের স্বসমাজ তদ্বারা নৃতাত্ত্বিকভাবে খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। তবে ভিন্ন সমাজের যে সব পাত্র ও তাদের সন্তানাদি তাদের সমাজের ভিতর অবস্থান করছে তারা রং ও গঠনে মঙ্গোলীয় চরিত্রকে প্রভাবিত করছে। এ জাতীয় সংকর জন্মধারার দ্বারা, নৃতাত্ত্বিক বিবর্তন ঘটা অনিবার্য। এসব ক্ষেত্রে সন্তানাদির মাতৃ বা পিতৃ সাদৃশ্য লাভ অথবা মিশ্র রং ও গঠন ধারণ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অনুরূপ বিবর্তনের জীবন্ত মডেল হলো বড় য়া সম্প্রদায়। তাদের মাতৃ ও পিতৃ ধারায় বাঙ্গালী ও মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ ঘটার প্রমাণ শুধু তাদের রং ও গঠনেই সিমাবদ্ধ নেই, পূর্ব পুরুষদের মিশ্র নাম তালিকায়ও নিহিত পাওয়া যায়। মনে করা হয়, তাদের অধিকাংশ মগ বংশোদ্ভুত।

অনাকাঙ্খিত হলেও চাকমাসহ অন্যান্য মঙ্গোলীয়দের বহির্বিবাহ আজকাল সীমিত নেই। মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য ভিন্ন সমাজের সাথে তাদের পাত্র-পাত্রী আদান প্রদান প্রায় চলমান। এই ধারা পারস্পরিক সম্প্রীতি রচনার সহায়ক হলেও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আজকাল চাকমা সমাজে মুসলিম নামকরণ প্রথা রহিত। নতুবা আজকাল তারা নামে খেতাবে ভাষাও ব্যবহারে মুসলিম চরিত্র সম্পন্ন অন্যতম সম্প্রদায় বলে গণ্য হতো। নামে অমুসলিম মঙ্গোলীয় চিহ্নিত হওয়ার সরল প্রথা বৃটিশ আমলেই প্রবর্তিত হয়, যে ধারা অদ্যাবধি আমলা মহলে মান্য। অতীতে মুসলিম নাম ও খেতাব ধারণ করে, এতদাঞ্চলীয় চাকমা সর্দারেরা স্বসমাজ ও সম্প্রদায়ের কর্তা হিসাবেও স্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু আজকাল সে স্বীকৃতির অবসান ঘটেছে। যদ্দরুণ মুসলিম নাম ও খেতাব, স্থানীয় চাকমা সমাজ থেকে এখন বিলুপ্তই বলা যায়।

এটা অনস্বীকার্য যে, উদার ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজা ভুবন মোহন রায়, স্বীয় দুই পুত্রকে দুই বিদুষী ও কুলিন হিন্দু মহিলার সাথে বিবাহে আবদ্ধ করে, অনুন্নত আর অবহেলিত চাকমা সমাজকে কৌলিন্য দান করেছিলেন। সেই সূত্রেই চাকমা সমাজে শিক্ষা সংস্কৃতি আর উন্নত জীবনচর্চার সূত্রপাত হয়; এবং স্থানীয় মঙ্গোলীয় রক্তের সাথে আর্য্য রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে।

ঐ আর্য্য রক্তের সংমিশ্রণের ধারায় নতুন এক অভিজাত প্রজন্মের উদ্ভব ঘটেছে। ঐ কৌলিন্যের ধারাকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে আরো অনেক বিজাতীয় মহিলার আগমনে ঐ সমাজ বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে, যাদের মাঝে চতুর্থ উল্লেখযোগ্য

হিন্দু মহিলা হলেন মিসেস সুদীপ্তাদে ওরফে দেওয়ান। অনেকের মাঝে বিশেভাবে এই মহিলা তার রাজনৈতিক অবদানের গুণেই আজ স্মরণীয়। সংসদীয় রাজনীতির শুরুকাল থেকে, এই পর্বতাঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী, বাবু কামিনী কুমার দেওয়ান, রাজা ত্রিদিব রায়, রাজা মংশোয়ে প্রু চৌধুরী, অংশোয়ে প্রু চৌধুরী, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, চাই থোয়াই রোয়াজা, উপেন্দ্রলাল চাকমা ও বিনয় কুমার দেওয়ানের সম্মিলিত রাজনৈতিক অবদানের তুলনায় বাংলাদেশ আমলের প্রথম মহিলা সংসদ সদস্যা মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ানের অবদান বেশী। এতদাঞ্চলের মঙ্গোলীয় সমাজ তার কাছে ঋণী। একমাত্র তারই একক তৎপরতা ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোটা ও অগ্রাধিকারের সরকারী ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। যদ্দরুণ উক্ত সমাজে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের হার সারা বাংলাদেশে এখন সর্বাধিক। বিদ্রোহ, অশান্তি ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক চমক মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ানের উপর টেক্কা দিলেও, গঠনমূলক রাজনৈতিক সাফল্য, এই হিন্দু মহিলার সর্বাধিক। তাই উপজাতীয় সমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে, আরো অধিক বাঙ্গালী নারী পুরুষের সমাবেশ ঘটা ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী, এ দাবী করা অযৌক্তিক নয়।

একদা চাকমা সমাজ, অধিক কৌলিন্যের অহমিকায় সহযোগী অন্যান্য মঙ্গোলীয় সম্প্রদায়গুলো থেকে রক্ত সম্পর্ক বাঁচাতে সচেষ্ট থাকতো। নেহাত্ বাধ্য হওয়া ছাড়া ত্রিপুরা ও মগদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রচিত হতো না। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলো তো এক্ষেত্রে অদ্যাবধি অপাংক্তেয় গণ্য।

ত্রিপুরাদের সাথে চাকমাদের অতীতে কখনো সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা যায় না। তবে সারা অতীত জুড়ে মগ সম্প্রদায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বৈরী। তাই এতদোভয়ের মাঝে স্বাভাবিক আত্মীয়তা রচনা সহজ ছিলো না। বিংশ শতাব্দীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বাঙ্গালীদের মোকাবেলার প্রয়োজনে সমুদয় উপজাতীয় সমাজের ঐক্য আর সহযোগিতা কাম্য হওয়ায়, তারা পারস্পরিক ঐক্য ও সৌহার্দ্য রচনায় উৎসাহী হোন এবং তা থেকেই অধুনা আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের বিধি-নিষেধ অনেকখানি শিথিল। এখন আর মগ ত্রিপুরা ও চাকমাতে আত্মীয়তা সামাজিকভাবে বর্জ্য নয়। তবে এখনো অন্যান্য অনুন্নত ছোট-সম্প্রদায়গুলো তাদের সমান কৌলিন্যে উন্নীত হতে পারেনি। তাই তাদের সাথে বর্ণিত তিন প্রধান সম্প্রদায়ের পাত্রপাত্রী আদান প্রদান প্রায় বিরল। সামাজিক ক্ষেত্রে ছোট সম্প্রদায়গুলো বড়দের কাছে এখনো তুচ্ছ।

তিন প্রধান সম্প্রদায়ের সমাজপতি তিন রাজগোষ্ঠীতে পাত্র-পাত্রী আদান প্রদানের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রপাত হিসাবে বিংশ শতব্দীতে মাং রাজ দুহিতা হানুমা চৌধুরীরাণী ওরফে কিরণশশীর সাথে বোমাং রাজবংশীয় কংলা চাই চৌধুরীর বিবাহ এবং তাদের পুত্র মং প্রুসাঁই চৌধুরীর সাথে চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায়ের দূহিতা,

নীহার বালা দেবীর বিবাহ এবং বোমাং রাজা মংশোয়ে প্রু চৌধুরীর চাকমা অনুত্তরা দেওয়ানের সাথে বিবাহকে উল্লেখ্য বলা যায়। সে থেকেই এই তিন রাজ সম্প্রদায়ে আত্মীয়তা রচনার অচলায়তন ভেঙ্গেছে এবং আজকাল ছোট-বড় নির্বিশেষে আন্ত-মঙ্গোলীয় আর অমঙ্গোলীয় সাম্প্রদায়িক মিশ্র বিবাহ প্রায় প্রচলিত। এই মিশ্র সামাজিকতার গুণে, মিশ্র প্রজন্মের উদ্ভব হচ্ছে। এতেই জন্ম নিচ্ছে নতুন এক সংকর মঙ্গোলীয় সমাজ। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এখন তারা কোন বিশুদ্ধ মানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর্য্য, অনার্য্য, মঙ্গোলীয় আর মিশ্র জাতের লোকেরা পরস্পরকে রক্ত মাংসে গ্রহণ করছে। কারো মাঝেই এখন আর আদি শ্রেণীগত বিশুদ্ধতা রক্ষিত নেই। তবে অনুন্নত বিচ্ছিন্ন পার্বত্য বা বন্য উপজাতি সমাজের লোকজনই শ্রণীগত বিশুদ্ধতার পরিমাপে এখনো অধিক উত্তীর্ণ। গহীন অরণ্য আর দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতে, সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জুমিয়া লোকজনই বিশুদ্ধ উপজাতীয় চরিত্র ধারণ করে আছে। টটেম বিশ্বাস ও টাবুর মান্যতা তাদের মাঝেই পাওয়া সম্ভব এবং একমাত্র তারাই উপজাতি পদবাচ্য হওয়ার যোগ্য। জাত্যাভিমানী সুসভ্যরা খাটি উপজাতি নয়। বিশেষতঃ রাজরক্তের দাবিদার চাকমা মগ ও ত্রিপুরারা, ইতিহাস খ্যাত সভ্য সমাজের লোক। এদের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও আদিম উপজাতি হওয়া যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

১৭। জাতি, উপজাতি আর অউপজাতি সংজ্ঞা।

এখানে জনৈক পন্ডিতের বক্তব্য প্রথমেই দ্রষ্টব্য

ক) উপজাতিদের আদিম সমাজের মানুষ হিসেবেই গণ্য করে গবেষণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের এই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছি। (সূত্রঃ প্রফেসার পিয়ের বেসানেতঃ ট্রাইবস্‌ম্যান অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টসঃ মুখবন্ধ, শেষ প্যারা।)

খ) যদি আদিম অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ভাবধারা বহন করে আজো যারা টিকে আছে তাদের বুঝায়, তবে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের আধিবাসীদেরকে আদিম বলে বর্ণনা করা সত্যের অপলাপ হবে।ঃ (সূত্রঃ অধ্যাপক পিয়ের বেসানেত, ট্রাইবসম্যান অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাকট্‌স, প্রথম পরিচ্ছেদ প্রথম প্যারা।)

আমরা যাদের উপজাতি বলি, পাহাড়, সমতলবাসী সে চাকমা, মারমা, লুসাই, ত্রিপুরা কুকি খুমি ইত্যাদি ভিন্ন রং ও চেহারার লোকজন সম্পর্কে এখনো আমাদের মাঝে সীমাহীন অজ্ঞতা বিদ্যমান। যা জানি তাও নির্ভুল নয়। তাই সাধারণ অজ্ঞ মানুষতো বটেই, অনেক পন্ডিত আর নীতি নির্ধারকরা ও বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। একবারও আমরা তলিয়ে দেখিনা, তাদের উপজাতি আখ্যা কি সঠিক? তাদের পরিচয়সূচক কথা ও কাহিনীগুলো কি প্রকৃতই ইতিহাস? মাঝে মধ্যে পক্ষে বিপক্ষে উষ্ণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তার মীমাংসা হয় না। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই ফেলে রাখারও অবকাশ নেই।

ভেবে দেখা অবশ্যই দরকার যে, যাদের আমরা উপজাতি বলি, তারা তত্ত্ব কথা বাদে আভিধানিক অর্থে কোন্ মূল জাতির উপজাতি বা শাখা জাতি কিনা? বৃটিশ আমল থেকে এ যাবৎ আমাদের তিনবার জাতীয়তার বদল হয়েছে, কিন্তু ওরা আগেও ছিল উপজাতি, আর এখনও তাই আছে। তাত্ত্বিক অর্থে উপজাতি হলে মানতে হবে এরা সভ্যতার আচার আচরণে অনব্যস্ত এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত পশ্চাদপদ আদিম লোক, যারা টুটেমে বিশ্বাস করে ও টাবু মানে। কিন্তু এরা আদতে তাও নয়। তবে এরা মানব শাখাভিত্তিক ক্ষুদ্র পাহাড়ী সংখ্যালঘু অর্থে উপজাতি মান্য।

কেবল শারীরিক রং গঠন ছাড়া এখানে বাংগালী অবাংগালীতে পারস্পরিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য নয়। পাহাড় ও সমতলের আবাস, ভাষার ভিন্নতা, আচার-আচরণের পৃথক স্বকীয়তা ইত্যাদি, জাতি আর উপজাতি হওয়ার সুত্র নয়। বাংগালীরা বাংলায় কথা বলে, অবাঙ্গালীদের অনেকের ভাষাও তাই। শুধু পার্থক্য হলো আঞ্চলিক কথন রীতিতে। একাধিক ভাষাভাষী একক জাতির অস্তিত্ব দুনিয়ায় ভুরি ভুরি। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান বাংগালীরা, আরবী ফার্সি, তুর্কি, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত ও লাটিনে নাম নাখে। চাকমা সমাজে তো বটেই, অন্যান্য সম্প্রদায়ে ও তার প্রচলন আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান বাংগালীরা যে ধর্মাদি পালন করে, তথাকথিত উপজাতীয় সমাজেও তাই পালিত হয়। উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো কতিপয় সংস্কার সংস্কৃতি রং ও চেহারায়। এটা জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত হওয়ার গ্রহণীয় কারণ নয়। বড় জোর তজ্জন্য পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করা যায়, যা তাদের আছে। সুতরাং বাংগালীদের মত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা লুসাই ইত্যাদি জনগোষ্ঠী পৃথক পৃথক সম্প্রদায় মাত্র, তাত্ত্বিক জাতি বা উজপাতি নয়। এরা সবাই মিলেই একক অভিন্ন বাংলাদেশী জাতিসত্তা । এই জাতিসত্তার শাখা অর্থে এরা উপজাতি আখ্যায়িত হতে পারে।

চাকমাসহ বিভিন্ন অবাংগালী সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশী জাতির শাখা অথবা ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী অর্থে উপজাতি বলে পরিচয় জ্ঞাপন করা হলে, তা মেনে নেয়া যায়। তবে শুধু শারীরিক রং ও গঠনের পার্থক্যের গুণে ঢালাওভাবে পারিভাষিক অর্থে তাদের উপজাতি বলা সঠিক নয়। মঙ্গোলীয় চেহারা আর শারীরিক গঠন, উপজাতি হওয়ার সুত্র নয়। সভ্যতার গুণাবলী সম্পন্ন কেউই তাত্ত্বিক উপজাতি নয়। আমাদের অবাংগালী সংখ্যা লঘুরা সভ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ পুর্ণ সভ্য লোক। তারা অনুন্নত হলেও আদিম নয়। তারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক নামে নতুবা শাব্দিক অর্থে বাংলাদেশী জাতির শাখা অথবা ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠী অর্থে উপজাতি আখ্যায়িত হতে পারে। তাত্ত্বিক পরিভাষাভুক্ত আদিম অসভ্য অর্থে তারা উপজাতি পদবাচ্য নয়। সভ্যতার বাহন ভাষার বিচারেও চাকমারা বাংলা ভাষাভাষী, যে ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক কথন রীতিতে, বাংগালীরা ও কথা বলে। ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও পূজাপার্বণ পালনে বাংগালী ও অবাঙ্গালী অভিন্ন। নামকরণ, আচার

অনুষ্ঠান ও লৌকিকতার প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংগালীদের সাথে তাদের তফাৎ কমই লক্ষ্যণীয়। সাজ পোশাকে সামান্য স্বকীয়তা থাকলেও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে তার ব্যবহার প্রায় সমান। উভয়ের মাঝে যে তফাতটি মৌলিক তা হলো পৃথক ভাষা রং ও গঠন। অদিকাংশ অবাঙ্গালী শারীরিক গঠনে, মিশ্র মঙ্গোলীয় আর বাংগালীরা আর্য্য-মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়ী-সংকর। আন্তঃবিবাহজাত সংমিশ্রণের ফলে এখন অনেক ক্ষেত্রে, অবাঙ্গালীও বাংগালীতে তফাৎ প্রায় বিলীয়মান। পাহাড় ও সমতলের বসবাসে উভয়ই অভ্যস্ত ও পরস্পরের প্রতিবেশী। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন চর্চার প্রতিটি বিষয়ে উভয়ই সমান মানের অধিকারী। পশ্চাদপদতা আর আদিমতার কিছু অবশেষ উভয়ের মাঝেই বিদ্যমান। উপজাতিদের বিপরীতে স্থানীয় বাংগালীদের অউপজাতি বলাও ভুল। কোটি কোটি সংখ্যক বাংগালীর বিপরীতে অবাঙ্গালীরা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। বাংলাদেশী বাংগালীদের সামগ্রিক সংখ্যায় তুলনায় সারাদেশবাসী অবাংগালীদের সংখ্যা ১% এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী অবাংগালীদের সংখ্যা তার অর্ধেক ভগ্নাংশ মাত্র। এই পার্বত্য বাঙ্গালীরা পৃথক সমাজ নয়। ক্ষুদ্র সংখ্যক জনগোষ্ঠীর সাথে বাংগালীরা তুলনীয় নয়। তাই তাদের বে-নামে উল্লেখ করা অযৌক্তিক। ক্ষুদ্র হিসাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর পক্ষে বৃহৎ সম্প্রদায় বাংগালীদের মোকাবেলায় সামগ্রিকভাবে অবাংগালী আখ্যায়িত হওয়াই উচিত। ব্যাকরণের নিয়ম নীতিতেও বটে, উপজাতি শব্দের বিপরীত শব্দ অউপজাতি নয়। শব্দটি স্বরবর্ণে আরম্ভ হলে তার আগে 'অ' নয় অন যুক্ত হয়। তখন স্বরবর্ণ স্বরচিহ্নে রূপান্তরিত হবে এবং বিপরীত অর্থ জ্ঞাপন করবে। নেতিবাচক বিপরীত শব্দ গঠনের এটাই নিয়ম। এই নিয়মে উপকারীর বিপরীত শব্দ অনুপকারী, উপযোগীর বিপরীত শব্দ অনুপযোগী ইত্যাদি। সুতরাং উপজাতির বিপরীত শব্দে অউপজাতি বলা অশুদ্ধ এবং অপ্রাঞ্জল। বিজ্ঞান ও সংসদীয় আইনের ভাষায় অনুরূপ অনুপযোগী, সংজ্ঞার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়। পন্ডিত সমাজের অনুরূপ গুরুতর ভুলকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। স্থানীয় পরিষদ আইনে এই ভুল সংজ্ঞাগুলোর ভুল ব্যবহার অত্যন্ত দুঃখজনক। পার্বত্য চুক্তি আর জেলা পরিষদ আইনে উপজাতি সংজ্ঞাটি গৃহীত। কিন্তু আজ কাল তাকে এড়িয়ে বিকল্প সংজ্ঞা আদিবাসী ব্যবহৃত হচ্ছে, যা বাহ্যতঃ স্ববিরোধীতা।

১৮। জুম জুমিয়া ও জুম্ম ল্যান্ড।

১৯০০ সালের রেজুলেশন নং ১ এর অধীন রচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫২ নং ধারাগুলোতে সর্দার, হেডম্যান, সার্কেল, মৌজা, পাহাড়ী, উপজাতি, আদিবাসী জুম ও জুমিয়া সংক্রান্ত আইন ও নীতি নির্দেশ বিধিবদ্ধ আছে। তার আগে জুম চাষ, জমি বন্দোবস্তি ও জুম প্রশাসনের পক্ষে কোন বিধিবদ্ধ আইন বা নীতি নির্দেশ চালু ছিলো না। তিন উপজাতীয় রাজার সর্দারী মর্যাদা, দায়-দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা, মৌজা প্রধান হেডম্যানদের নিযুক্তি, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা এবং জুমিয়াদের মানগত স্বীকৃতির

এটা প্রথম বিধিবদ্ধ সরকারী আইন। মোগল প্রশাসনের আওতায় জুম নোয়াবাদের নামে এক প্রকার অস্থায়ী বন্দোবস্তি প্রচলিত ছিলো বলে, সে আমলের রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কোন বিবরণে উল্লেখিত আছে। ঐ সুত্রে এতদাঞ্চলকে বলা হতো জুমবঙ্গ। তার বিকল্প নাম ছিল কাপাস মহাল। জুমিয়ারা নির্দিষ্ট পরিমান কর বা কার্পাস তুলা প্রদানের অঙ্গীকারে খাস পাহাড়াঞ্চলে জুম চাষ করতো। জুমিয়া পরিবারগুলোর পক্ষে তাদের সর্দারেরা অস্থায়ী ভিত্তিতে তজ্জন্য জিম্মাদার হতেন। এর ব্যতিক্রম হিসাবে অনেক সময় সরকারের পক্ষে জুমকর নগদে বা তুলার আকারে সংগ্রহের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হতেন। মোগল আমলের ঐ জুম নোয়াবাদ ব্যবস্থাই ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার অক্ষুণ্ন রাখেন। প্রকৃতপক্ষে তা ভূমি স্বত্বহীন ভ্রাম্যমান আদিম চাষ ব্যবস্থা। আসলে এখনকার মত অতীতেও ভূমি স্বত্ব লাভের পক্ষে বন্দোবস্তি গ্রহণ জরুরী ছিলো। ভারতীয় উপমহাদেশে চিরকালই মূলভূমি মালিক সরকার। বন্দোবস্তিহীন দখলীয় স্থায়ী মালিকানা ব্যবস্থা এদেশে কোনদিনই প্রচলিত ছিলো না।

জুমকর বা জুম খাজনা ভূমিরাজস্ব নয়। তা জুমিয়াদের পরিবার পিছু প্রদেয় কর মাত্র। তারা কোন জুম ভূমি নির্দিষ্ট আকারে স্থায়ীভাবে ভোগদখলও করে না। প্রতি জুম মৌসুমে নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বন্দোবস্তি বা স্থায়ী দখলের ভিত্তিতে কোনভাবেই তাদের ভূমি'ত্ব গড়ে ওঠেনি। আরাকানের রোসাং থেকে আগত চাকমা প্রধান শের মস্ত খাঁই উপজাতিদের মাঝে প্রথম ব্যক্তি, যিনি ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুল কদর খাঁ কর্তৃক দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার কোদালা উপত্যকায় কিছু খাস পাহাড়ী জমি বন্দোবস্তি ও পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুমকর সংগ্রহের তহসিলদারী লাভ করেন। এতদাঞ্চলে তদীয় পারিবারিক ও চাকমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার এটাই ভিত্তি। যেহেতু চাকমারা অভ্যাসগতভাবে জুম চাষী এবং অন্যান্য উপজাতিগুলোও তা-ই, সেহেতু সরকারী চেষ্টা ও সদিচ্ছা থাকা সত্বেও, তারা জমি বন্দোবস্তি গ্রহণ করে স্থায়ী চাষী ও ভূম্যাধিকারীতে পরিণত হয়নি। সর্দার ও হেডম্যানরাও জুমকরের ভাগ রক্ষায় পাহাড়ী প্রজাদের জুমিয়া করে রেখেছেন। তহসিলদারীর অর্থ জমিদারী নয়। জুম তহসিলদারীর সাথে ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত নয়।

জুমতন্ত্র নির্দিষ্ট দেশ ও জাতির সীমানা মান্য করে চলে না। তার ক্ষেত্র হলো অবাধ আর অনিয়ন্ত্রিত বন পাহাড়ের অরাজক পরিবেশ। সীমান্ত আর জাতীয় বাধা নিষেধে তা আবদ্ধ নয়। নাগরিকত্বের বিধি নিষেধ পালনে জুমিয়ারা অনভ্যস্ত। জুমকে অনুসরন করে তারা সহজেই সীমান্ত পাড়ি দেয়। তারা মুখ্যতঃ সর্দার নিয়ন্ত্রিত লোক। তাদের উভয়ের সম্পর্ক রাজ্যহীন রাজা ও প্রজার।

প্রকৃত পক্ষে জুমিয়া জীবন বড় করুণ। আধুনিক জীবন চর্চার কিছুই তাতে নেই। অভাবী, অপগন্ড স্বাস্থ্যহীন, নিরক্ষর, ক্ষুৎপীপাসা কাতর ও যাযাবর এক শ্রেণীর

পাহাড়ী চাষী হলো জুমিয়ারা। বাংলাদেশের নদী-নালার নৌকাবাসী, এক শ্রেণীর লোক, যারা কোন জায়গা জমির মালিক নয়, সাপ ধরা, সাপের খেলা দেখান, সিঙ্গা দেওয়া, চুড়ি পুঁতি ফেরী করে বিক্রি করা ইত্যাদি ইতর কাজের রোজগারে যারা নিত্য আনে নিত্য খায়, সেই যাযাবর শ্রেণীর বেদে সমাজের মত, দ্বিতীয় যাযাবর শ্রেণীর লোক হলো জুমিয়ারা। তফাৎ শুধু এই যে, জুমিয়ারা স্থলাশ্রয়ী কৃষিজীবী। জমি ভোগ করে বটে, তবে সংশ্লিষ্ট জমির মালিক হয় না, এবং বেদেরা জলাশ্রয়ী ফেরীওয়ালা। তাদেরও কোন জমি নেই।

নিরিবিলি নির্জন পাহাড় চূড়ায় বা ঢালে, বিচ্ছিন্ন একটি ছোট্ট মাচাঘর, যা বাঁশ বেত ও ছনের তৈরী, তাতে স্বামী-স্ত্রী বাদে দু'চারটি নাবালক ছেলে-মেয়ে, দু'একটি মোরগ-মুরগী ও কখনো একটি কুকুর সঙ্গী মাত্র থাকে। গৃহস্থালী সাজ সরঞ্জাম বলতে দু'চারটি এলোমনিয়ামের হাড়ি পাতিল ও থালা, মাটির কলসী গজি ও কত্তি নামীয় চুরাই, দু'চারখানা শীত নিবারনী মোটা কাপড় ও চাদর, এসবই স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের ঝুড়িতে এক যাত্রায় বহনযোগ্য। পরিধান হিসাবে পুরুষের নেংটি বা গামছা ও ফতুয়া, আর স্ত্রী লোকের নিম্নাঙ্গে পেচিয়ে পরার যোগ্য পিনন বা লুঙ্গি, ফতুয়া বা ব্লাউজ, বুক কাপড় ও পাগড়ি এবং স্বচ্ছলদের অলংকার হিসাবে পুঁতির মালা রুপার খাড় , হাচুলী ও বাজুবন্দ ইদ্যাতি। ছেলে-মেয়েরা তো অধিকাংশ নেংটাই থাকে। খাবার হিসাবে জুমে উৎপন্ন চাল তরিতরকারী এবং জংলী শাক-সবজি ও আলু, যার সাথে কদাকিত যুক্ত হয় সুটকি বা নাপ্পি, যা বহু চড়াই উৎরাই, হাটা ও নৌ যাত্রার মাধ্যমে দুরবর্তী বাজার থেকে সংগৃহীত হয়। মাছ মাংস এদের ভাগ্যে খুব কমই জুটে। উৎসব আনন্দ, শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবেশ থেকে মুক্ত জংলী জীবন। রাত ঘনাবার আগেই খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে, গল্প গুজব গুণগুনাণী ও ঘুমিয়ে পড়া। কদাচিত দুরবর্তী জুমবাসী কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধা বা যুবক-যুবতীর সাথে দেখা হয়। সারা দিনরাত পোকা মশা আর জোঁকের উৎপাত। অভাবে অসুবিধায় বনের গাছ বাঁশ লতাপাড়া সংগ্রহ আর বিক্রি এবং জংলী লতাপাতা ও আলু ভক্ষণ, এই হলো জুমিয়া জীবন।

জমির মালিকানা জন্ম মাটির সাথে নাগরিকদের প্রেমাবদ্ধ করে। জুম ব্যবস্থায় সে সুযোগ অনুপস্থিত। নির্দিষ্ট একখন্ড ভূমির মালিকানা ছাড়া নাগরিক দায়িত্ববোধ ও অধিকার গড়ে ওঠে না। বসবাসের স্থায়িত্ব, ভূমি মালিকানার সাথে সম্পর্কিত। এটা ছাড়া স্থানীয় বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার দাবী অবান্তর।

জুম ব্যবস্থা প্রকৃতি ও পরিবেশের পক্ষে ধ্বংসাত্মক তো বটেই, জুমিয়ারা ও তাতে যাযাবর জীবন-যাপনে বাধ্য থাকে। শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, সামাজিকতা, উন্নত আসবাব, আবাসন, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাগুলো গহীন বন ও দুর্গম পাহাড়ের জুমে নাগালাধীন ও সহগামী হয় না। ফলে জুমিয়ারা অশিক্ষিত অভাবী বন্য ও ক্ষুৎসীপাসা-কাতর থাকে। জুম ব্যবস্থাও জুমিয়া পরিচিতি,

আদিমতায় আবদ্ধ। তাতে গর্বিত হওয়ার কিছুই নেই। কিছু অপরিহার্য মোটা কাপড় আর বাঁশ বেতের সাধারণ ঝুড়ি ব্যতীত, যাবতীয় শিল্প কর্মে তাদের আজও অজ্ঞ থাকার এটাই প্রধান কারণ। জুমিয়া জীবনের অপরিহার্য্য প্রধান অস্ত্র দা ও কুড়াল এবং গৃহস্থালী হাড়ি পাতিলের জন্য পর্যন্ত তারা পরনির্ভর। অবশ্য তাদের আড়ম্বর হীন ও মুক্ত জীবনধারায় এক ধরনের আকর্ষণ ও মোহ থাকা স্বাভাবিক। যে আধুনিকরা গর্বের সাথে নিজেদের জুমিয়া পরিচয় দেন, প্রকৃতপক্ষে জুম করা ও জুমিয়া হওয়া তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। এটা তাদের অতীত ঐতিহ্য হলেও, আধুনিক পরিচয়ের সুত্র হওয়ার অযোগ্য। উন্নত জীবন ও আধুনিক চাহিদা জুমের দ্বারা পূরণ সম্ভব নয়। এটা এক আদিম অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা। সেহেতু জুমিয়া পরিচয় যুগোপযোগী নয়।

আজকাল তথাকথিত উপজাতিদের উচ্চাভিলাষী কেউ কেউ নিজেদেরকে জুমিয়া জাতি বা জুম্মজাতি আখ্যায় ভূষিত করছেন। পাহাড় জংগলের অধিবাসী সমাজে প্রচলিত জুম পেশা আজকাল প্রায় বিলীয়মান। এটা গৌরবজনক পরিচয় সুত্র নয়। তদুপরি কোন একক স্বাধীন দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিত্বের সহাবস্তান অসম্ভব।

সুতরাং বাংলাদেশে জুমিয়া জাতিত্বের চর্চা ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান, একক জাতিত্ব ও দেশপ্রেমের পরিপন্থী। প্রাকৃতিক বিচারেও জুম অত্যন্ত ক্ষতিকর পেশা। পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সবুজ আচ্ছাদন তদ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বন্য পশুপাখী তদ্বারা আশ্রয়হীন ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। বনজ সম্পদ দায়ের কুপ কুঠারাঘাত ও আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। মাটিতে ক্ষয় ধরে ও তার উর্বরতা হ্রাস পায়। প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রয়োজনীয় ভারসাম্যতা হারিয়ে জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। বনের অভাবে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। উর্বর জুম ভূমির আকর্ষণে যাযাবর জুমিয়ারা অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম অরক্ষিত সীমান্তের দুধারে পারাপার করে, যদ্দরুণ তারা হয়ে পড়ে দেশহীন বা দেশ মুক্ত নাগরিক। স্বদেশে বিদেশে কথাও তাদের জুমিয়া জীবন ও জুমের পেশা স্থিতিশীল হয় না। ভূমি বন্দোবস্তি ও মালিকানা জুম ব্যবস্থার সাথে জড়িত নয়। খাস পাহাড়ী বনাঞ্চলই তার অবাধ চর্চা ক্ষেত্র। ১৮৭৫ খৃঃ সাল পর্যন্ত এতদাঞ্চলের ভূমি রাজস্ব খাতে কোন খাজনা উশোলের উল্লেখ নেই। এর অর্থ তখনো এতদাঞ্চলের কারোরই ভূমি মালিকানা ছিলো না। জুমকর ভূমি রাজস্ব নয়। তা মূলতঃ ক্যাপিটেশন টেক্স যা জুমিয়া পরিবার পিছু ধার্য্যকৃত কর, যা এতদাঞ্চলের উপজাতিদের উপর প্রযোজ্য। বন্দোবস্তির দ্বারা ভূমি মালিকানা বা স্বত্ব লাভের ব্যবস্থা অতীতে এতদাঞ্চলে বিরল ছিলো। তখনো হাল কৃষিতে জুমিয়া সমাজ অভ্যস্ত হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে জুম চাষ ও স্থানান্তর গ্রহণ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা হিসাবে, হেডম্যান বা মৌজা প্রধান কর্তৃক ভূমি দখল দান, প্রথম তিন বছরের জন্য খাজনা রেয়াত, সহজে কৃষি ঋণ প্রদান, বাঙ্গালীদের দ্বারা জমি আবাদকরণ ও কৃষি প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি সরকারী উদ্যোগ গৃহীত হয়। ফলে জুমিয়া ও অভিজাতদের অনেকে ভূমি বন্দোবস্তি ও হাল

কৃষি গ্রহণ করেন। তবুও জুম পেশার উচ্ছেদ হয়নি। জুমকরের বৃহদাংশ এবং কিছু বাড়তি পাওনার লোভে রাজা ও হ্যাডম্যানদের উৎসাহে আর স্বার্থেই তা চর্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

জুম পেশা ও জুমিয়া হওয়ার মাঝেই কার্যতঃ এই সমাজের ভূমি মালিকানা ও আদিবাস অস্বীকৃত। পার্বত্য অবাঙ্গালীরা সংখ্যায় কম হলেও বাংলাদেশ তাদের জন্ম ভূমি। ভূমি মালিকানা ও জন্ম সুত্রেই বাংগালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের আদিবাসিন্দা ভূমি সন্তান এরা বহির্দেশীয় লোক নয়। চাকমা, মগ, খিয়াং, খুমি ইত্যাদি সংখ্যালঘুরা নিজেদের কথা কাহিনীতেই বিদেশাগত বলে স্বীকৃত। রাজারা মূলতঃ একেক দল সংখ্যালঘু জুমিয়ার দলপতি। তাঁরা কোন রাজ্যের অধিপতি বা জমিদার নন। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারাই তারা রাজা খেতাবে সম্বোধিত। সরকারের কাছে তারা জুমকর সরবরাহকার। এরা জুম তহসিলদারীর পারিশ্রমিক হিসাবে মাসোহারাভোগী ও তদোতিরিক্ত জুম করের ভাগীদার ও বটে।

১৯। কিছু কথা কিছু প্রশ্ন।

সুত্র ঃ জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে রাজা দেবাশীষ রায় কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ, তাং ২রা জুন ১৯৯৫।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা কাহিনী নিয়ে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি প্রচুর। যারা লেখেন ও মতামত ব্যক্ত করেন তাদের অনেকের মাঝে কষ্টকর তথ্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা বিরল। অনেকের মাঝে কষ্টকর তথ্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা নেই। রেডিমেড কিছু মনকাড়া বক্তব্যই তাদের প্রতিপাদ্য। আমিও এক কালে এখানকার আজগৌবী কথা কাহিনীতে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু প্রচুর পড়া শোনা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এখন সন্দেহাতীত ভাবে জানতে পেরেছি যে, এখানকার উপজাতিদের পরিচয় সংক্রান্ত কথা কাহিনীর বৃহদাংশই অতিরঞ্জিত। প্রচারিত গল্প আর ধারণার বাহিরেও কথা আছে। রং গঠন পরিবেশ ও জীবন-যাপনের পৃথক এক চমৎকারিত্বই প্রাথমিকভাবে আমাদের আচ্ছন্ন করে দেয়, যদ্দরুণ আমরা এতদাঞ্চল ও তার উপজাতীয় অধিবাসীদের সম্বন্ধে ভাবালু হয়ে পড়ি। একটানা দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ ও বসবাস না করা পর্যন্ত, সে ভাবালুতা কাটে না। অন্য অনেকের মত এ ধারণা আমার ও বদ্ধমূল ছিলো যে, এতদাঞ্চল মূলতঃই উপজাতীয় আদি বসবাস অঞ্চল, এবং এখানকার কথিত রাজারা প্রকৃতই বংশানুক্রমিক রাজ্যাধিপতি। এখানে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন মানে মানব আগ্রাসন। কিন্তু ক্রমে আমার এ ধারণায় ফাটল ধরেছে।

তথ্যানুসন্ধ্যানী ইতিহাস পাঠকদের এ কথা জানা সম্ভব যে বৃটিশদের হাতে সাবেক ভারতের মোটামুটি ৫৬৫টি দেশীর রাজ্যের পতন ঘটে। তাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রশ্নে চুক্তিপত্র, সনদ অঙ্গিকারপত্র ইত্যাদি প্রদত্ত হয়। ঐ দেশীয় রাজ্য সমূহের তালিকায় নিকটবর্তী অঞ্চলের ত্রিপুরাও ছিলো। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলভুক্ত কোন

দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব তাতে স্বীকৃত নয়। তবু বিস্ময়কর হলো ঃ এতদাঞ্চলে তিনটি রাজ পরিবার আছে। তাদের দীর্ঘ রাজত্ব আর রাজকীয় ঐতিহ্যের কথাও শোনা যায়। এই সুত্রে চাকমা প্রধান মাননীয় দেবাশীষ রায় ৪৮তম চাকমা রাজা। এভাবে মাং ও বোমাং বংশীয় অপর দু দল রাজাও আছেন। এরা খান্দানী সম্মানিত ব্যক্তি। তারা সবার কাছে নমস্য। কিন্তু এখানে রাজনীতি, ও ইতিহাসের প্রশ্ন জড়িত। তাই এই রাজ তথ্যের মূল তালাস করা ছাড়া উপায় নেই। এখানে প্রথম প্রশ্ন হলো ঃ তাদের কেউ কি আদিতে এতদাঞ্চলের কোথাও কোন স্বাধীন রাজ্য বা রাজত্বের অধিকারী ছিলেন, না তারা উপাধিপ্রাপ্ত সামন্ত রাজা? তাদের এই উপাধিটির সুত্র কী? ১৯০০/১ রেগুলেশন ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ধারা নং ৩৫/৩৮/৩৯/৪০/৪৮ ইত্যাদিতে বর্ণিত ক্ষমতা মর্যাদা ও উপাধির তালিকায় এই রাজা উপাধিগুলোর স্বীকৃতি নেই। তবে এর একটা ক্ষীণ আভাস নিম্নোক্ত চিঠিতে ব্যক্ত আছে যথা ঃ

"The Rajas of the Chittagong Hill Tracts were originally appointed by the suffrage of the Jhoomias Kukces and other inhabitants, and not by the sovcreign of the country as usual.

Ref : Revinue letter no 1499 dated 10th 1866.

বাংলা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাগণ, দেশের কোন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত স্বাভাবিক রাজা নন, তারা মূলত ঃ সাধারণ জুমিয়া কুকিও অন্যান্য অধিবাসীদের দ্বারা মান্য রাজা। সুত্র ঃ রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬।

এখন আপত্তির বিষয় হলো ঃ এই রাজা উপাধির অবাধ ব্যবহারের আড়ালে, এ সাধারণ ধারণাটি লোক্কায়িত আছে যে, এতদাঞ্চল আদতে এক প্রাচীন উপজাতীয় রাজ্য এবং বাঙ্গালীরা এখানে হালের বহিরাগত আগ্রাসী লোক। ঠিক এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে, রাজা বাবু দেবাশীস রায়ের উপরোক্ত সেমিনারের বাক্তব্যে যথা ঃ

The hilly regeon of the Chittagong Hill Tracts in south eastern Bangladesh is the ancestral home of numerous indigenous people.

বাংলা ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো, বহু সংখ্যক আদিবাসী লোকের প্রাচীন পৈতৃক স্বদেশ। (সুত্র ঃ ঐ সেমিনার পত্র)।

এই বক্তব্যে বাঙ্গালী আদিবাস ও বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক অখন্ডতার স্বীকৃতি নেই। এখন দেখা দরকার উপরোক্ত বক্তব্যের তথ্য নির্ভরতা কতটুকু। বাস্তবে এখনকার পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো মূল চট্টগ্রামেরই পর্বতময় পূর্বাঞ্চল, যা প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৮৬০ খ্রীঃ সনে পৃথক করা হয়েছে। পৃথক হওয়ার আগে স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীরা প্রতিবেশী সংখ্যালঘু রূপে পরিচিত ছিলো। আর এখনো এতদাঞ্চল পার্বত্য বিশেষণসহ

চট্টগ্রাম নামেই আখ্যাযিত হয়। পেশাগতভাবে চিরকালই উপজাতিরা জুমচাষী, তাই তারা পাহাড়াশ্রয়ী, আর বাঙ্গালীরা লাঙ্গল চাষী তাই তারা সমতলবাসী। এই মৌলিক পেশাগত পৃথক অবস্থানের অর্থ উভয়ের মাঝে অঞ্চল বা দেশ ভাগ নয়। তাই কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙ্গালী বর্জিত উপজাতীয় অঞ্চল, আর চট্টগ্রাম উপজাতি বর্জিত বাঙ্গালী অঞ্চলের পরিণতি লাভ করেনি। এই অর্থে বিভক্তি ও ঘটেনি। আগের আদম শুমারী গুলো পরীক্ষা করে দেখা যায়। সংখ্যা ও তার অস্বাভাবিক হ্রাস বৃদ্ধি সত্বেও, পার্বত্য অঞ্চল কদাপিও বাঙ্গালী মুক্ত ছিলো না, এবং চট্টগ্রামে ও উপজাতিদের বসবাস ছিলো। শুধু সাময়িক সংখ্যাধিক্য ঘটাতেই বাঙ্গালী ভূমি বা উপজাতীয় ভূমি নামে কোন অঞ্চল আখ্যায়িত হতে পারে না। প্রাথমিক ভাবে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল, তখনো চাকমা রাজবাড়ী ও সদর দপ্তর ছিলো চট্টগ্রামের অধীন রাঙ্গুনিয়ার রাজা নগরে। এ হিসাবে রাজ পরিবার হলেন চট্টগ্রামী। তা ছাড়াও অধিকাংশ উপজাতি এতদাঞ্চলের আদি বাসিন্দা নন। মোগল আমলের শেষে জনৈক শের মস্ত খাঁর নেতৃত্বে একদল চাকমা সর্ব প্রথম, তাদের স্বদেশ আরাকান ত্যাগ করে, দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলে এসে অভিবাসন গ্রহণ করেন। আদি চাকমা রাজা নামধেয় ঐ শের মস্ত খাঁই, দেবাশীষ রায়ের এ দেশীয় আদি পূর্ব পুরুষ। স্বল্পসংখ্যক চাকমা ঐ আদি অভিবাসন কাল হালো ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ সাল। তৎপর ও গোটা বৃটিশ আমল জুড়ে, অধিকাংশ চাকমা ও অন্যান্য উপজাতির অবাধ বহিরাগমন, ও এতদাঞ্চলে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। শাসক বৃটিশরাই উপজাতিদের অবাধ বগিরাগমন, ও এতদাঞ্চলে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। শাসক বৃটিশরা এতদাঞ্চলে বহিরাগত উপজাতিদের অবাধ অভিবাসনে ছিলেন উদার। তারা স্থানীয় ভাবে উপজাতিদের সংখ্যাধিক্য গড়ার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী বসবাস ও আবসনকে নিরুৎসাহিত আর বাধাগ্রস্ত করেন। জারি হয় অভিবাসন সুযোগ সুবিধা সম্বলিত উপজাতীয় আধিপত্যবাদী আইন, এবং তাদের সর্দারী ও মাতবরীর প্রথা। ধারা নং ৫১ হলো বাঞ্ছিত নয়, এমন সব লোকদের বিতাড়ন আইন, এবং ধারা ৫২ হলো অভিবাসন প্রদান আইন, যে আইনে প্রকাশ্যে অস্থানীয়দের অবাধ অভিবাসন মঞ্জুর, আর দেশীয় ভিন্ন সম্প্রদায় ও সমাজের লোকদের প্রবেশ ও বসবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ঐ আইনের বৈধতা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু উপজাতীয় সর্দার মাতবর ও রাজনীতিকরা অব্যাহত রাখতে চান তাদের অর্জিত সংখ্যাধিক্য আর আধিপত্য। তারা বাঙ্গালী প্রতিবেশীদের প্রতি অনুদার। একটি বারও রাজা থেকে প্রজা পর্যন্ত উপজাতীয় কারো মুখে বাঙ্গালী অধিকারের স্বীকৃতির কথা শোনা যায় না। তাদের মুখে এ কথা বলা শোভন হতো যে, এতদাঞ্চল একা উপজাতিদের নয়, বাঙ্গালীদেরও স্বদেশ ভূমি। উভয়ের শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানই কাম্য। গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা ভোগের শরিকানায়, পাহাড়ী বাঙ্গালী ভেদাভেদ ও প্রতিহিংসার দ্রুত অবসান হওয়া আবশ্যক।

এই বিভেদ বিসম্বাদ ও চিন্তার পরিণতি হবে, বাঙ্গালীদের ও একজন রাজা বানাবার দাবীতে সোচ্চার হওয়া, অথবা তাদেরও একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলা। কারণ তারা আজ মুরব্বীহীন, মুখপাত্রহীন, অস্ত্র-বন্দি, বলতে গেলে ও উপজাতি নামে সমাজচ্যুত ও

নির্বাসিত। তারা এই অসহায় বন্দি দশা থেকে মুক্তি চায়।

রাজা বাবু আপনি ও বাঙ্গালীদের নেতা হতে পারতেন। আপনার পূর্ব পুরুষ শেরমস্ত খাঁ থেকে ধরম বখশ খাঁ পর্যন্ত একাদিক্রমে দশজন চাকমা প্রধানই মুসলিম ঐতিহ্যের অধিকারী। রাজকীয় সীল মোহর গুলো পর্যন্ত আরবীতে লেখা। তাতে আল্লার প্রতি বিশ্বাস ব্যক্ত। এই আনুকূল্যে আপনার বাঙ্গালী সমর্থন আকর্ষণের সুযোগ ছিলো যথেষ্ট। বিস্ময়কর ভাবে রাজা নগরবাসী বাঙ্গালীরা এখনো আপনাকে সহ পুর্ববর্তী রাজাদের নিজেদের রাজা জ্ঞান করেন। এই বাঙ্গালী অনুভূতিকে, একমাত্র চাকমা ও উপজাতীয় পক্ষপাতিত্বের দ্বারা ক্ষুণ্ন করা দুঃখজনক।

ক্ষতিপূরণ দানের মাধ্যমে বাঙ্গালী প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে আপনি এতদ সংক্রান্ত জন সংহতি সমিতির দাবীরই প্রতিধ্বনি করেছেন। আপনার এ ধারণাও সঠিক নয় যে, ক্ষতিপূরণের টাকা হাতের মুঠোয় পেয়ে আবাসিত বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চল থেকে প্রত্যাহৃত হবে। আপনি এই বর্ণনায় বাঙ্গালীদের উপজাতীয় জায়গা জমির জবর দখলকার বানিয়েছেন। ভোরের কাগজ ও সেমিনারের বক্তব্যে আপনার একদসংক্রান্ত উপস্থাপনা আরো বিশদ ও পরিষ্কার। কিন্তু বর্ণনাটি পক্ষপাত দুষ্ট। ভেবে দেখা উচিত, বাঙ্গালী প্রত্যাহার ও প্রত্যাবাসন, কোন সরকারী আদেশ নিষেধের দ্বারা কার্যকর করা কখনো সম্ভব নয়। কোটি কোটি বেকার ও ভূমিহীন বাঙ্গালীর জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ করা ও এতদাঞ্চলকে একমাত্র উপজাতীয় অঞ্চল রূপে সংরক্ষিত রাখা, বাস্তবে নয় কল্পনায়ই সম্ভব। বাস্তব হলো উভয়কে সহ অবস্থান করতে হবে। এই সহাবস্থানকে শান্তিপুর্ণ করার উপায় নিয়েই ভাবা দরকার। যা অসম্ভব তা নিয়ে শক্তিক্ষয় সংগ্রাম ও ভাবনা চিন্তায় কোন লাভ নেই। সংঘর্ষ সংঘাতে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র উপজাতীয় সমাজেরই ক্ষতি হবে দেশী। বাঙ্গালীর এক বছরের প্রজন্ম সংখ্যায় উপজাতিদের চারগুণেরও বেশী হবে। নৃশংসতার দ্বারা বাঙ্গালী সম্প্রসারণকে বাগে আনা উপজাতিদের পক্ষে সম্ভব ভাবা ঠিক নয়। পরিবর্তে বাঙ্গালী নৃশংসতারই জন্ম হবে। সে হানাহানিতে সংখ্যায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, উপজাতিদের অস্তিত্ব হবে বিপন্ন। তাই হিংস্র প্রতিযোগিতা ও মোকাবেলার নীতি হবে বিপজ্জনক। বিবেকবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সপক্ষচিন্তা ত্যাগ করে, মিলন ও সহযোগিতার প্রশ্নে অবদান রাখা উচিত। আজ এতদাঞ্চলে এমন একটা সার্বজনীন শান্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটানই আবশ্যক, যা পাহাড়ী বাঙ্গালীদের এক কাতারে এনে দাঁড় করাবে। সবাই ভাববে আমরা মানুষ। সমান অধিকার ও সুবিধা নিয়ে সবাইকে প্রতিবেশী হয়ে বাঁচতে হবে। সংঘাত হিংসা ও প্রতিযোগিতা নয়, সম্প্রীতি ও সহযোগিতাই হতে হবে জীবন-যাপনের মূলমন্ত্র। পক্ষপাতিত্ব, উস্কানী, আর বাড়াবাড়িতে এ পর্যন্ত ক্ষতি ছাড়া উপকার হয়নি। এ পথ পরিত্যজ্য। শান্তি স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার সুযোগ সমাজপতিদেরই বেশী। এই সম্ভাব্য শান্তি আন্দোলনের ভিত্তি ভূমি হবে এতদাঞ্চল, আর ভুক্তভোগী জন সাধারণকেই হতে হবে তার সমর্থক পক্ষ। তবে সমাজ মান্য ব্যক্তিদেরই নিতে হবে এর নেতৃত্ব। ঐতিহ্যগতভাবে উপজাতীয় রাজপুরুষদের সে সার্বজনীন গ্রহণ যোগ্যতা আছে। তাই রাজা বাবুর পক্ষে সংকীর্ণ

উপজাতীয় মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ বাঞ্ছিত নয়। বাঙ্গালীরা সম্ভাব্য নিরপেক্ষ শান্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। তবে তার লক্ষ্য হতে হবে, শান্তি, সহাবস্থান ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা। সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্যে রাজা বাবুর প্রতিপাদ্য হলো ঃ পুনর্বাসিত বাঙ্গালীরা অভিবাসী আর তারা উপজাতীয় লোকদের জায়গা জমির জবর দখলকার। বক্তব্যটি তথ্য নির্ভর নয়, পক্ষপাতদুষ্ট। বন্দোবস্তি ছাড়া জায়গা জমির স্বত্ব অনন্তকাল স্বীকার্য্য নয়। বিদেশের মাটিতে পুনর্বাসন গ্রহণকেই অভিবাসন বলে। মূল ইংলিশ শব্দ ইমিগ্রেশনের এটি বাংলা প্রতিশব্দ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের আবাসন গ্রহণকে অভিবাসন বলা যায় না। এটি তাদের স্বদেশের ভিতর স্থানান্তর মাত্র। বরং উপজাতিদের বলা যায় অভিবাসী। তাদের মূল পিতৃ ভূমি সীমান্তের বিপরীতে বিদেশে অবস্থিত। রাজা বাবুর নিজ উর্ধ পুরুষ রাজা ভুবন মোহন রায়ের লিখিত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস পাঠে, ও চাকমা লোক কাহিনী শ্রবণের মাধ্যমেও অবগত হওয়া যায়, তাদের মূল পিতৃভূমি অজ্ঞাত এক চম্পক নগর। বাংলাদেশে আগমনের আগে তাদের আবাস স্থল ছিলো আরাকান। দ্বিতীয় প্রধান উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ত্রিপুরাগণ ও সন্দেহাতীতভাবে সাবেক ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী মগেরাও আরাকান বাসী। এখানে অন্যান্যের কথা উল্লেখ যোগ্যই নয়। এই বহিরাগত লোকজনকে ভৌমিক অধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের অভিবাসন নামীয় ৫২ ধারাধীন আইনটি জারি করা হয়েছিলো। এটিকে বাঙ্গালীদের অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন বলা ভুল। এরা অভিবাসী নয়। উপজাতীয়দের চেয়ে অধিক অনুন্নত পশ্চাদপদ বাঙ্গালী নামধেয় কোটি কোটি অপগন্ড মানুষ এদেশেরই বাসিন্দা হয়ে আছে। অধিকন্তু উপজাতীয় আখ্যাটিও অযৌক্তিক। প্রতিবেশী দেশ সমূহে তাদের জাত ভাইরা উপজাতি বা আদিবাসী আখ্যায়িত নন। বার্মায় মগ বা মার্মারা মূল ঐতিহাসিক জাতি। সাবেক ত্রিপুরা রাজ্যের মূল বাসিন্দারা ও ত্রিপুরা নামীয় জাতি। চাকমারা ও নিঃসন্দেহে এক অগ্রসর সুসভ্য সম্প্রদায়। আদিম জীবন যাপন পদ্ধতি থেকে তারা সম্পুর্ণ মুক্ত। এই লোকদের অসভ্য অনুন্নত আদিমতার আচ্ছাদনে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা বেদনা দায়ক। তাদের দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্য গোটা জাতীয় অবস্থারই প্রতিচ্ছবি, পৃথক কিছু নয়।

জমির মালিকানার জন্য বন্দোবস্তি লাভ, দীর্ঘ অবলম্বিত ঐতিহ্য। খোদ আদি রাজা শের মস্ত খাঁকেও কোদালার মাওদায় জমি বন্দোবস্তি নিয়ে এদেশে বসবাস শুরু করতে হয়েছিলো। এই অনুসরণীয় বন্দোবস্তি প্রথাকে অবজ্ঞা করে শুধু দখলের দ্বারা জায়গা জমির মালিক হওয়ার উপজাতীয় প্রক্রিয়া ভুল। এই ভুলের মাশুল অবশ্যই দিতে হবে। জমি খাস রেখে মালিক হওয়ার উপজাতীয় প্রক্রিয়া ভুল। বাঙ্গালীরা সরকার প্রদত্তচিহ্নিত খাস জমির বন্দোবস্তি প্রাপ্ত খাটি বৈধ মালিক। তাদের অধিকার আইনতঃ চ্যালেঞ্জ যোগ্য নয়। আর গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয়দের লাখেরাজ সম্পত্তিও ভাবা অনুচিত। বিদেশী মদদ আর অস্ত্রের শক্তি মত্তায় ন্যায়-অন্যায় ভুলে যাওয়া যুক্তির কথা নয়। বাঙ্গালী বিতারণে বেশি উৎসাহ প্রদর্শনকে সন্দিগ্ধ বাঙ্গালী পক্ষ ভুল বুঝতে পারে। এই ভুল বুঝাবুঝি, আর এক তরফা আত্ম-স্বার্থ-চিন্তা, পরিহার করা ছাড়া, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না। অযৌক্তিক বাগাড়ম্বরে আত্মতুষ্টি লাভ সম্ভব হলেও, তার

কোন সুদূর প্রসারী সুফল আশা করা যায় না। লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির মালিকানার পক্ষে ও বন্দোবস্তি থাকা জরুরী হয়। সম্প্রদায় ও ধর্ম বিদ্বেষকে আলোচনার উপজীব্য করা ঠিক নয়। মাননীয় রাজা বাবু উল্লেখিত সেমিনারের প্রবন্ধে পবিত্র ধর্মকেও টেনে এনে বাঙ্গালী ইসলাম, ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। প্রাসঙ্গিক ভাবেই তার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। আপনার বক্তব্যটি যথা ঃ

Almost all the recent migrants to the C.H. Ts are ethnically Bengali and largely of Islamic faith. The vast majority of hill people are Budhist, followed by Hindus and Christians.

বাংলা ঃ মানবগোষ্ঠী গত বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত সাম্প্রতিক কালের উদ্বাস্তুদের প্রায় সবাই বাঙ্গালী, যাদের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। পাহাড়ী উপজাতিদের গরিষ্ঠতম অংশ বৌদ্ধ, তৎপর হিন্দু ও খ্রীষ্টান (সুত্র ঐ)

এখন প্রথমে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের নৃতাত্বিক পরিচয় সন্ধানই প্রয়োজন। এরা কি পৃথক দুই নৃগোষ্ঠী? ভাষা সংস্কার সংস্কৃতি, সাজ পোষাক, আচার আয়োজন ও দৈহিক রং গঠনে চাকমা ও বাঙ্গালীতে পার্থক্য অতি ক্ষীণ। কেবল লৌকিকতা ও পরিবেশ পরিস্থিতিগত ভিন্নতা ব্যতীত, এ দু'সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন। রোচা গঠন, গোরা রং, আর পাহাড়ের অধিবাস বনাম ধার গঠন শ্যামলা রং আর সমতলের অধিবাস, নৃতাত্বিক পৃথক পরিচয়ের সুত্র নয়। এই পার্থক্য কারো পক্ষে একচেটিয়াও নয়। বাঙ্গালীদের বিপুল সংখ্যক লোক মঙ্গোলীয় রং ও গঠনের অধিকারী। চাকমা সমাজেও আর্য্য দ্রাবিড়ীয় মিশ্রণজাত তীক্ষ্ণ শ্যামলা রং গঠনের লোক, সংখ্যায় কম নয়। পেশাগত জুম ঐতিহ্যই চাকমাদের পাহাড়বাসী, আর বাঙ্গালীদের হাল চাষ ঐতিহ্যই সমতলবাসী করেছে। তবু লাঙ্গল চাষীতে পরিবর্তিত হয়ে অনেক চাকমা আজকাল পাহাড়ের উপত্যকাময় সমতলের বাসিন্দায় পরিণত ও বাঙ্গালীর সম পরিবেশ গত অবস্থানে উপনীত হয়ে গেছেন। একই ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি আচার ব্যবহার অবস্থান ও রং গঠন ধারণ করে চাকমারা এখন বাঙ্গালীদের নৃতাত্বিক নৈকট্য সম্পন্ন বর্ন বা গোষ্ঠী। একই সাথে তারা অন্যান্য প্রতিবেশী উপজাতীয়দের তুলনায় অধিক বঙ্গীয় পরিচয় সম্পন্ন। অন্যান্য পাহাড়ী সম্প্রদায় যেমন তাদের অবঙ্গীয় ভাষা ব্যবহার আচার ঐতিহ্য আর রূপ গঠনের গুণে পরিষ্কার অবাঙ্গালী, তদ্রুপ চাকমারা অধিক পরিমানে বঙ্গীয় ঐতিহ্য ধারী। চাকমা অভিজাতরা অতীত কাল থেকে এখনো বাঙ্গালী আত্মীয়তার সাথে সম্পৃক্ত। তাদের অনুকরণে সাধারণ চাকমারা ও বাঙ্গালী আত্মীয়তা থেকে মুক্ত নন। আদি রাজা শের মস্ত খাঁসহ পরবর্তী দশজন চাকমা রাজা ও রাণীর নাম ও তাদের সীল মোহরগুলো প্রমাণ করে, তারা বাঙ্গালী অভিজাত মুসলিশ সমাজ ও তাদের ধর্মের সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত নন যথা ঃ

১. আদি চাকমা রাজা ঃ শের মস্ত খা ১৭৩৭ খ্রীঃ
২. রাণী সোনাবি ১৭৪০ খ্রীঃ
৩. রাজা শের জব্বার খাঁ ১৭৪৯ খ্রীঃ
৪. রাজা নুরুল্লাহ খাঁ ১৭৬৫ খ্রীঃ

৫. রাজা ফতেহ খাঁ ১৭৭১ খ্রীঃ
৬. রাজা শের দৌলত খাঁ ১৭৭৩ খ্রীঃ
৭. রাজা জান বখশ খাঁ ১৭৮৩ খ্রীঃ
৮. রাজা তব্বার খাঁ১৮০০ খ্রীঃ
৯. রাজা জব্বার খাঁ ১৮০১ খ্রীঃ
১০. রাজা ধরম বখশ খাঁ ১৮১২ খ্রীঃ

রাজা ধরম বখশ খাঁর বিধবা পত্নী রাণী কালিন্দি স্বীয় নামের শেষে মুসলিম ঐতিহ্যযুক্ত বিবি উপাধি আমৃত্যু ব্যবহার করেছেন। এই রাজপরিবারের সমাজ ছিলো রাঙ্গুনিয়ার মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত। রাজানগরের পরিত্যক্ত ঐ রাজ বাড়ীর দীঘির পাড়ে এখনো তখনকার রাজকীয় কবরস্থান ও মসজিদ বিদ্যমান আছে। পড়োমান রাজ প্রাসাদটি এখনো মোগল স্থাপত্য শিল্পের নির্দেশন হিসাবে দন্ডায়মান রয়েছে। অদ্যাবধি রাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে মুঘলাই সাজে সজ্জিত হয়ে চাকমা রাজা, স্বীয় প্রজাদের কুর্নিশ খাজনা ও নজরানা গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণ চাকমা প্রজারা এখনো তাদের হুজুর ও বিবি সম্বোধন করে।

এখানে স্মর্তব্য যে, আমি রাজাদের যে তালিকা ও তাদের কার্য্যকাল সাজিয়েছি তার ভিত্তি হলো ঃ কতিপয় রাজকীয় সীল মোহর। এর সাথে অধ্যাপক এ এম সিরাজ উদ্দিন রচিত রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস প্রবন্ধ ও সরকারী দলিল পত্র। রাজা ভুবন মোহন রায়কৃত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস ও অন্যান্য কতিপয় লেখকের বর্ণনার কিছু অমিল আছে।

রাজা ধরম বখশ খাঁর নাতি রাজা হরিশচন্দ্র রায় থেকেই মুসলিম নাম ও খেতাবের ঐতিহ্য পরিত্যক্ত। ১৯৭২ খ্রীঃ সালে বৃটিশ কর্তৃপক্ষই তাকে রায় উপাধি প্রদান করেন। তৎপুর্বে তদীয় পিতৃপক্ষের দ্বিতীয় উর্ধপুরুষ অর্থাৎ দাদা মাল্লাল খা পর্যন্ত মুসলিম নাম খেতাবের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন ছিলো। পিতা গোপীনাথ থেকেই অমুসলিম নাম করণের শুরু। মা রাজা ধরম বখশ খাঁ কন্যা চিকন বিবি পর্যন্ত বিবি উপাধি অনুসৃত হয়েছে। এই মুসলিম ঐতিহ্য হলো তাদের প্রাচীন আভিজাত্যের প্রতীক।

অপর দিকে সাধারণ চাকমা ভাষা ও নামকরণে মুসলিম ঐতিহ্য অনুসৃত হওয়ার প্রমাণ হলো সৃষ্টিকর্তাকে খোদা সম্বোধন, সময়কে ওক্ত বলা, বউ ছাড়াকে তালাক আখ্যা দান, অভিবাদনকে সালাম বলা, ইত্যাদিসহ তান্যাবি, ধন্যা বি, জুম্যা বি, চেঙ্গীজ খাঁ, বাঙ্গাল্যা ইত্যাদি নাম করণ। এটা চাকমাদের অনস্বীকার্য মুসলিম ধারা ঐতিহ্য। এই ঘোর উপজাতীয় ঐতিহ্য প্রীতির যুগেও বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানদের সাথে আত্মীয়তা রচনার প্রবণতা তাদের মাঝে অব্যাহত আছে। খোদ রাজা বাবু, রাণী বিনীতা রায়ের নাতি, যিনি একজন বাঙ্গালী হিন্দু মহিলা। তদীয় অপর পক্ষীয় পিতৃব্যরা ও হিন্দু মহিলা সুধীরা রায়ের গর্ভজাত সন্তান। সুতরাং জাত ও ব্যক্তিগত অহমিকা দেখাবার মত সঠিক ভিন্নতা চাকমাদের নেই। তারা বড়জোর বাঙ্গালী সংকর মঙ্গোলীয় শাখা। বাঙ্গালী ও মঙ্গোলীয় মা বাপের দীর্ঘ ও বংশানুক্রমিক সংমিশ্রণের ধারায় এরা উভয় চরিত্র সম্পন্ন একটি মানব

গোষ্ঠী। এদের পৃথক পরিচিতি জোরালো নয়। কেবল রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের সুযোগ হিসেবে নিজেদের তারা অবাঙ্গালী আখ্যায়িত করেন, এবং তাই তারা কখনো পাহাড়ী কখনো উপজাতি আর কখনো আদিবাসী। তারা বাঙ্গালী পরিচিত হতে অস্বীকৃত। তবে প্রতিবেশী অন্যান্য উপজাতীদের মত পরিষ্কার অবাঙ্গালী নন। বাংলা ভাষা আর বাঙ্গালী নামকরণ তাদের বাঙ্গালীত্বের একটি অকাট্য দলিল। বাঙ্গালীত্বের সুত্রে অঢেল সুযোগ-সুবিধা উপচে পড়তে শুরু করলে, পর মুহূর্তেই তাদের বাঙ্গালীত্বে উত্তরণ জোরদার হবে এমনটি অনুমান করা যায়।
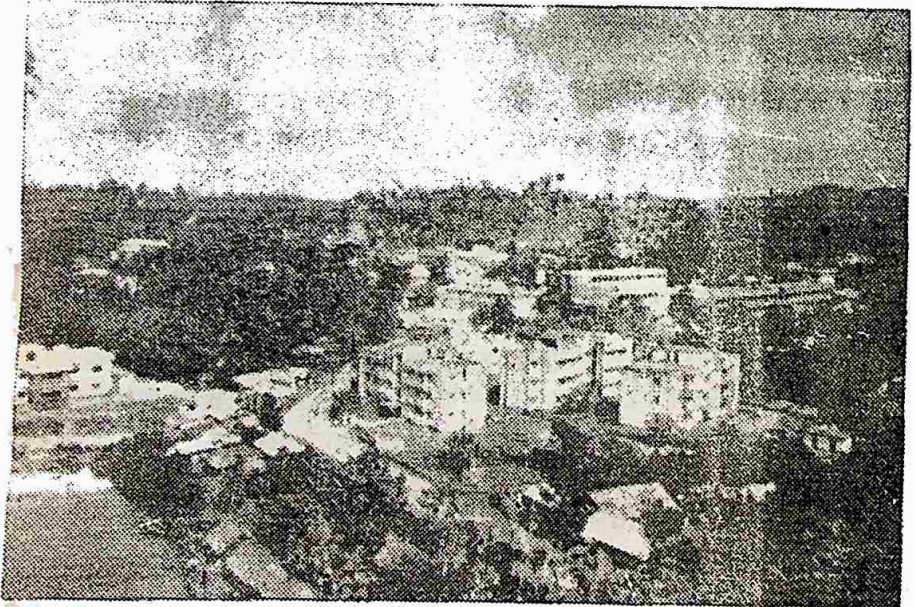
বান্দরবন শহর

পাঁচ দফায় নিহিত ইতিবাচক বক্তব্য

পাঁচ দফার মাঝে অনেক নেতিবাচক উগ্র বক্তব্য আছে, যা দেশ ও জাতীয় স্বার্থের সাথে মানানসই নয়। ঐ বক্তব্য গুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে, তম্মধ্যে নিহিত ইতিবাচক বক্তব্য গুলোকে, প্রাধান্য দেয়া উচিত। ঐ ইতিবাচক বক্তব্য হলো, সংবিধান মান্যতা, গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ, দেশের অকন্ডতা রক্ষার সদিচ্ছাও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতি একাত্মতা। এসবকে মীমাংসার চাবিকাঠি ধরা যায়। এখন নিশ্চিত হওয়া দরকার, বর্ণিত ইতিবাচক নীতি আদর্শের প্রতি জন সংহতি সমিতি সত্যই অঙ্গিকারাবদ্ধ কিনা। এখানে যে উদৃতি গুলো উপস্থাপিত হচ্ছে, তা জনসংহতি সমিতির বিভিন্ন পুস্তিকা ও প্রচার পত্র থেকেই গৃহীত। এগুলো প্রমাণ করে, তাদের প্রধান বিবেচ্য সংঘাত নয়, শান্তি, এবং সর্বোপরি শান্তি পুর্ণ আলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন। উদৃতিগুলো বিবেচ্য, যথা ঃ

(১) 'জুম্ম জনগণের এই আন্দোলন অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত আন্দোলন। এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়।'
(সূত্র জনসংহতি সমিতির জরুরী বিজ্ঞপ্তি পৃঃ ৪ তাং-৩১-১০-৯১খ্রীঃ)

(২) জুম্ম জনগণ শান্তিপুর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী, তা বলাই বাহুল্য। স্ক্র (সূত্র ঐ)

(৩) 'গণতান্ত্রিক শাসন ও অধিকার ব্যতীরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধন সহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংহতি সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস, প্রথা, প্রবাদ, ভাষা, ঐতিহ্য, ভূমির অধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে না। (সূত্র ঐ)

দেশের অখন্ডতা রক্ষা, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা, ও শান্তিপুর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দাবী দাওয়া আদায়ের কথাই ব্যক্ত হয়েছে উপরোক্ত বক্তব্যে।

এখানে মূল দাবী নামাটিও বিবেচ্য, তাতে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করা হয়েছিলো, যথা ঃ দাবী নং ১ (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করা। (খ) পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা। (গ) প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে। এবং প্রদেশ তালিকাভুক্ত বিষয়ে এই প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অধিকারী হইবে।' (সুত্র ঃ মূল দাবী নামা)

প্রকাশ থাকে যে, সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, যুক্ত রাষ্ট্র বা ফেডারেল ষ্টেট নয়। সুতরাং প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী সংবিধান সম্মত নয়। যথা সাংবিধানিক আইনঃ বাংলাদেশ সংবিধান । প্রথম ভাগ। অনুচ্ছেদ-১। প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে। (সুত্র ঃ বাংলাদেশ সংবিধান)

জনসংহতি সমিতি এই সাংবিধানিক বিরোধীতাকে কাটাবার উদ্দেশ্যে এবং স্বীয় দাবীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার লক্ষ্যেও বটে, মূল দাবীনামাটি সংশোধন করেছে। তারা প্রথম থেকেই বর্ণিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী নিয়ে কঠিন বিরোধীতার সম্মুখীন ছিলো । সংবিধান মান্যতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ছাড়া তার পক্ষে আগান সম্ভব ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে যায়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১২-৫-৯২ তারিখে খাগড়াছড়ির জন সভায় ঘোষণা করেন ঃ সাংবিধানিকভাবে পার্বত্য সমস্যার সমাধান হতে হবে। তাতেও জনসংহতি সমিতি যুগপৎ আশান্বিত ও চাপের সম্মুখীন হয়। এরই ফলশ্রুতি হলো পরবর্তী আগস্টে জন সংহতি সমিতি কর্তৃক স্বেচ্ছায় অস্ত্র বিরতি ঘোষণা, এবং পরবর্তীতে দাবীনামায় সংশোধন সাধন।

প্রকাশ থাকে যে, সংবিধানে সংশোধন দাবী করাই সংবিধান মান্যতা। তবে সংশোধন হলো সাংবিধানিক বিষয়। সংসদ গণভোট ও সুপ্রীম কোর্টের পর্যায় ক্রমিক এখতিয়ার এ দাবীটির সাথে জড়িত, যেটি অনিশ্চিত দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এটি শান্তি প্রক্রিয়ার একটি অংশ হতে পারে, কিন্তু পূর্ব শর্ত নয়। এ যুক্তি গ্রাহ্য প্রশ্নটি জন সংহতি সমিতির কাছে মান্য না হয়ে পারে না। এটাও একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন যে, দাবীকৃত সংশোধনীটি এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে কতটুকু সংস্থান যোগ্য। সংবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে দাবীটিকে গ্রহণীয় হতে হবে। এ বিতর্ক থেকে উত্তরণ কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। রাজনৈতিক মীমাংসা তজ্জন্য অপেক্ষমান থাকতে পারে না। সংশোধনী গৃহীত হবে, এই আশাবাদের উপর পাঁচ দফা মেনে নিয়ে, সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতার আওতায়, একটি শান্তি ফর্মুলায় উপনীত হতে হবে। অস্ত্রবাজির দ্বারা জয় লাভ সম্ভব নয়, এই তিক্ত উপলব্ধি থেকেই জন সংহতি সমিতি ছিলো, শান্তিপুর্ণ সমাধানে আগ্রহী, আইন ও যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা মান্যকারী, এবং গণতন্ত্র ও সংবিধানের প্রতি অনুরক্ত, একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের বিষয়টি, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিশীল একটি ফর্মে, নির্দিষ্ট করা গেলে, অথবা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে স্বায়ত্ত শাসনের আকাঙ্খা পূরণের উপযোগী করা সম্ভব হলে, বিষয়টি হতো স্বস্তিকর। কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্ত শাসনের উগ্র দাবীদার নয়। আরো অনেক অঞ্চল ও এর নীরব দাবীদার। এই আঞ্চলিক ক্ষমতার আকাঙ্খাটি পূরনের একটি আপোষ রফা হওয়া দরকার। নতুবা দেশে একদা ফেডারেল ষ্টেট গঠনের আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো সে আন্দোলনের পথ প্রদর্শক সূতিকাগার। এককেন্দ্রিক না যুক্ত রাষ্টীয় শাসন, দেশ ও জাতি ভিত্তিক এই চিন্তা চেতনার পথিকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম। একটি আপোষ রফা অবলম্বনের মাধ্যমে জনরোষ থামান, বা সন্তুষ্টি বিধান আবশ্যক। নতুবা এ দাবীটি হবে দেশ ও জাতির জন্য স্পর্শ কাতর। পার্বত্য

চট্টগ্রামের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে, ও তার পক্ষে চালিত সশস্ত্র আন্দোলনে, দেশ ও জাতি আক্রান্ত। নতুবা, স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলনরত উপজাতিরা, অন্যান্য আঞ্চলিকতাবাদীদের দ্বারা পূজিত হতেন। যদি আন্দোলনটি এখনো অহিংস আর সার্বজনীন রূপ নেয়, তাহলে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। তাতে এর নেতারাও হয়ে উঠবেন পূজনীয়।

সরকারী মহল পার্বত্য অঞ্চলের তথ্য শূণ্যতায় বিভ্রান্ত। তারা প্রয়োজনে পত্র-পত্রিকা বই পুস্তক ঘাটাঘাটি করে, হয় অসহায়তা বোধ করেন, নয়তো মনগড়া একটি উপলব্ধি খাড়া করে নেন, যা প্রকৃত তথ্য বহন করে না। লেখক ও সাংবাদিকদের অনেকেও মন ভুলানো কাহিনী রচনায় ব্রতীহোন। তাদের দ্বারা আজকাল সহজ অর্থবোধক বান্দরবন নামটিও বান্দরবান হতে শুরু করেছে। এই এরাই অবাঙ্গালীদের নির্বিবাদে আখ্যায়িত করেন উপজাতি বা আদিবাসী সংজ্ঞায়। অথচ এদের স্বজাতীয় ভাইদের পরিচয়, বার্মা আরাকান মিজোরাম ও ত্রিপুরায় আদিবাসী ও উপজাতি নয়।

অখন্ড ভারত যখন বৃটিশ রচিত ভারত শাসন আইনে শাসিত হতো, তকন পার্বত্য চট্টগ্রামেও একই ঔপনিবেশিক আইন হিলট্রাকট্স ম্যানুয়েল জারি হয়। স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন সাংবিধানিক আইন তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐ ঔপনিবেশিক আইনটি জারি আছে। এর দ্বারা আইনত পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের উপনিবেশ হয়ে আছে। তাই এখানে এক কেন্দ্রিক ব্যবস্থা এখন হুমকির সম্মুখীন। উপজাতীয় স্বায়ত্ত শাসন দাবীর ভিত্তি এটাই।

আইনে তিন উপজাতীয় প্রধানকে চীফ বা সর্দার আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতীতে তাদের কেউ স্থানীয় রাজ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তবু তারা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে রাজা আখ্যায়িত হোন। তারা রাজ ক্ষমতা ধারী বা জমির মালিক জামিদারও নন। সারাদেশে ১৯৫২ সালেই জমিদারী উচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম খাজনার ৫ (পাঁচ) ষষ্ঠমাংশের ভাগীদার হয়ে রাজাও মৌজা প্রধানগণ জমিহীন জমিদারী ভোগ করছেন। এতেই তারা বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। তাই তো বলা যায় ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাদি হলো যথেচ্ছার ও তথ্য বিভ্রান্তির ফল। সরকার ও প্রকৃত তথ্য চর্চার প্রতি উদাসীন।

আতিকুর রহমান

প্রকাশিত বই :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (গবেষণা কর্ম)

২. প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট

৩. শান্তি সম্ভব

৪. প্রতিবেদন গুচ্ছ

৫. পার্বত্য তথ্য কোষ ১০ খণ্ড

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

যোগাযোগ : ৪৮ সাধার পাড়া উপশহর সিলেট। মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮